Masterpieces of Modern Chinese Fiction—
1919—1949

প্রথম সংস্করণ—
১৯৫৬ মার্চ

প্রকাশক :
শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্টার পাবলিকেশনস্
২০ চণ্ডীচরণ ঘোষ রোড
কলিকাতা—৮

প্রচ্ছদ—অমর সরকার

প্রচ্ছদ মুদ্রণ—ন্যাশানাল হাফটোন কোং
সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর :
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
আভা প্রেস
৬বি, গুড়িপাড়া রোড
কলিকাতা-১৫

অনুবাদকের কথা

বছর খানেক আগে একদিন ন্যাশানাল বুক এজেন্সীর এক কমরেড Masterpieces of Modern Chinese Fiction (1919—1949) বইটি আমায় দিয়ে বললেন, "দাদা, পড়ে দেখুন।" বইটা প্রায় ২/৩ দিনের মধ্যে পড়ে শেষ করে ফেলি। বইটির প্রতিটি গল্পই যে কোন মানুষের মনকে নাড়া দিতে বাধ্য। কি বিষয়বস্তু চয়ন কি গল্পের নায়ক নায়িকা নির্বাচন। কি গল্পের বিন্যাস ও পরিণতি, সর্বক্ষেত্রে তা অন্যান্য প্রাকবিপ্লব যুগের চীনের গল্পগুলি এককথায় অসাধারণ।

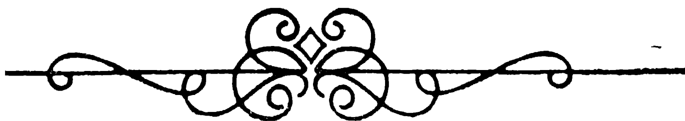
সাথে সাথে মনে হল যে আমাদের দেশে যে সব শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকার ও কবি শ্রমজীবী মানুষদের আন্দোলনের সাথে জড়িত তাঁদের হয়ত এই গল্প সংকলন কাজে লাগলেও লাগতে পারে। তাই সীমিত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অনুবাদ করে ফেলি। বইটি ছাপা হবার পর মনে হয়েছে অনুবাদের কাজ আমার অধিকারের বাইরে। অনেক বাক্য গঠন সঠিক হয় নি। কোন কোন জায়গায় হয়ত অন্য অর্থও হতে পারে। এ সব সংশোধন পরের সংস্করণে করা যাবে—তা যদি সত্য সত্যই বার হয়।

গল্পগুলি অনুবাদ করাতে যাঁদের সাহায্য পেয়েছি তাঁরা হলেন এন. বি. এর কমরেড নন্দদা, পাত্রসায়ারের হোমিওপ্যাথি ডাক্তার আবুল কাল্লাম মিঞা, নবকুমার মালাকার, বিষ্ণুপুরের বিশ্বেশ্বর দাসগুপ্ত প্রভৃতি অনেক হিতৈষী বন্ধু বান্ধব। স্টার পাব্লিকেশনস্ সাহসে ভর করে এটা ছাপিয়ে বার করার জন্যে ধন্যবাদ জানাই।

২০২।সি ফরডাইস লেন
কলিকাতা—১৪।

সলিল ঘোষ

সূচীপত্র



আধখানা চাঁদ

হ্যাঁ, আবার আমি ঐ আধখানা চাঁদ দেখলাম—সেটা যেন শীতল পাণ্ডুর হলদে রংএর কাস্তে একটা, এই আধখানা চাঁদ আমি কতবার দেখেছি? কতবার?—এই চাঁদ আমার মনের বহু বিভিন্ন রকমের আবেগকে জাগিয়ে তোলে। অনেক ধরনের দৃশ্য স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি যখনই বসে বসে ঐ চাঁদকে দেখি তখনই মনে পড়ে যায় যে প্রত্যেক বারই ওটাকে ঠিক ঐ ভাবে নীলাকাশে ঝুলতে দেখেছি। বিকেলের ফুরফুরে বাতাস যেভাবে ফুলের পাপড়িগুলোকে মেলে ধরে, যারা নিদ্রাযেতে আগ্রহী, ঠিক সেইভাবে এই আধখানা চাঁদ আমার সব স্মৃতি জাগিয়ে দেয়।

*　　*　　*

প্রথমবারই দেখা এই আধখানা চাঁদ আমার জীবনে কিন্তু শীতলতা বয়ে এনেছিল। তার প্রথম স্মৃতিচারণ বড়ই তিক্ত। আমার বেশ মনে পড়ে তার ক্ষীণ পাণ্ডুর সোনা রং-আলো আমার চোখের জলের ভেতরে তখন চক্চক্ করে জ্বলছে। সে সময় আমার বয়স মাত্র সাত বৎসর—লাল ফ্রক পড়া এক বালিকা মাত্র। আমার মাথায় ছিল আমার জন্য মায়ের নিজের হাতে বোনা কাপড়ের টুপি—তাতে ছোট ছোট ফুলের ছাপ ছিল। আমার বেশ মনে পড়ে সেদিন আমি আমাদের ছোট্ট ঘরের দরজায় হেলান দিয়ে ঐ আধখানা চাঁদের দিকে চেয়েছিলাম, ওষুধের গন্ধ, ধোঁয়াও মায়ের চোখের জলে আর বাবার অসুস্থতায় ঘরটা ঠাসা ছিল। আমি চৌকাঠে একা দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখছিলাম। আজ আমার জন্যে কারুর মাথাব্যথা নেই; আমার জন্যে কেউ খাবার বানিয়ে রাখেনি। আমি জানি ঐ ঘরে আজ একটা বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে গেছে। কেন না সকলে বলাবলি করছিল যে বাবার অসুখটা ছিল…। আমি কেবল নিজের জন্য দুঃখিত আমার শীত করছে, আমি ক্ষুধার্ত—উপেক্ষিতা।

চাঁদ অস্ত যাওয়া তক্ আমি সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, আমার সব হারিয়ে গেল। আমার চোখের জল আর ধরে রাখা গেল না। মায়ের কান্নার আওয়াজ আমারটাকেও ছাপিয়ে গেল। বাবা চুপচাপ শুয়ে তাঁর মুখটা সাদা কাপড়ে ঢাকা, আমি কাপড় তুলে ওঁর মুখটা দেখতে চেয়েছিলাম —সাহস পেলাম না। একে ঘরটা ছোট তার প্রায় সবটাই বাবা দখল করে রয়েছেন।

মা সাদা শোকের পোষাক পড়েছেন। আমার লাল ফ্রকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ধার সেলাই না করা একটা সাদা আংরাখা। এটা আমার ভালো মনে আছে কেন না আমি ঐ আমার জামার ধার থেকে ক্রমাগত সুতো ছিঁড়েই যাচ্ছিলাম সারাক্ষণ ধরে। চারিদিকে ভীষণ গোলমাল, বেদনার্ত কান্নার রোল ও চলছিলই; প্রতিটা লোক সেদিন ভীষণ ব্যস্ত। আসল ব্যাপার হচ্ছে যে সেদিন কারুরই কিছু করার ছিলই না, এত সব ব্যস্ততার কোন প্রয়োজনই ছিল না। বাবাকে শোয়ানো হল চারটে কাঠের তক্তায় তৈরী কফিনে। সেই কফিনে অনেক ফাঁক ছিল। তারপর কফিনটাকে পাঁচ জনে মিলে বাইরে বয়ে নিয়ে এলেন। তার পেছন পেছন মা-আর আমি কাঁদতে কাঁদতে চললাম। আমার বাবাকেও তার কফিনকে বেশ মনে আছে। ঐ কাঠের কফিনের অর্থই হলো বাবার সমাপ্তি। আমি জানতাম যে কফিনটাকে ভাংগতে না পারলে বাবাকে আর কখনও দেখতে পাবো না। ওরা বাবাকে কবর দিয়েছে শহরের প্রাচীরের বাইরে কবরস্থানে মাটির গভীরে। ঠিক কোন জায়গায় বাবাকে গোড় দেওয়া হয়েছে তা জানা থাকলেও আমার ধারণা যে বাক্সটাকে খুঁজে বার করা খুব কঠিন হবে। মনে হলো সেই কাঠের বাক্সটাকে বৃষ্টি বিন্দুর মত মাটি শুষে নিয়েছে।

* * *

পরেরবার যখন আবার আধখানা চাঁদ দেখলাম তখন, মা ও আমার পরনে ছিল সাদা শোকের আংরাখা। দিনটা সেদিন ছিল বেশ ঠাণ্ডা এবং মা আমায় বাবার কবরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সোনালি, রূপালি কাগজে তৈরী ধুপ কিনেছিলেন সেটা জ্বেলে বাবাকে পরপারে পাঠাতে। বিশেষ করে সেদিনটা মা আমার সাথে সদয় ব্যবহার করেছিলেন। আমি চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি আমায় পিঠে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলেন; শহরের ফটকের কাছে আমায় গরম চীনাবাদাম কিনে দিয়েছিলেন। সেদিন সব-কিছু ঠাণ্ডা থাকলেও চীনাবাদাম গরম ছিল।

গরম বাদাম না খেয়ে সেটা হাত গরম রাখার কাজে ব্যবহার করলাম।

সেদিন কতটা রাস্তা আমরা হেঁটেছিলাম আজ আর আমার মনে নেই। তা হবে—অনেক অনেক দূর। বাবাকে যেদিন গোড় দেওয়া হয় সেদিন কিন্তু রাস্তাটা এতদুর মনে হয় নি; হয়ত সেদিন অনেক লোক সংগে গিয়েছিলেন বলে তা মনে হয় নি। এখন কেবল মা আর আমি, সারাটা রাস্তা উনি কোন কথা বলেন নি; আমারও কোন কিছুই বলার ইচ্ছে ছিল না। জায়গাটা সেদিন বড্ড বেশী শান্ত ছিল। হলদে ধূলো ভরা রাস্তাটায় সেদিন কোন জনমনিষ্যি ছিল না।

তখন শীতকাল ও দিনটা বেশ ছোটই। আমার কবরটাকে বেশ মনে আছে—ছোট্ট একটা মাটির ঢিবি। দূরে কয়েকটা বাদামী রংএর ছোট ছোট ঢিবি; তার উপর সূর্য্যের আলো তীর্য্যকভাবে পড়েছে; দেখে মনে হয় আমার জন্য ব্যয় করার মত সময় মায়ের হাতে নেই। কবরের পাশটিতে আমায় বসিয়ে রেখে মা বাবার কবরের চুড়ো দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন অনেকক্ষণ, আমি হাতে গরম বাদাম নিয়ে বসে থাকি। কাঁদার পরে মা কাগজের ধূপ জ্বালালেন। তা থেকে ছোট ধূঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উপরে উঠে আবার মাটিতে ধীরে ধীরে ফিরে এলো। বাতাস যদিও খুব একটা জোরে বইছে না তাহলেও শীতটা ভীষণ।

আবার মা কাঁদতে সুরু করেন। আমিও বাবার কথা ভাবি; তার জন্যে আমি কিন্তু কাঁদি নি। মায়ের বেদনার্ত কান্না আমায় কাঁদতে বাধ্য করে। আমি তাঁর হাত দুটি ধরে বলি, "কাঁদে না মাগো, আর কাঁদে না।" তা শুনে আমায় তাঁর বুকে মা খুব জোরে জড়িয়ে ধরে আরও কাঁদতে থাকেন।

সূর্য্য অস্ত গেছে। রাস্তায় লোকজনের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। কেবল মা আর আমি। এটাই মাকে শংকিত করে তোলে! অশ্রুসজল চোখে তিনি আমায় টেনে নিয়ে চললেন। কয়েক কদম চলে তিনি থেমে পেছনে তাকান-আমিও তাকাই। আমি অন্যান্য কবর থেকে বাবার কবরকে পৃথক করে আর চিনতে পারলাম না। ঐ পাহাড়ী এলাকায় কবর ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। পাহাড়ের সানুদেশ পর্য্যন্ত কেবল শত শত মাটির ঢিবি। আমার মা শ্বাস ফেললেন।

আমরা হাঁটছি ত হাঁটছি—কোন কোন সময় জোরে, আবার কখনও আস্তে। তখনও আমরা শহরে ঢোকার ফটক পর্য্যন্ত আসি নি; ঠিক সেই

সময় আবার আকাশে আধখানা চাঁদ দেখলাম। আমাদের চতুর্দিক ঘিরে রয়েছে বিরাট অন্ধকার আর নিরবতা। আধখানা চাঁদ কেবল ঠাণ্ডা ঔজ্জ্বল্য বিকিরণ করছে। আমি ভীষণ ক্লান্ত; মা আমায় বয়ে নিয়ে চলেছেন। কেমন করে আবার আমরা সহরে ফিরে এলাম তা কিন্তু এখন বলতে পারবো না। আমার কেবল এটাই মনে আছে সেদিনও আমরা আবার আধখানা চাঁদ দেখেছিলাম।

* * *

আমার বয়স আট বছর হতেই, বন্ধক রাখার দোকানে জিনিষপত্র কেমন ভাবে নিয়ে যেতে হয় তা আমি জেনে গেছি। আমি এটাও জেনে ফেলেছি যে কোনদিন যদি ওখান থেকে কোন অর্থ না নিয়ে ফিরে আসি ত সে রাতে আমার ও মায়ের খাওয়া জুটবে না। অবশ্য এটা শেষ উপায় হিসেবে না হলে আমাকে তিনি ওখানে পাঠাতেন না। যখনই তিনি আমার হাতে কোন মোড়ক দিতেন তখনই বুঝে নিতাম যে সেদিন পাত্রে ঝোলের পাত্‌লা তলানিটুকু পর্য্যন্ত আর পড়ে নেই। আমাদের পাত্রটা নিষ্পাপ কোন বাল্যবিধবার থেকে ও পরিচ্ছন্ন।

একদিন আমায় একটা আয়না দিয়ে বন্ধক রাখার দোকানে পাঠানো হল; মনে হয় এটাই আমাদের তখন একমাত্র সম্বল ছিল যা ত্যাগ করতে পারি। যদিও প্রত্যহ মা এই আয়নাটা ব্যবহার করতেন। এখন বসন্ত-কাল। আমাদের প্যাড দেওয়া পোষাক সব কবে বন্ধুক দেওয়া হয়ে গেছে! এটা নিয়ে সাবধানে কেমন ভাবে চলতে হয় তা আমি অনেক আগেই শিখে ফেলেছিলাম। সাবধানে অথচ তাড়াতাড়ি আয়নাটা নিয়ে বন্ধক রাখার দোকানে পৌঁছে দেখি দোকানটা অনেক আগেই খুলে গেছে।

দোকানের উঁচু কাউণ্টার ও লাল দরজাকে আমি ভীষণ ভয় করি। তার দরজা দেখলেই আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। তা সত্ত্বেও সেখানে যেতে আমায় হতোই, এমন কি ঐ উঁচু চৌকাঠটা যদি হামাগুড়ি দিয়ে পার হতে হয় তাহলেও! সেখানে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আমার মোড়কটা উপরে তুলে ধরে চীৎকার করে বলতাম, "এটা আমি বন্ধক দিতে চাই।" তারপর বন্ধকি টিকিট ও টাকা নিয়ে বাড়ী ফিরে আসতাম তাড়াতাড়ি। কেননা মা ভাববেন-আমি জানতাম।

এবার দোকানদারের আয়নার দরকার নেই। ওরা জানালে যে এটার সাথে অন্য কোন জিনিষ যোগ করতে হবে। তাদের বক্তব্য আমি বুঝি। তাই সার্টের ভেতর আয়নাটা রেখে যত জোরে পারা যায় ততজোরে

পা চালিয়ে বাড়ী এলাম, মা খুব কাঁদলেন ; বন্ধক দেবার মত কোন জিনিষ তিনি তখন খুঁজে পেলেন না। আমার সর্বদাই একটা ধারণা ছিল যে আমাদের ঐ ছোট্ট ঘরটায় অনেক জিনিষ আছে। কিন্তু আজ, কয়েকটা টাকা পাবার আশায় এক টুকরো কাপড়ের খোঁজে মাকে সাহায্য করতে গিয়ে দেখি যে মোটেই বেশী কিছু সম্পত্তি আমাদের নেই।

মা আমায় আবার সেই দোকানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত বাতিল করেদেন। তাঁকে যখন প্রশ্ন করি, "মা তাহলে আজ আমরা কি খাবো?" তিনি শুনে কাঁদলেন এবং মাথার রূপার কাঁটাটা খুলে আমায় দেন। এক টুক্‌রো এই রূপো তাঁর কাছে কেবল পড়েছিল। আগে বহুবার তিনি এটা চুল থেকে খুলে ফেললেও কোনবারই তিনি এটা হাতছাড়া করতে পারেন নি। আমার ঠাকুমা মার বিয়েতে এটা তাঁকে দিয়েছিলেন। মা এখন আমায় তাঁর শেষ সম্বল এই কাঁটাটা দিলেন—বন্ধক দিতে।

আমি প্রাণপনে ছুটে দোকানে গেলাম, কিন্তু অনেক আগেই তার বড় দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে। কাঁটাটা হাতে শক্ত করে ধরে দোকানের সিঁড়ির ধাপে বসে কাঁদলাম—নিঃশব্দে; গোলমাল হতে পারে এই ভয়ে জোরে কাঁদতে সাহস হল না। আকাশের দিকে তাকাই। দেখি আজও সেখানে আধখানা চাঁদ আমার চোখের জলের মধ্য দিয়ে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলাম। আমার মা তারপর অন্ধকার থেকে বেড়িয়ে এসে আমার হাত ধরেন। আহ মায়ের হাতটা চমৎকার গরম! আমি আমার সব দুঃখকষ্ট এমন কি ক্ষুধা ও হতাশা পর্য্যন্ত ভুলে গেলাম। মায়ের গরম হাত আমায় ধরে ছিল যতক্ষণ ততক্ষণ সব ঠিক্‌ঠাক্ চলছিল।

আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছি। "মা চলো ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ি। কাল ভোরে আবার আসবে।"

মা নিরব। অল্প কিছুক্ষণ হাঁটার পর মাকে বললাম, "মা আকাশে ঐ আধখানা চাঁদ দেখেছ? সেটা দেখ বাবা যেদিন মারা যান সেদিনের মত আজও দেখ চাঁদটা ঠিক অমন বাঁকা হয়ে ঝুলছে কেন? মা ওটা সব সময় বাঁকা হয়ে থাকে কেন?"

মা নিরব। তবে তাঁর হাতটা বারেক কেঁপে ওঠে।

* * *

সারাটা দিন ধরে মা লোকজনদের কাপড় কেচে দিতেন। এ কাজে মাকে সাহায্য করতে চাইলেও তা করার কোন উপায় ছিল না। মায়ের

জন্য আমি অপেক্ষা করে থাকতাম। তাঁর কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি ঘুমোতাম না। কোন কোন সময় আবার আকাশে আধখানা চাঁদ দেখা দিলেও তিনি তখনও কাপড় কেচেই চলতেন। ঐ সব দুর্গন্ধ যুক্ত চামড়ার মত শক্ত মোজা আসতো দোকানের বিক্রেতাদের ও কেরাণীদের কাছ থেকে। তাঁর কাজ শেষ হত যখন তখন তাঁর খাওয়ার কোন বাসনাই থাকতো না।

আমি মায়ের পাশে বসে চাঁদের দিকে চেয়ে লক্ষ্য করতাম কেমন করে চাদের রূপালী আলোর মধ্য দিয়ে বিরাট ত্রিকোণ পাণিফলের মতই বাদুড়েরা গিয়ে আবার দ্রুত অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে।

মাকে যত বেশী বেশী করে দরদ দেখাই তত বেশী বেশী করে ঐ আধখানা চাঁদকে ভালোবেসে ফেলি। ওটার দিকে তাকালেই মনটা আমার হাল্‌কা হয়ে যায়, ঐ চাঁদকে সবচেয়ে ভালোবাসি গ্রীষ্মকালে। সর্বদাই এটা ভীষণ ঠাণ্ডা-বরফের মত। মাটির উপর যে ছায়া ঐ চাঁদ সৃষ্টি করে তাকে আমি বেশী ভালোবাসি ; যদিও ছায়াটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। অস্পষ্ট ও নরম ছায়াগুলো দ্রুত মিলিয়ে যায়, পৃথিবীকে বিশেষ করে অন্ধকারে রেখে দিয়ে, তারাগুলিকে বিশেষ করে উজ্জ্বল রেখে এবং ফুলগুলিকে—বিশেষ করে তার সুগন্ধ বজায় রেখে। আমাদের প্রতিবেশীদের অনেক ফুলের ঝোপ ছিল। তাদের লম্বা লম্বা গাছের ফুল উড়ে এসে আমাদের অংগনে এক পরত বরফ কুঁচির মত পড়ে থাকতো।

* * *

মায়ের হাত হাজা ও কড়ায় ভরে গেল। কিন্তু মায়ের সেই হাতই যখন আমার পিঠে বুলিয়ে দিতেন মা তখন কি ভালোই না লাগতো। কিন্তু তাঁকে কষ্ট দিতে আমার ঘেন্না করতো কেননা জল লেগে লেগে তাঁর হাত ফুলে গিয়েছিল। বেশ রোগা হয়ে গিয়েছেন মা! ঐ দুর্গন্ধময় মোজা কাচার পর অনেক সময় তাঁর খাবার কোন বাসনাই থাকতো না। আমি জানতাম যে তিনি এর থেকে বেড়িয়ে আসার একটা রাস্তা খুঁজে বার করতে চেষ্টা করছেন। এটা আমি জানি। কোন কোন সময়ে তিনি একগাদা দুর্গন্ধময় কাপড় চোপড় এক দিকে সড়িয়ে রেখে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যেতেন। আবার কোন কোন সময় তিনি আপন মনে বক্‌বক্ করতেন। তিনি কি পরিকল্পনা করছেন? আমি তা আন্দাজ করতে পারতাম না।

* * *

মা আমায় তাঁর সংগে ভালো আচরণ করতে এবং তাঁকে বাবা বলে ডাকতে বলেছিলেন। আমার জন্যে উনি এক "বাবা" জোগাড় করে এনেছেন। আমায় এই কটি কথা বলার সময় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দিলেন তিনি। তাঁর চোখে জল এবং তিনি আমায় বললেন, "তোমায় ত আমি উপোস করিয়ে রাখতে পারি না।"

তাই বলো! আমায় যাতে উপোসী না রাখতে হয় সে জন্য তিনি আমার জন্য এক নোতুন "বাবা" জোগাড় করে এনেছেন। আমি এ সব খুব একটা বেশী তখন বুঝতাম না, আবার একটু ভয়ও পেয়েছিলাম। আবার একটু আশাবাদীও ছিলাম—হতে পারে আর হয়ত আমাদের উপোস করে থাকতে হবে না।

কি অপূর্ব যোগাযোগ। আমরা যেদিন ছোট ফ্ল্যাটটা ছেড়ে চলে যাই সেদিনও আকাশে আধখানা চাঁদ ভাসছিল। এটা আমার আগের দেখা সেই চাঁদ থেকে আরও উজ্জ্বল আরও ভীতিপ্রদ। যে ছোট ঘরটা আমার এত পরিচিত সেটা ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি। মা বিয়ের লাল পালকিতে বসে আছেন। আমাদের আগে আগে চলেছে একদল বাঁশী বাজিয়ে—বিশ্রীভাবে তারা বাঁশী বাজাচ্ছে। পেছনে পেছনে চলেছি সেই লোকটা আর আমি। তিনি আমার হাত ধরে আছেন; আধখানা চাঁদের আলো বেশ ক্ষীণ আর মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা বাতাসে তা কাঁপছে।

রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা বললেই চলে। কেবল খেঁকী কুকুর কয়েকটি বাঁশী বাজিয়ে যেতে দেখে ঘেউ ঘেউ করে ছুটছে। পাল্‌কী খুব জোরে ছুটছে। ওটা কোথায় চলেছে। মাকে কি শহরের বাইরে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? লোকটা আমায় এত জোরে টেনে নিয়ে চলেছে যে নিশ্বাস ফেলার ফুরসৎ পর্যন্ত পাচ্ছি না; কাঁদতে পর্যন্ত পাচ্ছি না, লোকটার ঘামে ভেজা হাতের তালুটা কি ঠাণ্ডা! ঠিক মাছের মত। আমি চীৎকার ক'রে ডাকতে গেলাম, "মা," কিন্তু সাহস পেলাম না। ঠিক আধবোজা বড় একটা চোখের মত আধখানা চাঁদকে দেখাচ্ছে। কিছুক্ষণ বাদে ছোট্ট একটা গলিতে পালকিটা ঢুকলো।

* * *

যে কোন কারনেই হোক পরের তিন চার বছর ধরে আমি আর আধখানা চাঁদ দেখিনি।

আমার নোতুন বাবা আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন। তাঁর ঘর ছিল দুটো। মা আর তিনি শুতেন ভেতরের ঘরে; আর আমি শুতাম

বাইরের ঘরে খড়ের মাদুরে। প্রথম প্রথম আমার ইচ্ছে হত মায়ের সঙ্গে শুতে। কিন্তু কয়েক দিন পর থেকে আমি "আমার" ঐ ছোট্ট ঘরটাকে ভালোবাসতে সুরু করে দিলাম, ঘরে একটা চেয়ার টেবিল আছে ; ঘরটা পরিষ্কার ভাবে সাদা চুনকাম করা। মনে হত এ সবই যেন আমার সম্পত্তি। আমার বিছানাটা মোটা আবার গরমও।

ক্রমে ক্রমে মায়ের দেহে মেদ জম্‌লো ; গালে রং ধরলো। হাতের হাজা কোথায় মিলিয়ে গেল। অনেক দিন হল আমি আর বন্ধক রাখার দোকানে যাই নি। আমার নোতুন বাবা আমায় স্কুলে যেতে দিলেন। মাঝে মাঝে আবার উনি আমার সংগে খেলাও করতেন। আমি যদিও তাঁকে পছন্দ করতাম তাহলেও কেন যে তাঁকে বাবা বলে ডাকতাম না তা আমি বলতে পারব না।

মনে হত এসবই তিনি বুঝতেন। কখনও কখনও আবার তিনি আমায় ভেংচি কাটতেন। সে সময় চোখ দুটো তাঁর ভারী সুন্দর দেখাতো। মা আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে ওঁকে "বাবা" বলে ডাকতে অনুরোধ করেন, এ নিয়ে আমি জেদ করি নি। কেন না আমি বেশ ভালো করে বুঝতাম যে ওঁর জন্যেই মা আর আমি খেতে পাচ্ছি।

হ্যাঁ, তিন চার বছর ধরে আধখানা চাঁদ দেখেছি বলে ত আমার মনে পড়ে না ; হয়ত দেখে থাকবো—তবে মনে নেই। তবে বাবা যেদিন মারা যান বা মায়ের বিয়ের পাল্‌কির আগে আগে যে আধখানা চাঁদ আমি দেখেছিলাম তা কোনদিনই ভুলতে পারবো না। ঐ পাণ্ডুর ঠাণ্ডা, আলো সর্বদাই আমার মনে গাঁথা হয়ে থাকবে। চাঁদটা এক টুকরো পান্নার মত ঠাণ্ডা ও উজ্জ্বল। কোন কোন সময় ওটার কথা যখনই ভাবতাম তখনই মনে হত হাত বাড়িয়ে ওটা বোধ হয় ধরা যাবে।

* * *

স্কুলে যেতে আমার ভালো লাগতো। আমার মনে হত স্কুল চত্বরটা বোধহয় ফুলে ফুলে ভরা, যদিও তা নয়, তাসত্ত্বেও স্কুলের কথা মনে পড়লেই ফুলের কথা মনে হত ঠিক সেভাবে যখন বাবার কবরের কথা মনে হলেই শহরের বাইরে সেই আধখানা চাঁদের কথা মনে পড়ে যেত,—যে চাঁদটা ক্ষেতের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসে একটু বাঁকা হয়ে শূন্যে ঝুলছে।

মাও ফুল ভালোবাসতেন। যদিও তা সংগ্রহ করার সংগতি তাঁর ছিল না। তবে কেউ যদি তাঁকে ফুল পাঠাতেন, সেটা তিনি চুলে পড়তেন।

একবার তাঁর জন্যে একগোছা ফুল তোলার সুযোগ আমার হয়েছিল। চুলে তাঁর তাজা ফুল গোঁজা থাকায় পেছন থেকে তাঁকে বেশ অল্পবয়স্কা দেখাতো। তিনি সুখী হতেন—আমিও।

স্কুলে যেতে পেরে আমি সুখী। বোধহয় সেজন্যে স্কুলের কথা মনে হলেই ফুলের কথা মনে পড়ে যেত।

* * *

ঠিক যে বছর আমি প্রাথমিক স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে বেড়িয়ে যাবো ঠিক সে বছরই মা আবার আমায় বন্ধক রাখার দোকানে পাঠালেন। আমার নোতুন বাবা আমাদের কেন ছেড়ে চলে গেলেন তা জানি না, তিনি যে কোথায় উধাও হলেন মাও তা হয়ত জানতেন না। মা আমার পড়াশুনা চালিয়ে যেতে বললেন। ওঁর ধারণা যে বাবা হয়ত আবার ফিরে আসবেন।

অনেকদিন পার হয়ে গেলেও তাঁর পাত্তা মিল্‌লো না। এমন কি তিনি চিঠি পর্যন্ত দেন নি। আমার ভয় ধরে গেল মাকে হয়ত আবার নোংরা মোজা কাচতে হবে, তাই তাঁর জন্যে আমার খুব কষ্ট হল।

মার পরিকল্পনা কিন্তু ছিল অন্যরকমের। উনি এখন সাজগোজ করেন, মাথায় ফুল গোঁজেন। অদ্ভুত-তাই না? তিনি আর কাঁদেন নি, সবসময় কেবল হাঁসেন। কেন? তখন বুঝতাম না। কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করছি যে যখনই স্কুল থেকে বাড়ী ফিরতাম দেখতাম উনি সেজেগুজে দরজায় দাড়িয়ে আছেন। অল্প কিছুদিন পরেই দেখি যে আমায় রাস্তাঘাটে লোকে ডাকাডাকি সুরু করে দিয়েছে।

"এ্যাই মাকে বলিস খুব শিগ্‌গিরি ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি।"

"খুব নরম নরম তুলতুলে হয়েছিস রে, আজ আস্‌বি নাকি?

লজ্জায় আমার মুখ যেন পুড়ে যাচ্ছে। যতটা সম্ভব মুখ নামিয়ে থাকি। এখন আমি বুঝি; কিন্তু এ ব্যাপারে তখন আমার কিছু করার ছিল না। মাকে আমি কোন প্রশ্ন করতে পারি না। না, পারি না। তিনি আমার সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। সব সময় বলতেন, "বই পড়, লেখা পড়া চালিয়ে যা।"

নিজে কিন্তু মা নিরক্ষর ছিলেন। আমার লেখাপড়া নিয়ে তিনি এত উদ্বিগ্ন কেন? আমার কেমন সন্দেহ জাগে। তারপরেই কিন্তু আমার মনে হত—অন্য কোন উপায় নেই বলে মা এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। আমার যখনই সন্দেহ জাগতো তখন আমি তাঁকে অভিসম্পাত দিতে

চাইতাম। আর অন্য সময় মনে হতো মাকে জড়িয়ে ধরে এ কাজ না করতে প্রার্থনা জানাতে।

মাকে সাহায্য করতে পারছি না বলে নিজের উপর ঘৃণা জাগত। আমি চিন্তিত। আমি প্রাথমিক শিক্ষা পাস করলেও কোন কাজে লাগবো কি ? আমি আমার সহপাঠিনীদের কাছ থেকে শুনেছিলাম যে গতবছরের উত্তীর্ণ অনেক ছাত্রীরা অনেকের উপপত্নী হয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। ওরা বলে যে কিছু মেয়ে আছে যারা "নিষিদ্ধ পল্লীতে" কাজ করে। এসব আমি তখন ভালো বুঝতাম না। তবে আমার সহপাঠিনীরা যেভাবে এ সব আলোচনা করতো তাতে এটা যে খারাপ কাজ তা আন্দাজ করতে পারতাম। আমার সহপাঠিনীরা মনে হত সব কিছু জানে। তারা ফিসফিস্ করে সে সব কথা বলতে ভালোবাসতো, যে কথাগুলো তারা ভালোভাবে জানতো ভালো কথা নয় বলে। এসব আলোচনা করার সময় তাদের মুখ চোখ লাল হয়ে যেত আবার সাথে সাথে আত্মতৃপ্তিও লাভ করতো।

মায়ের সম্বন্ধে সন্দেহ আমার ক্রমশঃ বেড়েই চলে। তিনি আমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছেন কি ? এই জন্যে কি যে উনি আমায়—"করতে পারেন ? এই রকম যখন ভাবতাম তখন আমি আর বাড়ী ফিরতে সাহস পেতাম না। মায়ের মুখোমুখী দাঁড়াতে কেমন যেন আমার ভয় ভয় করত। বিকেলে টিফিন কিনতে উনি যে পয়সা দিতেন তা আমি জমাতাম এবং ব্যায়ামাগারে যেতাম খালি পেটেই ; ফলে প্রায়ই আমায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে হত। অন্য শিশুরা যখন কেক চিবিয়ে খেত তখন কি যে আমার হিংসে হত। টাকা কিন্তু আমায় জমাতেই হবে। ঐ অল্প টাকা নিয়েই আমি পালিয়ে যেতে পারি যদি মা আমায় জোর করেন যে আমায়—।"

বড়জোড় আমি পনেরো সেণ্ট বাঁচাতে পারতাম, তার বেশী নয়। এমন কি দিনের বেলাতেও আমি আকাশের দিকে চেয়ে থাকতাম—আমার আধখানা চাঁদ দেখার আশায়। আমার মনের যন্ত্রণা যদি পার্থিব কোন জিনিষের সংগে তুলনা করতে হয় তাহলে তা আধখানা চাঁদের সংগে করা যেতে পারে। চাঁদটা অসহায় ভাবে ধূসর নীল শূন্যে ঝুলছে। তার ক্ষীণ আলোকে অন্ধকার দ্রুত গিলে নিয়েছে।

* * *

সবচেয়ে আমার যেটা খারাপ লাগতো তা হল আমি ক্রমশঃ মাকে ঘৃণা

করতে শিখলাম। কিন্তু ঘৃণা করার সাথে সাথে এটাও মনে পড়ে যেত যে তিনি কেমন করে তাঁর পিঠে বেঁধে বাবার কবরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে আর ঘৃণা করতেও পারতাম না। তা সত্বেও ঘৃণা আমায় করতেই হত। আমার হৃদয়···আমার হৃদয় আধখানা চাঁদের মতোই—সে কেবল তার মত অসীম, কালো অন্ধকারে পরিবৃত হয়ে অল্প সময়ের জন্য জ্বলজ্বল করে।

এখন মায়ের ঘরে ঘন ঘন লোক আসতে থাকে ঃ এ ব্যাপারটা তিনি আমার কাছ থেকে আর গোপন করার চেষ্টা করেন না। লোকগুলো আমার দিকে তাকিয়ে থাকে কুকুরের মত—তাদের জীভ থেকে লালা গড়িয়ে পড়ে। তাদের চোখে আমি মায়ের চেয়েও সুস্বাদু বস্তুবিশেষ। আমি এটা পরিষ্কার বুঝতে পারতাম।

খুব অল্প সময়ের ভেতরে অনেক কিছু আমি বুঝতে শিখলাম। আমি জানতাম যে আমায় নিজেকে রক্ষা করতে হবে। বেশ অনুভব করতাম যে আমার দেহে এমন কিছু রয়েছে যা বিশেষ মূল্যবান; আমার দেহের সৌরভ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম। ভীষণ লজ্জা করছে আমার; একের পর এক আবেগে আমি ছিন্নবিছিন্ন হয়ে গেলাম। আমার মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যা ব্যবহার করে আমি নিজেকে রক্ষা বা ধ্বংস করে দিতে পারি। মাঝে মাঝে আমি শক্ত ও দৃঢ় থাকতাম, আবার কোন কোন সময় দুর্বল, অরক্ষিত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়তাম।

মাকে আমি ভালোবাসতে চাই। মনে অনেক কথা আছে যা তাঁকে জিজ্ঞেস করতে চাই। তাঁর সান্ত্বনা আমার দরকার। আবার ঐ ঠিক একই সঙ্গে তাঁকে, আমায় এড়াতে হত, ঘৃণা করতে হত। তা না হলে আমার নিজের অস্তিত্বই হারাতে হত।

বিছানায় নিদ্রাহীন শুয়ে সমস্ত ব্যাপারটা শান্তমনে বিচার করে দেখলাম যে মা করুণা পেতে পারেন। তাঁকে আমাদের দুজনের খাদ্য সংগ্রহ করতে হচ্ছে। কিন্তু তার পরেই চিন্তা করতাম—কিন্তু যেভাবে তিনি তা জোগাড় করছেন তাতে করে সে খাদ্য আমি খাই কি করে?

এইভাবে আমার মেজাজ ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে। পরিবর্তিত হচ্ছে শীতকালের বাতাসের মত—মুহূর্তের জন্য তা বন্ধ হয়ে আবার আগে জোরে বয়ে চলে। আমি বেশ পরিষ্কার ভাবে লক্ষ্য করছি যে আমার মনের মধ্যে রাগ ক্রমশ চড়ছে—এবং তা রোধ করতে আমি অপারগ।

* * *

সমস্যা সমাধানের পথ চিন্তা করার আগেই ব্যাপারটা আরও খারাপের দিকে গেল। মা জিজ্ঞেস করলেন, কি ঠিক করলি? "তিনি বললেন সত্যি যদি তাঁকে আমি ভালোবাসি ত তাঁকে আমার সাহায্য করা উচিত। তা না হলে তিনি আমার দায়িত্ব নিতে পারবেন না। মা যে একথা বলতে পারেন তা মনে না হলেও দেখা গেল তিনি তা বললেন। ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করতে বললেন। আমার বয়স হচ্ছে। আর দু এক বছর পরে তারা আমায় আর চাইবেই না—সে মাগনায় দিলেও না।"

কথাটা কিন্তু সত্যি। মায়ের মুখে ইদানিং ভাঁজ পড়ছে—তা মুখে তিনি যতই পাউডার ঘসুন না কেন? অনেক লোককে আনন্দ দেবার মত তাঁর আর শক্তি নেই। এখন তিনি কেবল একজনকে দেহ দান করার কথা ভাবছেন। এক বাষ্পে তৈরী রুটির দোকানের মালিক মাকে পছন্দ করতেন। তিনি তাঁর কাছে এখনই চলে যেতে পারেন; কিন্তু এখন আমি বড় হয়েছি। ছোট বয়সে যেমন করেছি এখন ত সেই রকম আমি আর পালকির পেছু পেছু ছুটতে পারবো না। নিজের দায়িত্ব আমার নিজেকেই নিতে হবে। আমি যদি মাকে সাহায্য করতে রাজি থাকি ত মাকে আর ঐ লোকটার কাছে যেতে হবে না। আমি তখন একাই দুজনের জন্যে টাকা আয় করতে পারি।

টাকা রোজগারে আমার আগ্রহ ছিল; তবে যে পদ্ধতিতে তা তিনি আমায় করতে বলছেন তা ভাবলেই আমি শিউড়ে উঠি। আমি ত কিছুই জানি না; তাই মধ্যবয়সী মহিলার মত নিজেকে ফেরি করব কি করে? মায়ের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে; কিন্তু টাকার প্রয়োজন আরও ভীষণ। তিনি আমায় কোন পথে চলবো তা ঠিক করতে বাধ্য করেন নি। তা ঠিক করার দায়িত্ব আমার উপরই ছেড়ে দিয়েছেন। হয় আমায় তাঁকে সাহায্য করতে হবে। নচেৎ আমাদের দুজনকে ভিন্ন ভিন্ন পথে চলতেই হবে। মা কিন্তু কাঁদলেন না। অনেকদিন আগেই তাঁর চোখের জল শুকিয়ে গেছে।

কিন্তু আমি এখন কি করি?

*   *   *

স্কুলের অধ্যক্ষার সাথে আলোচনা করলাম। তিনি চল্লিশ বছর বয়সের এক মোটাসোটা মহিলা। দেখতে খুব একটা সুন্দর না হলেও স্নেহশীলা দয়ালু ছিলেন তিনি। আমার নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়েছিল তা না হলে মায়ের সম্বন্ধে এত কথা তাঁকে বললাম কি করে?···আসলে আমি তাঁকে খুব ভালো করে চিনতাম না। তাঁর সংগে কথা বলার সময় মনে হচ্ছিল

আমার গলায় কে যেন গরম আগুনের ছ্যাঁকা দিচ্ছে। তাঁকে আমার যা বলার ছিল তা সব আমি তোৎলাতে তোৎলাতে অনেক সময় নিয়ে বলে ফেললাম।

তিনি বললেন আমায় তিনি সাহায্য করবেন। টাকাকড়ি দিতে না পারলেও তিনি দুবেলা খেতে এবং একটা থাকার জায়গা দেবেন—আমি স্কুলের এক পরিচারিকার সাথে থাকতে পারি; সে স্কুল বাড়ীতেই থাকে। আরও তিনি জানান যে আমি লেখা-জোখার ব্যাপারে স্কুলের কেরানীকে সাহায্য করতে পারি; তবে তা এখনই নয়। কেন না আমার হাতের লেখা আরও মক্স করা দরকার।

দিনে দুবার খাওয়া ও থাকার একটা জায়গা! সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আমায় আর মায়ের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে না।

এবার মা কিন্তু বিয়ের পাল্‌কীতে চেপে গেলেন না। স্রেফ একটা রিক্সায় চেপে সেই রাতেই ঐ লোকটার কাছে চলে গেলেন। আমার বিছানাটা তিনি আমায় রাখতে দিলেন।

চলে যাবার সময় চোখের জল না ফেলতে অনেক চেষ্টা করে ছিলেন, কিন্তু তাঁর হৃদয়ের অশ্রু জল শেষ পর্য্যন্ত জলের তোড়ের মত বেড়িয়ে এল। তিনি জানতেন যে আমি—তাঁর নিজের মেয়ে—তাঁর কাছে বিদায় জানাতে আসতে পারি না। আমার কথা বললে বলতে হয় আমি সুন্দর ভাবে কাঁদতে পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছিলাম—আমি মুখ হাঁ করে করে কাঁদলাম—চোখের জলে মুখ আমার ভেসে গেল। আমিই তাঁর মেয়ে, বন্ধু-একমাত্র সান্ত্বনা। তাঁকে আর আমার সাহায্য করা হল না—যতক্ষণ না আমি এমন একটা কিছুতে রাজী না হচ্ছি। ওটা করতে আমি রাজী হতে পারি না।

তিনি চলে যাবার পর আমি ভাবতে বসি। আমরা—মা আর আমি যেন রাস্তার নেড়ী কুকুর দুটো। আমাদের দুটো মুখে খাদ্য জোটাতে আমরা সব রকমের দুঃখ দুর্দশা ভোগ করাটা মেনে নিয়েছি। যেন মুখ ছাড়া দেহের অন্যান্য অংগের দরকার নেই। আমাদের মুখে দুটো খাদ্য জোটাতে আমাদের বাকি সব কিছু অংশ বেচতে হচ্ছে।

মাকে আমি ঘৃণা করি না। আমি সব বুঝি। এটা তাঁর অপরাধ না; মুখ থাকাটা তাঁর অন্যায় কিছু নয়। অপরাধ নিহিত রয়েছে খাদ্যে। আমরা কি জন্যে খাদ্য থেকে বঞ্চিত হবো?

অতীতের সব দুঃখ কষ্টের স্মৃতি ভীড় করে আসে আমার মনে। কিন্তু

আমার চোখের জলের সংগে পরিচিত সেই আধখানা চাঁদ এবার উদয় হল না। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। জোনাকির আলো পর্য্যন্ত নেই। মা যেন ভূতের মত নিরবে ছায়াহীনের মত অন্ধকারে মিশে গেছেন। আগামীকাল তিনি মারা গেলে তাঁকে হয়ত বাবার পাশে গোড় দেওয়া হবে না। এমন কি আমি তাঁর কবরটা চিনতে পর্য্যন্ত পারবো না। তিনি আমার একমাত্র মা, একমাত্র বন্ধু। এখন থেকে পৃথিবীতে আমি একা।

* * *

আর কখনও মাকে আমি দেখতে পাবো না। বরফ পড়ে বসন্তকালের ফুলকে যেমন শক্ত করে দেয় ঠিক সেইভাবে আমার হৃদয়ে প্রেম মরে গেল। হাতের লেখা ভালো করতে আমি জোর কদমে মক্স করা চালিয়ে যেতে থাকি যাতে করে অধ্যক্ষার জন্য ছোট ছোট দলিল লেখায় আমি তাঁর কেরানীকে সাহায্য করতে পারি। আমাকে কাজের লোক হয়ে উঠতেই হবে—কেন না আমি অন্য লোকের অন্ন ধ্বংস করছি। আমি আমার সহপাঠিনীদের মত, যারা সারা দিন ধরে অন্যান্যরা কি খায়, কি বলে, কি পড়ে, কেবল তাই লক্ষ্য করে তা হতে চাই না। আমি নিজের উপর মনোযোগ দি। আমার ছায়াই এখন আমার একমাত্র বন্ধু। "অহং" ভাবটা সবদাই আমার মনে থাকে; কেন না কেউ আমায় ভালোবাসে না। আমি নিজেকে ভালোবাসি, করুণা করি, উৎসাহিত করি, তিরস্কার করি। আমি নিজেকে এমন ভাবে চিনি যেন "আমিটা" অন্য কেউ একজন।

আমার দেহের পরিবর্তনটা এমন ভাবে এল যা দেখে আমি ভয় পেলাম, খুশী হলাম আবার বিহ্বল হলাম। যখন হাত দিয়ে তা স্পর্শ করি তখন মনে হয় আমি যেন কোমল, মনোরম কোন ফুল হাতে ধরে আছি।

আমার চিন্তা কেবল বর্তমানকে নিয়ে। আমার কোন ভবিষ্যৎ নেই; আগ বাড়িয়ে অনেক দুর পর্য্যন্ত দেখতে সাহস পেলাম না। অন্য লোকের অন্ন যেহেতু ধ্বংস করছি তখন আমায় কখন দুপুর, কখন বিকেল হয় তা জানতেই হবে। তা না হলে সময় নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোন প্রয়োজনই আমার ছিল না। আশা বাদ দিয়ে সময় নিয়ে চিন্তা করা যায় না। কে যেন আমায় পেরেক ঠুকে এমন এক জায়গায় আটকে রেখেছে যেখানে দিন নেই, মাস নেই। মায়ের সাথে কতদিন আমি থেকেছি তা বিচার

করে দেখি যে তা ১৫।১৬ বৎসর হবে। আমার সহপাঠিনীরা আগ্রহ সহকারে সব সময় অপেক্ষা করে থাকে কখন কবে ছুটি হবে, নববর্ষের ছুটি কবে আসবে, কবে কোন উৎসব। আমার এ সবে দরকার কি ?

আমার দেহ সম্পূর্ণতা লাভ করতে চলেছে। আমি তা বেশ অনুভব করতে পারি। এটা আমায় বিভ্রান্ত করে তোলে। আমি নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারি না। আমি জানি আমি সুন্দরী। সৌন্দর্য্য আমার সামাজিক মর্য্যাদা বাড়িয়ে দেয়। এটাই আমার সান্ত্বনা। আমার মনে পড়ে যে সুরুতে আমার কোন সামাজিক মর্য্যাদাই ছিল না ; তখনই এই সান্ত্বনাটাই তেঁতো লাগে। আমার সৌন্দর্য্যের জন্য আমি গর্বিত। আমি দরিদ্র কিন্তু সুন্দরী। হঠাৎই এক ভীতিপ্রদ চিন্তা মনে এলো—মাকেও খারাপ দেখতে ছিল না।

* * *

অনেকদিন হল ঐ আধখানা চাঁদ দেখি নি। এমন কি তা দেখতে চাইলেও দেখার সাহস হল না। আমি পরীক্ষায় পাস করে গেলেও স্কুলেই থাকি। বিকালে আমি একাই দুজন পরিচারক—একজন পুরুষ, এক মহিলা—এর সংগে থাকি। আমার সংগে তারা কি আচরণ করবে তা তারা নিজেরাই ভালো ভাবে জানে না। আমি এখন আর ছাত্রী নই, আবার শিক্ষিকাও নই, যদিও পরিচারিকাদের সংগে অনেকাংশে আমার মিল আছে তাহলেও আমি তা ত নই।

রাতে স্কুল প্রাংগনে একা একা হেঁটে বেড়াতাম। প্রায়ই আধখানা চাঁদের তাড়া খেয়ে ঘরে ঢুকে পড়তাম। ওটার সম্মুখীন হবার সাহস আমার নেই। কিন্তু আমার ঘরে বসে তার ছবি আঁকতাম—বিশেষ করে সে সময় যখন ফুরফুরে বাতাস থাকতো। মৃদু বাতাসে চাঁদের ক্ষীণ পাণ্ডুর ছটা সরাসরি আমার হৃদয়ে চলে গিয়ে আমার অতীতকে মনে করিয়ে দেয়, ফলে আমার ট্র্যাজিডির পূর্বাভাসকে তীব্র করে তোলে। আমার হৃদয়টা চাঁদনীরাতে বাদুড় যেন—আলো থাকা সত্বেও একটা অন্ধকার বস্তু ; ওটা কালো—যদিও ওটা উড়তে পারে তাহলেও কালো আমার কোন আশা নেই। তার জন্য কিন্তু কাঁদি নি। কেবল ভ্রূকুটি করেছিলাম।

* * *

কয়েকজন ছাত্রীদের পোষাক সেলাই করে কিছু রোজগার করেছিলাম।

অধ্যক্ষা ওটা কবার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু বেশী রোজগার করতে পারি নি কেন না সেলাই-এর কাজ ওরাও জানতো। তারা যখন অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতো ঠিক তখনই সেলাই-এর জন্য আসতো আমার কাছে। তাহলেও মনটা বেশ হাল্‌কা মনে হত। এমন কি এখনও ভাবতাম যে মা যদি এখন ফিরে আসেন তাহলে তাঁর দায়িত্ব ও আমি হয়ত নিতে পারতাম।

অর্থ গোনার সময় জানতাম যে এটা অলীক স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু যাহোক এই চিন্তায় আমি বেশ ভালো বোধ করতাম, আমি চাইতাম মাকে ফিরে পেতে। যদি তিনি আমার দেখা পান নিশ্চয় তাহলে আমার সংগে তিনি চলে আসবেন। আমাদের ঠিক চলে যাবে—আমি ভাবতাম। কিন্তু আমি নিজে সর্বতোভাবে তা বিশ্বাস করতাম না। মায়ের কথা আমার সব সময় মনে হতো। তাঁকে প্রায়ই আমি স্বপ্নে দেখতাম।

কোন একদিন কয়েকজন ছাত্রী সহ আমি গাঁয়ের দিকে চড়ুইভাতি করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ফেরার পথে দেরী হচ্ছে মনে করে সর্টকাট একটা ছোট গলির ভেতর দিয়ে আমরা আসতে আসতে মাকে দেখলাম। ঐ বাষ্পে তৈরী রুটির দোকানের বাইরে একটা বাক্সের ভেতরে বাষ্পে তৈরী রুটির মত দেখতে সাদা রং করা কাঠের বস্তু একটা রয়েছে। দেওয়ালের পাশে বসে মা একটা হাঁপর টানছেন আর ছাড়ছেন। ওঁর কাছ থেকে অনেক দুরে থেকেই আমি মাকে সাদা বাষ্পে তৈরী রুটি চিবতে দেখেছিলাম। পেছন থেকেই তাঁকে আমি চিনতে পেরেছিলাম। ইচ্ছে করলো। ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরি। কিন্তু সাহস হলো না। আমি ভয় পেলাম—ছাত্রীরা হয়ত আমায় দেখে হাঁসবে। আমার এই রকম একটা মা থাকুক তাবা হয়ত তা চাইবে না।

আমরা পরস্পরের খুব কাছে এসে পড়েছি। মাথা নিচু করে জলভরা চোখে মাকে দেখলাম। তিনি আমায় দেখতে পান নি। আমাদের পুরো দলটাই তাঁকে যেন ছুঁয়ে গেল। হাপর টানায় ব্যস্ত থাকায় নিশ্চয়ই তিনি আমায় দেখতে পান নি।

তাঁকে ছাড়িয়ে অনেকটা দুর চলে যাবার পর পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম তিনি তখনও হাঁপর টানছেন। পরিষ্কার ভাবে তাঁর চেহারাটা দেখতে পেলাম না। আমার কেবল চোখে পড়লো যে তাঁর কপালে কয়েক গোছা চুল উড়ছে। মনে মনে এই গলির নামটা মনে রেখে দিলাম।

* * * *

একটা ছোট্ট ছাড়পোকা আমার হৃদপিণ্ডটা যেন আঁচড়াচ্ছে। মায়ের সংগে দেখা আমায় করতেই হবে। নচেৎ শান্তি পাবো না মনে।

ঠিক এ সময় স্কুলে এক নোতুন অধ্যক্ষা নিযুক্ত হয়েছেন। বিদায়ী মোটা মহিলা আমায় অন্য নোতুন কোন পরিকল্পনা ভাবতে বললেন। তিনি যতদিন ছিলেন,—ততদিন খেতে পড়তে দিয়েছেন; নোতুন অধ্যক্ষা তা করবেন কি না তার নিশ্চয়তা তিনি দিতে পারেন না।

টাকা গুনলাম। আমার দু'ডলার কয়েক সেন্ট পয়সা আছে। আগামী কয়েকদিন অনাহার থেকে রক্ষা পাব। কিন্তু আমি যাবোটা কোথায়?

বসে বসে চিন্তা করে কোন লাভ নেই। অন্য কিছু একটা ভাবতে হবে।

মায়ের সাথে দেখা করা—এটাই আমার প্রথম কাজ হবে। কিন্তু তিনি কি আমায় তাঁর সঙ্গে থাকতে দেবেন? তা যদি তিনি করেন তাহলে দোকানের মালিকের সাথে তাঁর ঝগড়া বাঁধবে। অন্ততঃ তিনি ব্যথা পাবেন। তাঁর দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে। তিনি আমার মা আবার মাও নন। দারিদ্রের প্রাচীর দিয়ে আমরা দুজনে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন।

এ ব্যাপার নিয়ে মনে মনে খানিক উড়ো চিন্তা করে শেষ পর্য্যন্ত মার কাছে যাবার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিলাম নিজের বোঝা আমায় নিজেই বইতে হবে। কেমন করে বইব? জানি না। মনে হল পৃথিবীটা বড় ছোট্ট—সেখানে আমার ও আমার বিছানার জায়গা হবে না। এমন কি একটা কুকুর পর্যন্ত আমার থেকে ভালো আছে। সে যত্রতত্র শুয়ে পড়তে পারে। আমার কিন্তু রাস্তায় শোয়ার অনুমতি নেই। হ্যাঁ আমি একটা জীব—কুকুরের অধম।

আমি যদি না যেতে চাই? নোতুন অধ্যক্ষা কি আমায় তাড়িয়ে দেবেন? আমি সে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো না। এখন বসন্তকাল আমি সবুজ পাতা ও ফুল দেখলেও দেহমনে কোন উষ্ণতা অনুভব করলাম না ফুলের লাল রং আর পাতার সবুজ রং আমার কাছে কেবল রং মাত্র। আমার কাছে তার অন্য কোন বিশেষ তাৎপর্য্য নেই। আমার মনের বসন্ত ঠাণ্ডায় মরে গেছে। আমি কাঁদতে না চাইলেও দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নামে।

* * * *

আমি চাকরীর খোঁজে বেড়িয়ে পড়লাম। মায়ের কাছে যাবো না। কারোর উপর নির্ভর করবো না। নিজের .অন্ন আমি নিজেই জোগাড় করবো।

অনেক আশা নিয়ে দুটো দিন ধরে চাকরীর খোঁজ করলাম। কিন্তু যা পেলাম তা হল কেবল ধূলো আর চোখের জল। আমার করার মত কোন কাজই নেই। তার পরই মাকে প্রকৃতই উপলব্ধি করে সত্যি সত্যি তাঁকে ক্ষমা করে দিলাম। তিনি অন্তত্য, দুর্গন্ধ মোজা কেচেছিলেন। আমি এখন কি তাও পারি না। মা সেই রকম রাস্তাটাই গ্রহণ করেছিলেন যেটা তাঁর সামনে খোলা পড়েছিল। স্কুল আমায় যে নৈতিকতা আর শিক্ষা দিয়েছিল তা একটা বিরাট ঠাট্টা, তা কেবল ভরা পেটও অপব্যয় করার সময় আছে এমন মানুষদের খেলনা মাত্র। ছাত্রীরা আমার মায়ের মত মা থাকা বরদাস্ত করবে না। তারা দেহপোজীবীদের ঘৃণা করে। তাদের পক্ষে এটাই যুক্তি সংগত কাজ—কেননা তারা নিয়মিত খেতে পায়।

মোটামুটি আমি মনস্থির করে ফেলি যে কেউ যদি আমায় খেতে দেয় তাহলে যে কোন কাজ করতে আমি রাজী। আমি আত্মহত্যা করতে পারি নি যদিও তা করার চিন্তা করেছিলাম। না, আমি বাঁচতে চাই, আমি যুবতী, সুন্দরী, আমি বাঁচতে চাই। কোন লজ্জা আমার থাকার কথা নয়।

* * *

এমনভাবে চিন্তা করতে করতে মনে হল আমি যেন চাকরী পেয়ে গেছি। চাঁদনী রাতে আমি উঠোনে সাহস ভরে হাঁটতাম শূন্যে বসন্তকালের আধখানা চাঁদ ঝুলছে। আমি চাঁদ দেখেছিলাম এবং তা অতীব সুন্দর। আকাশটা ঘন নীল এবং কোথাও এক টুকরো মেঘ নেই। সচ্ছল ও মনোরম চাঁদ তাঁর কোমল ছটায় উইলো গাছকে যেন স্নান করিয়ে দিচ্ছে। ফুলের গন্ধে ভরা মৃদু বাতাস গাছের শাখাকে উঠোনের প্রাচীরের উজ্জ্বল কোণ থেকে অন্ধকার কোণে সামনে পেছনে দোলাচ্ছে। আলোটার তেজ কম; ছায়াটাও গভীর নয়। বাতাস মৃদু মৃদু বইছে। সবকিছুই মনোরম, ঝিমোচ্ছে, আবার ধীরে ধীরে নড়ছে। চাঁদের ঠিক নিচে আর উইলো গাছের উপরে এক জোড়া তারা যেন সুন্দরী পরীর হাঁসিখুসীর চোখের মত বাঁধন আধখানা চাঁদ আর উইলো গাছের মাটির উপর ঝুলে থাকা শাখার দিকে দুষ্টু দুষ্টু মুখে চোখ পিটপিট করছে। প্রাচীরের গায়েই গাছে থোকা থোকা ফুল ফুটেছে। চাঁদনী রাতে গাছের

অর্দ্ধেকটা বরফের মত সাদা, বাকি অর্দ্ধেকটা হালকা ছাই রং ছায়ায় চিত্রবিচিত্র করা। পরিবেশ যেন অবিশ্বাস্য রকমের পবিত্রতার ছবি।

আমি নিজেকে বলি, ঐ আধখানা চাঁদই হচ্ছে আমার আশার স্থরু।

* * *

আমি আবার মোটা সোটা অধ্যক্ষার সাথে দেখা করতে গেলাম। উনি তখন ছিলেন না। এক যুবক আমায় বাড়ীর ভেতরে নিয়ে গেলেন। তাঁকে ভীষণ ভালো দেখতে আর বেশ মিশুকে। সাধারণতঃ পুরুষ মানুষকে আমি ভয় করি, তবে ওঁকে দেখে আমার এক ফোঁটা ভয় করে নি, তাঁর হাসিটা এতই মনোমুগ্ধ করে যে আমি তাঁর সমস্ত কথার জবাব দিলাম। অধ্যক্ষার সাথে আমার দেখা করার উদ্দেশ্য তাঁকে জানালাম। তিনি এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে আমায় সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

উনি সে রাতেই আমার ঘরে এসে দু-ডলার দিয়ে গেলেন। আমি তা প্রত্যাখান করতে যেতেই তিনি জানান যে টাকাটা ওঁর খুড়িমার—ঐ মোটা অধ্যক্ষার। উনি জানান যে ওঁর খুড়িমা আমার থাকার একটা ব্যবস্থা করেছেন। তিনি আরও বললেন যে আমি ইচ্ছে করলে সেখানে কালই চলে যেতে পারি। প্রথমটা আমি একটু সন্দিগ্ধ হলেও ওঁর হাসি আমার মন কেড়ে নিয়েছে। আমার মনে হল যে লোকটা এত সুবিবেচক ও আর এত সুন্দর যে তাঁকে সন্দেহ করা অন্যায়।

* * *

আমার গালে ওঁর হাঁসিভরা মুখ। ওঁর মাথার চুলের উপর দিয়ে তাকিয়ে দেখি যে আধখানা চাঁদও হাঁসছে। ঐ আধখানা চাঁদ ও একজোড়া বসন্তের তারাকে প্রকাশ করতে মাতাল করা বাসন্তী মৃদু বাতাস আকাশে বসন্তকালের মেঘকে উড়িয়ে দিয়েছে। নদীর তীরে নুয়ে পড়া উইলো গাছের ডাল দুলছে, ব্যাঙের দল প্রেম সংগীত গাইছে, কচি কচি শরগাছের গন্ধ বসন্তকালের বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। আমি জল প্রবাহের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

তারা নমনীয় শর গাছের জন্য খাদ্য বয়ে আনছে যাতে করে তারা তাড়াতাড়ি দৈর্ঘে বাড়তে পারে এবং শক্তপোক্ত হতে পারে। ভিজে উষ্ণ মাটিতে কচি কচি চারা গজাচ্ছে; প্রতিটি জীব বসন্তকালের শক্তি আহরণ করে মিষ্টি সৌরভ ছড়াচ্ছে।

আমি আমাকে ভুলে গেলাম; আমার নিজস্ব কোন সত্তা নেই। ঐ শান্ত বাতাসে, ঐ ক্ষীণ চাঁদের আলোয় আমি যেন দ্রবীভূত হয়ে গেছি। হঠাৎই একটা মেঘ চাঁদকে ঢেকে দেয়। আমি আধখানা চাঁদকে হারালাম তার সাথে নিজেকেও। আমি ঠিক একেবারেই মায়ের মত।

* * *

আমি অনুতপ্ত কিন্তু মনে শান্তি পেয়েছি। কান্না পাচ্ছে আমার; তবে খুসী। আমার কেমন লাগছিল তা বলে বোঝানো যাবে না। আমি পালাতে চেয়েছিলাম যাতে করে তাঁর সংগে কখনও আর দেখা না হয়। কিন্তু সে সকল সময় আমার মন ভরে থাকে। আর তাঁকে ছাড়া আমি সম্পূর্ণ একা।

আমি ছোট্ট একটা ঘরে একা থাকি। উনি রোজ রাতে আমার কাছে আসতেন—সব সময় সুন্দর, সর্বদাই কোমল। তিনি আমার অন্ন জোগাতেন, পোশাক কিনে দিতেন। আমি যখনই কোন নতুন গাউন পরতাম, দেখতাম যে আমায় খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি পোশাক পরিচ্ছদকে ঘৃণা করলেও তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া আমার সহ্য হবে না।

কোন কিছু চিন্তা করতে আমার সাহস হয় না। আমি চিন্তা বিমুখ। গালে রুজ মেখে আমি মোহগ্রস্তের মত খানিক ঘুরে বেড়াই। সাজতে ভালো না লাগলেও সাজতে আমাকে হয়। তাছাড়া সময় কাটাবো কেমন করে? সব অলংকার গায়ে চড়িয়ে আয়নায় আমার প্রতিবিম্ব দেখে তাকে প্রশংসা করি; আবার সাজা শেষ হলে নিজেকে ঘৃণা করি। করতে থাকি।

আমার চোখে এখন সহজেই জল আসে, যদিও না কাদার চেষ্টা করি অনেক। আমার ভিজে চকচকে চোখকে সর্বদাই সুন্দর দেখাতো।

কোন কোন সময় ওকে চুম্বন করি পাগলের মত; তার পরই তাঁকে ঠেলে সড়িয়েদি, এমন কি তাঁকে গাল মন্দ পর্যন্ত করি। কিন্তু তিনি কখনও তাঁর সেই হাসি বন্ধ করতেন না।

* * *

গোড়া থেকেই জানতাম যে আমার কোন আশাই নেই। যে কোন এক খণ্ড মেঘ ঐ আধখানা চাঁদকে ঢেকে দিতে পারে, আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

অনতিকাল পরেই সুনিশ্চিত ভাবে যে মুহূর্তে বসন্ত চলে গিয়ে গ্রীষ্মকাল এল ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে বসন্তের স্বপ্ন খতম হয়ে গেল।

একদিন ঠিক দুপুর বেলায় এক যুবতী মহিলা আমার সংগে দেখা করতে এলেন। মেয়েটি দেখতে ভারি সুন্দর। ঠিক যেন নিস্তেজ পুতুল একটা ঘরে ঢুকেই তিনি কাঁদতে শুরু করে দেন। তার কোন কিছু বলার দরকার ছিল না। তিনি কি বলবেন তা আমার আগেই জানা ছিল।

হৈ-চৈ বাঁধাতে তিনি আসেন নি। আর আমিও তাঁর সাথে ঝগড়া করতে চাইনি। মেয়েটা সৎ, সরল ধরনের। কাঁদতে কাঁদতে আমার হাত ধরে মেয়েটি বললে ও আমাদের দুজনকেই ঠকিয়েছে।

প্রথমে মনে করেছিলাম মেয়েটি বুঝি তাঁর আরেক 'প্রেমিকা।' না মেয়েটা তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী। তিনি আমায় বকাবকি করলেন না; খালি বারবার বলে গেলেন, "দয়া করে ওঁকে ছেড়ে দেন।"

আমি কি করব তা জানি না। যুবতী মেয়েটার জন্য সত্যি আমার দুঃখ হয়। পরিশেষে আমি তা করতে রাজী হতেই সংগে সংগে তিনি আবার হাসি খুসী হয়ে পড়েন। তাঁকে দেখে সহজ সরল বলেই ত মনে হয়। তিনি একমাত্র যা চাইতেন তা হল তাঁর স্বামীকে ফিরে পেতে।

* * *

ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। যুবতী মেয়েটা যা চাইল তাতে সম্মত হওয়া সহজ, তবে এখন আমি কি করব? যে সব জিনিষ উনি আমায় দিয়েছেন তা আমি চাই না। যেহেতু আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি তাই এই বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণ হওয়া উচিত। কিন্তু আমার নিজের বলতে যা বোঝায় তা ত ঐ সবই। আমি এখন কোথায় যাবো? আমি কি তখন নিজের অন্ন জোগাড় করতে পারবো? তাঁর দানসামগ্রীর অন্ততঃ কিছু অর্থ মূল্য আছে। খুব ভালো, ওগুলো আমি রেখে দেব। আমার পছন্দ-অপছন্দ বলে এখন কিছু নেই।

চুপিচুপি আমি ওখান থেকে সড়ে গেলাম। যদিও তাতে আমার কোন অনুতাপ নেই তাহলেও মনটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। আমি যেন একখণ্ড ভাসমান মেঘ।

ছোট একটা ঘর ভাড়া নিলাম তারপর ঘড়ির কাঁটা ধরে বিছানায় শুয়ে পড়ি।

* * *

মিতব্যয়িতার সাথে খরচ করতে আমি ভালোভাবে জানতাম। অর্থ কি মূল্যবান সম্পদ ছেলেবেলা থেকে তা আমার জানা ছিল। যদিও এখনও কয়েক ডলার আমার আছে তা সত্ত্বেও এখখুনি চাকরীর সন্ধানে

বেড়িয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নি। যদিও চাকরীর ব্যাপারে আমার বিরাট আশা কিছু ছিল না তা সত্বেও মনে হয়েছিল এটাই নিরাপদ রাস্তা।

চাকরী খোঁজটা এবার কিন্তু অত সহজ হল না। কারণ গতবারের তুলনায় বয়স আমার আরও দু-এক বছর বেড়ে গেছে এখন। আমি চাকরীর চেষ্টা এই জন্যে চালিয়ে গেলাম যে তাতে কোন ভালো ফল পাওয়া যাবে বলে নয়। কিন্তু এই জন্যে আমি মনে করেছিলাম এটাই করা যথাযথ হবে।

মেয়েদের কাছে টাকা রোজগার করা এত কঠিন কেন? মা ঠিক কাজই করেছিলেন। টাকা রোজগারের জন্য মেয়েদের কাছে একমাত্র যে রাস্তাটা খোলা ছিল তিনি তাই গ্রহণ করেছিলেন। যদিও আমার কাছে জানা ছিল যে অনতিকালের মধ্যে ঐ কাজই আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, তাসত্বেও এখনই ঐ কাজ গ্রহণ করলাম না।

যত বেশী করে সংগ্রাম করে চলি ততই বেশী বেশী ভয় পেয়ে যাই। আমার আশাটা যেন প্রতিপদের চাঁদের আলো; খানিক বাদেই তা চলে যাবে।

দু হপ্তা পরে, আমি যখন চাকরী সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দেব ভাবছি ঠিক সেই সময় একদিন একটা ছোট্ট রেস্তোঁরার মেয়েদের সারিতে দাঁড়িয়ে পড়লাম। রেস্তোঁরাটা বড়ই ছোট; কিন্তু তার মালিক, যিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করছেন, খুব মোটা। আমরা সবাই যেন প্রাইমারী পরীক্ষা পাস করা এক গোছা আকর্ষনীয় বস্তু যাঁরা অপেক্ষা করে আছি কখন মালিক ঠিক সম্রাটের মত তাঁর ভাঙ্গা বাক্সের মধ্য থেকে তাঁর পছন্দ মত আমাদের কাউকে বেছে নেবেন।

তিনি আমায় বেছে নিলেন। যদিও সে জন্যে মোটেই আমি কৃতজ্ঞ নই তাহলেও সেই মুহূর্তে বেশ ভালো লাগলো। মনে হল মেয়েরা সব আমায় ঈর্ষা করে। তাঁরা যখন চলে গেল অনেকের চোখে তখন জল দেখলাম। চাপাস্বরে কেউ কেউ গালাগাল দিয়ে গেল। "মেয়েরা এত সস্তা হয় কি করে?"

* * *

ছোট্ট রেস্তোঁরার দ্বিতীয় কর্ত্রী নিযুক্ত হলাম। টেবিলে টেবিলে হুকুম তালিম করার ব্যাপারটা যে কি তার বিন্দু বিসর্গও কিছু জানি না এবং কিছুটা ভয়ও পেলাম। হোটেলের পয়লা নম্বর কর্ত্রী আমায় এ ব্যাপারে চিন্তিত হতে নিষেধ করলেন; তিনিও নিজে চিন্তিত হন না। সে

বললে খদ্দেরদের খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব সরবরাহিকার আদায় যা করতে হবে তা হলো, চা সরবরাহ করা, মুখ মোছার ভিজে তোয়ালে খদ্দেরকে এগিয়ে দেওয়া এবং খাওয়া হয়ে গেলে তার হাতে বিল ধরিয়ে দেওয়া।

অদ্ভূত সব ব্যাপার। হেটেলের পয়লা নম্বর কত্রী তাঁর জামার আস্তিনটা হাতের কনুই পর্য্যন্ত উঠিয়ে দিতেন। কিন্তু জামার ভেতরের লাইনিংটা বেশ পরিষ্কার দাগহীন। কব্জিতে তাঁর একটা সৌখীন রুমাল বাঁধা, যাতে কাজ করে লেখা আছে "ছোট্ট বোনটি, তোমায় আমি ভালোবাসি", উনি সব সময় মুখে পাউডার ঘসতেন। তাঁর লিপস্টিক দেওয়া চওড়া ঠোঁটকে বিশাল রক্তাক্ত একটা জিভ বলে মনে হত। খদ্দেরের সিগারেট ধরিয়ে দেবার সময় তিনি খালি তাঁর হাঁটু দিয়ে তার পায়ে চাপ দেবেন। তাকে মদ ঢেলে দেবেন; কোন কোন সময় সে খদ্দেরের সাথে বসে দুএক চুমুক মদও টানবেন তাঁর নজর কোন কোন খদ্দেরের উপর বেশী, আবার কোন কোন খদ্দেরকে তিনি পাত্তাই দেন না, তাঁর চোখ দুটো তিনি প্রদীপ শিখার মত পিট পিট করতেন, আর ভাব-খানা দেখাতেন যেন তিনি কোন কিছুই দেখছেন না। তিনি যাদেরকে অবজ্ঞা করবেন আমার দায়িত্ব ছিল তাঁদের উপর নজর রাখা।

পুরুষ মানুষকে আমি ভয় করি। নিজের স্বল্প অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি যে—ভালোবাসুক আর নাই বাসুক পুরুষমানুষ এক দানব বিশেষ। আমাদের রেস্তোঁরার খদ্দেরদের বেশীর ভাগই ঘৃন্য জীব। খাবারের বিল নিয়ে হট্টচট্ট বাঁধায়, মদ টেনে তারা চেঁচামেচি করে এবং শুয়োরের মত খায়, ফালতু ব্যাপার নিয়ে সোরগোল করে ক্ষেপে যায়, আর গালিগালাজ করে।

তাদেব চা দেবার সময় বা মুখ মোছার তোয়ালে এগিয়ে দেবার সময় আমি মাথা নিচু করে থাকতাম আর লজ্জায় লাল হয়ে যেতাম। তারা আমার সাথে কথাবার্তা কইত আর আমায় হাসাতে চেষ্টা করতো। আমি কিন্তু ওদের সাথে কোন কিছুই করতে চাইতাম না। রাত ·নটায় চাকরীর প্রথম দিনের কাজ যখন শেষ হলো, আমি তখন ভীষণ ক্লান্ত। আমার ছোট্ট ঘরে ফিরে গিয়ে পোষাক না বদলেই বিছানায় শুয়ে পড়ি এবং পরের দিন বিছানা থেকে উঠে নিজেকে বেশ সুস্থই মনে হল।

* * *

সকাল নটার পর প্রথম কত্রী যখন এলেন তখন আমার এক ঘণ্টার

উপর কাজ হয়ে গেছে। খুব একটা সদয় ভাবে না হলেও ঔদ্ধত্য সহকারে তিনি আমায় বুঝিয়ে বলেন, অত সকালে তোমায় আসতে হবে না। এখানে সকাল আটটার সময় কে খায় হ্যাঁ, আর একটা কথা লাজুক পুষ্পুসীটি আমার। সব সময় ঐ হাঁড়িপানা মুখ করে থেকো না, তুমি হোটেলের একজন কর্ত্রী, কফিনের উপর থেকে সাদা চাদর তোলার লোক নও। এটা মনে রেখো। সব সময় তোমার মাথাটা যদি ঐভাবে নামিয়ে রাখো তাহলে বাড়তি বকশিস পাবে কি করে? এখানে কি জন্যে আছো? তোমার কি মনে হয়? আর সাজগোছও সঠিক হয় নি। গাউনের কলারটা উঁচু হবে—তোমার সিল্কের রুমাল কৈ? যা সেজেছ তাতে রেঁস্তোরার কর্ত্রী বলেও মনে হচ্ছে না।

আমি জানি তিনি ঠিকই বলেছেন। আমি যদি খদ্দেরের দিকে চেয়ে না হাসি তবে আমিও ঠকবো—আবার সেও ঠকবে। কারণ আমরা সবাই মিলে বকশিস যা পাই তা সমানভাবে ভাগ করে নি। আমি তাঁকে ছোট করছিনা এক হিসেবে আমি তাঁকে প্রশংসাই করি। কি করে লোকে রোজগার করে তিনি তা জানেন। পুরুষ মানুষের সাথে অভিনয় করে টাকা রোজগার করতে হয়—এটাই কেবল একমাত্র রাস্তা যা গ্রহণ করে মেয়েরা তাদের উন্নতি করতে পারে।

আমি কিন্তু তাঁকে অনুকরণ করতে চাই নি; যদিও আমি বেশ পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাচ্ছি যে সেদিন আর বেশী দুর নয় যখন অন্নের সংস্থান করতে আমায় ওর থেকেও আরও সহজ, সাবলীল হতে হবে। তবে তা হতে হবে তখন যখন অন্য সব রাস্তা আমার কাজে ব্যর্থ হবে। এই, "শেষ উপায়"টা আমাদের মত মেয়েদের জন্য সব সময় অপেক্ষা করে থাকে। আমি তা বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখছি মাত্র।

রাগে, দাঁতে দাঁত দিয়ে আমি জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাই। তবে এটা ঠিক যে একটি মেয়ের ভাগ্য কখনই তার নিজের উপর নির্ভর করে না। তিনদিন পরেই মালিক আমায় সাবধান করে দেন; বলেন যে তিনি আমায় আর মাত্র তিনদিম দেখবেন। আমি যদি চাকরী বজায় রাখতে চাই ত আমায় প্রথম কর্ত্রীর মত হতে হবে। উৎসাহের আতিশয্যে তিনি একটি ইংগিত দেন বলেন, "এক খদ্দের তোমার খোঁজ খবর নিচ্ছিল। বোবার মতই নিজেকে অত ঢেকে রাখছ কেন? আমাদের দৌড় কতদুর তা ও সবাই আমরা জানি! ব্যাংকের ম্যানেজারের সঙ্গে অনেক কর্ত্রীর বিয়ে হয়েছে—এরকমও ঘটেছে। আমরা অত সস্তা নই।

বরাত যদি আমাদের খুব খারাপ না হয় ত ওদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী লোকের সাথে একসঙ্গে ঢাকা দেওয়া বড় গাড়ীতে চড়ে বেড়াতেও পারি।

এতে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। তাঁকে প্রশ্ন করি, "আপনি নিজে কখনও ঐরকমের গাড়ীতে চড়েছেন"!

অবাক বিস্ময়ে তার বিশাল ঠোঁটটা এত বড় আকারের হাঁ হয়ে গেল যে আমি ভাবলাম ওঁর চোয়ালটাই বোধহয় ঠেলে বেরিয়ে আসবে। তিক্ত কণ্ঠে তারপর বলেন, "নোংরা মুখে যা আসে তা বলো না। তুমি ত লিলি ফুলের মত পবিত্র পাছাবিশিষ্ট মহিলা নও। তা যদি হতে ত এখানে আসতে না।"

আমি পালালাম আমার বেতন—এক ডলার পাঁচ সেণ্ট নিয়ে, বাড়ী ফিরে এলাম।

* * *

সেই সর্বশেষ ছায়াটি আমার দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে এলো। এই ছায়া এড়াতেই আমার তার অতি নিকটে আসতে হয়েছিল। চাকরী থেকে ছাঁটাই হওয়ায় আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমি সত্যি ঐ ছায়াকে ভয় করি আমার দেহকে কিভাবে বিক্রী করতে হয় তা আমার বেশ ভালো করেই জানা আছে। আগের সেই ঘটনার পর থেকে নারী-পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্কের ব্যাপারে অনেক কিছু জেনে ফেলেছি একটি মেয়েকে যা কেবল করতে হবে তা হল নিজের উপর তার নিয়ন্ত্রনটা একটু শিথীল করতে হবে; পুরুষেরা তার গন্ধে ছুটতে ছুটতে আসবে। তারা যা চায় তা হল নারীমাংস; তাদের লালসা পরিতৃপ্ত হয়ে তোমায় খাওয়াবে পরাবে—কিছু সময়ের জন্য। কিন্তু তারপর তোমায় গালিগালাজ করতে পারে, পিটতে পারে, তোমার বেতন বন্ধ করে দিতে পারে।

যখন কোন মেয়ে তার দেহ বিক্রয় করে তখন তার বরাতে এই জোটে। কোন কোন সময় যে বেশ পরিতৃপ্ত থাকে। আমি নিজেও তা বেশ অনুভব করতে পারি। এ সব কিছুই হল অল্প সময়ের জন্যে "মিষ্ট কথা", পরে তোমার সর্বাঙ্গে ব্যাথা আর হতাশা জাগবে। যখন একজন মাত্র পুরুষের কাছে দেহবিক্রয় করবে তখন অন্ততঃ তুমি কিছু ভালো ভালো ভালোবাসার কথা শুনতে পাবে এবং তাতে পরিতৃপ্ত হতেও পারো। কিন্তু যখন জনতার কাছে দেহ বিক্রয় করবে তখন এই মিষ্টি কথা থেকেও তুমি বঞ্চিত হবে। তখন এমন সব কথা তোমায় শুনতে হবে, যা তোমার মাও তোমার প্রতি কখনও ব্যবহার করেননি।

ভয়ের ডিগ্রীর তারতম্য রয়েছে। যদিও আমি প্রথম কর্ত্রীর উপদেশ গ্রহণ করতে পারি নি তাদেরও মাত্র একজনের সাথে সম্পর্ক চালিয়ে যেতে আমি খুব একটা ভীত নই, ব্যাপারটা এই নয় যে আমি এখনই আমার দেহ বিক্রয়ের কথা ভাবছি। পুরুষ মানুষে আমার কোন প্রয়োজন নেই—এখন বয়স আমার কুড়ির নিচে। আমি মনে করতাম একজনের সাথে 'ঐ' কাজ চালিতে যেতে বেশ মজা আছে। কেমন করে জানবো যে নোতুন কোন বন্ধুর সাথে বেড়ালেই সে আমার কাছে এমন এক জিনিষ দাবী করে বসবে যা দিতে আমি ভীষণ ভয় করি।

এটা অবশ্য সত্যি যে এক যুবককে বসন্তের মৃদু বাতাসে আমাকে তার ইচ্ছামত ভোগ করতে নিজেকে একবার উজার করে দিয়েছিলাম। কিন্তু পরে জেনেছিলাম যে সে আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে তার মধু-মাখা কথায় আমায় সম্মোহিত করেছিল। সম্মোহন থেকে জেগে উঠে উপলব্ধি করি যে এ সবই কেবল ফাঁকা বুলি। এতে দেখানোর মত যা রয়েছে তাহল কেবল কয়েক দফা খাবার আর কয়েক প্রস্থ পোষাক। ঐ পদ্ধতিতে পুনরায় আমি অন্ন সংস্থান করতে চাই নি। অন্ন হচ্ছে এমন এক কার্য্যকরী বস্তু যা সংগ্রহ করতে হবে সঠিক কার্য্যকরী পদ্ধতিতে। কিন্তু তা যদি অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয় তাহলে এ মেয়েদের এটা স্বীকার করতেই হবে যে, সে মহিলা, তাই তাকে তাঁর দেহের মাংস বিক্রয় করতেই হবে।

এক মাসের উপর সময় পেরিয়ে গেল আমি এখনও নোতুন কোন চাকরী জোগাড় করতে পারি নি।

* * *

আমি আমার সহপাটিদের মধ্যে ২/১ জনের বাড়ী গেলাম। তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই রয়েছেন যাঁরা মাধ্যমিক স্তর পর্য্যন্ত পড়েছেন। বাকীরা স্রেফ বাড়ীতে বসে আছে। ওদের ব্যাপারে আমার বিশেষ আগ্রহ নেই। ওদের সাথে কথা কয়ে বুঝলাম যে আমি ওদের থেকে বেশী চালাক। স্কুলে ওদের কিন্তু বেশী চালাক বলে মনে হত। মনে হল তারা যেন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছে। এখন ঘুঁটি ঘুরে গেছে। যাদের খুব বেশী চালাক বলে মনে হত তারা এখন দোকানে সাজানো পণ্যে পরিণত হয়েছে। কোন যুবকের দেখা মিললে তাদের চোখ চকচক্ করে ওঠে, এবং কাব্যিক ভাবাবেগে হৃদয়টা তাদের দ্রবীভূত হয়ে যায়।

এই সব মেয়েরা আমার হাসির উদ্রেক করলেও তাদের কিন্তু ক্ষমা করে

দি। খাদ্য তাদের কাছে কোন সমস্যাই নয়। ভরাপেটে প্রেমের চিন্তা করা সহজ নারী পুরুষ উভয়েই পরস্পরকে ফাঁদে ফেলতে জাল বোনে। যারা ধনী তাদের জালটা বড় হয়। কিছু দামী জিনিষ জালে বেঁধে নিয়ে তারা ধীরে সুস্থে তাদের পছন্দমত জিনিষ তুলে নেয়। আমার কোন অর্থই নেই। এমন কি নির্জন একটা জায়গা পেলাম না যেখানে বসে বসে আমার জাল বুনবো। কিন্তু আমার কাউকে না কাউকে ধরতেই হবে। নচেৎ কারোর জালে ধরা পড়তে হবেই। আমি বিশেষ করে আমার পুরানো সহপাঠিনীদের অপেক্ষা বেশী চালাক অন্তত: এ ব্যাপারে।

* * *

একদিন আবার সেই পুতুলমুখী বৌটার কাছে গেলাম। তিনি এমন ভাবে আমায় অভ্যর্থনা জানালেন যেন আমি তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু। কিন্তু তাঁর আচরণে কিছু বিশৃংখলা ছিল।

খুব আগ্রহসহকারে তিনি তোৎলাতে তোৎলাতে বলেন, "তুমি খুব ভালো লোক তোমায় ওঁকে ছেড়ে দিতে বলে পরে আমি দুঃখ পেয়েছি। তোমার সাথে ও থাকলে আমার অবস্থাটা কিছু ভালো হত। এখন সে অন্য একটা মেয়ে জোগাড় করেছে। মেয়েটাকে নিয়ে ও পালিয়েছে; আমিও সেই থেকে ওকে আর দেখিনি!"

ওঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম যে ওঁদের বিয়েটা প্রেম করে হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তিনি ছেলেটিকে এখনও ভালোবাসেন; কিন্তু সে আবার পালিয়েছে। ছোটখাটো বৌটির জন্য দুঃখ হয়। সে এখনও স্বপ্ন দেখে; এবং বিশ্বাস করে যে প্রেম পবিত্র।

তাঁকে জিজ্ঞেস করি এখন তাহলে তিনি কি করবেন? তিনি বললেন যে তাঁকে খুঁজে বার করবেনই; কেন না তাঁরা যে পরস্পরের চিরজীবনের সাথী। কিন্তু ধরে নাও যে তাঁর দেখা পেলেনা-তাহলে? আমি জিজ্ঞেস করি। তিনি ঠোঁট কামড়ান। তাঁর মা বাবা, শ্বশুর শ্বাশুড়ি আছেন। তিনি তাঁদের হেপাজতে আছেন। তিনি আমার স্বাধীনতায় হিংসা করেন।

যাক্ তাহলে আমাকে কেউ কেউ হিংসে করে। আমার হাসি পায়। আমার আবার স্বাধীনতা!—কি অপূর্ব ঠাট্টা। মেয়েটার খাবার ব্যবস্থা রয়েছে, আমার রয়েছে স্বাধীনতা। তাঁর স্বাধীনতা নেই, আমার খাদ্য নেই। আমরা দুজনেই মহিলা, দুজনেই হতাশায় ভুগছি।

* * *

পুতুলমুখী বৌটির সাথে দেখা করার পর আমি একটিমাত্র লোককে

দেহ বিক্রয় করার চিন্তাটা পরিত্যাগ করি। আমি পুরুষদের সাথে অভিনয় করে বেড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অন্যভাবে বললে দাঁড়ায় যে আমার অন্নের ব্যবস্থা করতে আমি পুরুষদের "সাথে" "প্রেম প্রেম" খেলা খেলতে মনস্থ করেছি। আমি যখন ক্ষুধার্ত তখন নৈতিক দায়িত্ব-শীলতা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।

"প্রেম প্রেম" খেলা ক্ষুধারোগ সাড়িয়ে দিতে পারে সেইভাবে ঠিক যেভাব "প্রেম প্রেম" খেলাতে মনোসংযোগ করতে হলে ভরা পেট থাকা অত্যাবশ্যকীয়, এটা একটা সঠিক বৃত্তের মত তা সে যেখান থেকে সুরু করা হোক না কেন ?

আমার ও আমার সহপাঠিনীদের এবং ছোট পুতুল মুখী বৌটার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। ওদের এখনও কিছু মোহ আছে আর আমি একটু বেশী স্পষ্ট বক্তা। ভুখা পেট থেকে বড় সত্য আর অন্য কিছু হতে পারে না।

আমার সামান্য যে সম্পত্তি ছিল তা বিক্রী করে সম্পূর্ণ নোতুন পোষাক খরিদ করলাম। আমাকে মোটেই খারাপ দেখতে নয়। তারপর আমি বাজারে প্রবেশ করলাম।

* * *

আমার ধারণা ছিল যে আমি "প্রেম প্রেম" খেলার অভিনয় বেশ ভালো করতে পারবো। কিন্তু আমার ধারনাটা ভুল ছিল। পৃথিবী সম্বন্ধে যা জানি বলে আমার ধারণা ছিল দেখা গেল তা সঠিক নয়-পৃথিবী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু একটা জানি না। অত সহজভাবে পুরুষদের ফাঁদে ফেলা যায় না। আমার নজর ছিল বেশী সংস্কৃতিবান পুরুষদের উপর, যাদেরকে একটা দুটো চুম্বন দিয়ে খুশী করতে পারি। হাঃ হাঃ তাঁরা ঐ রাস্তা ধরেই চলেন না ; একজনও নয়। প্রথম সাক্ষাৎ করেই তারা আমার কাছ থেকে সুযোগ গ্রহণ করতে চাইতেন। অপিচ-তাঁরা আমায় কেবল তাঁদের সংগে আইসক্রীম, খাওয়াতে, বা একটু বেড়াতে বা একটা সিনেমা দেখার আমন্ত্রণ জানাতেন।

এই সব তথাকথিত সংস্কৃতিবান পুরুষেরা আমাকে কখনও একথা জিজ্ঞেস করতে ভুলতেন না যে কোন স্কুল থেকে আমি প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি, বা আমার পরিবার কোন ব্যবসায় লিপ্ত। এটা যথেষ্ট পরিমাণে পরিষ্কার যে তোমার ওঁদেরকে উৎসর্গ করার মত কিছু না থাকলে তোমায় তাঁরা চাইবেন না। তাঁদেরকে প্রকৃত লাভ এনে দিতে

না পারলে, তাঁরা বড় একটা চুম্বনের বিনিময়ে বড়জোর যা দিতে পারেন তা হলো দশ সেণ্ট মূল্যের একটা আইসক্রীমমাত্র।

এ পদ্ধতি কঠোর ভাবে "ফেলো কড়ি মাখো তেল" এর মত প্রস্তাব। পুতুল মুখীরা এ সব বোঝে না, আমি কিন্তু বুঝি। মা ও আমি দুজনেই বুঝি। মায়ের জন্যে আমি অনেক ভাবি।

* * *

তাঁরা বললেন যে, "প্রেম প্রেম" খেলা থেকে অনেক মেয়েই রোজগার করে। আমার ত কোন পুঁজি নেই। তাই ঐ প্রস্তাব বাতিল করেছি। আমার জন্যে এটাকে সরাসরি ব্যবসায় হতে হবে। আমার বাড়ীওয়ালা আমায় বাড়ী ছেড়ে দিতে আদেশ করলেন কেন না তিনি একজন সম্মানীয় ব্যক্তি তিনি বলেন। এমন কি তার দিকে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে আমি বাড়ী ছেড়ে চলে গেলাম। ফিরে গেলাম সেই ছোট ফ্ল্যাটে যেখানে মা আর আমার প্রথম নোতুন বাবা থাকতেন, এই বাড়ীওয়ালা কিন্তু মান সম্মানের ব্যাপারে বিশেষ কিছু একটা বললেন না। এ লোকটি ওর থেকে ঢের ভালোও আরও বেশী সৎ।

ব্যবসায় ভালো জমেছে। 'সংস্কৃতিবান, পুরুষেরাও আসতেন। যে মুহূর্তে তাঁরা দেখলেন যে আমি দেহ বিক্রয় করার জন্য প্রস্তুত সেই মুহূর্তেই তা কেনার জন্যে তাঁরা আগ্রহী। এই ধরণের ব্যবস্থাপনায় তাঁরা তাঁদের অর্থের যথাযথ মূল্য পান ; আর এটায় এঁদের সামাজিক মর্য্যাদায় কোন প্রতিফলন পরে না।

প্রথম প্রথম আমার বেশ ভয় হত। কেন না তখন বয়স আমার কুড়ি পেরোয় নি। কিছুদিন পর আর ভয় করত না। তাদেরকে ভিজেবালির বস্তার মত নিস্তেজ করে দিতে পারতাম। তাঁরা খুসী ও পরিতৃপ্ত হতেন! তাঁরা তাদের বন্ধুদের কাছে আমার প্রচার করতেন।

কয়েকমাস পরেই আমি অনেক কিছুই শিখে গেলাম। প্রথম সাক্ষাতেই পুরুষদের পরিমাপ করতে শিখে গেলাম। বড়লোক খদ্দেররা সদাসর্বদা আমার পরিবেশ জানতে চাইতেন আর পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতেন যে তিনি আমায় রাখার মত সংগতি তাঁর আছে। তাঁরা হিংসুটে হতেন আর আমায় একাই ভোগ করতে চাইতেন। এমনকি বেশ্যালয়ে পর্য্যন্ত তাঁরা একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করতে চাইতেন কেন না তাঁদের অর্থ আছে।

এ ধরনের পুরুষদের সঙ্গে আমি খুব একটা ভদ্র ব্যবহার করতাম না।

তারা রেগে গেল ত বয়ে গেল। তাদের বৌ এর কাছে যাচ্ছি বলে ভয় দেখিয়ে ওদের চুপ করিয়ে দিতাম। স্কুলের ঐ কটা দিন ব্যয় করা আমার বৃথা যায় নি। সহজে আমি ভয় পেতাম না। শিক্ষার একটা সুবিধে রয়েছে ; এ ব্যাপারে আমি কিন্তু নিঃসন্দেহ।

হাতে মাত্র এক ডলার নিয়ে কেউ কেউ আসতেন—হয়ত তাঁরা ঠকে থাকেন এইভয়ে সদাই শংকিত। এ ধরনের লোকদের কাছে ব্যবসার সর্তাদি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে দিতাম। তারপর তারা ঘাড় কাত করে বাড়ী গিয়ে আরও বেশী অর্থ নিয়ে আসতো, সত্যই এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার !!

এদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে বদ্‌লোক। তারা যে কেবল টাকা খরচ করতে চাইত না তা নয় ; তারা সর্বদাই এটার সাথে অন্য কিছু বাগিয়ে নেবার তালে থাকতো—যেমন হয় আধ প্যাকেট সিগারেট বা আধ শিশি কোল্ড ক্রীম চুরী করে নিত। এই ধরনের ছেলে ছোকরাদের চটানো ঠিক নয়—ওদের বড় বড় অফিসারদের সাথে যোগাযোগ থাকে। ওদের সাথে খারাপ ব্যবহার করলে তারা আমাদের পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দেবে।

আমি তাদের চটাই না। যতক্ষণ পর্যন্ত পুলিশবাহিনীর কোন অফিসারের সাথে পরিচিত না হচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত ওদের সকলের সাথে অভিনয় করে চলি—তারপর একে একে সকলকে শেষ করি। এ জগৎটা হচ্ছে কুকুর দিয়ে কুকুর খাওয়ার জগৎ। এ রাজত্বে যত খারাপ হবে ততই তুমি ভালো থাকবে।

এদের মধ্যে সবচেয়ে করুণা উদ্রেককারীরা হচ্ছে ছোট ছোট ছেলের দল—তাদের পকেটে কেবল একটা ডলার ও কয়েকটা খুচরো পয়সা ঝলঝল করতো। তাদের নাকের উপর স্বেদবিন্দু। আমি তাদের করুণা করতাম। আবার যথারীতি টাকাও ওদের কাছ থেকেও নিতাম। আমি আর কি করতে পারি ?

তারপর আছেন বুড়োর দল তারা সকলেই সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি ; কেউ কেউ আমার ঠাকুর্দার বয়সী। ওদের সাথে কেমন আচরণ করতে হয় বাস্তবিকই তা আমি জানতাম না। তবে এটা কিন্তু জানতাম যে ওঁদের অনেক টাকা আছে।—ওঁরা এসেছেন মারা যাবার আগে কিছু সুখ কিনে নিতে। তাই আমি তাঁরা যে জন্য আসতেন তা দিতাম।

এই সব অভিজ্ঞতা আমায় পুরুষ ও অর্থের প্রকৃত প্রকৃতি জানতে

শিখিয়েছিল। দুটোর ভেতরে সবচেয়ে শক্তিশালী হল অর্থ। মানুষ যদি জানোয়ার হয় ত অর্থ হচ্ছে তার বিষ ফোঁড়া।

* * *

আমি আবিষ্কার করি যে আমার রোগ ধরেছে। এতে এত দুঃখ পেলাম যে মরতে ইচ্ছে করলো। আমি কিছুদিন বিশ্রাম নিলাম, ও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম খানিক। মাকে কাছে পেতে চাইলাম। হয়ত তিনি আমায় কিছু আরাম দিতে পারে না। মনে হল আর বেশীদিন হয়ত আমি বাঁচবো না।

আমি সেই সরু গলিতে গেলাম যেখানে মাকে শেষ বারের মত হাঁপর টানতে দেখি। কিন্তু সেই বাষ্পে তৈরী রুটির দোকান বন্ধ হয়ে গেছে অনেক দিন। তাঁরা যে কোথায় গেছেন কেউ তা বলতে পারলো না আমি কিন্তু সন্ধান চালিয়ে যাই, মাকে খুঁজে বার করতেই হবে। দিনের পর দিন আমি অভিভূতের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। মিছামিছি ঘুরে কোন লাভ নেই। ধরে নিলাম, হয় মা মারা গেছেন নয়ত দোকানটা শহরের বাইরে কয়েক শ মাইল দূরে উঠে গেছে।

এ রকম বিষন্ন পরিবেশে আমি হতাশ হয়ে কেঁদে ফেলি। সবচেয়ে সুন্দর পোষাক পড়ে, সেজেগুজে বিছানায় মুখ গুজে মৃত্যু প্রহর গুনতে থাকি। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে বেশীদিন আর বাঁচছি না।

আমি কিন্তু মরি নি। কে যেন দরজায় টোকা মারলো। আমায় হয়ত কেউ খুঁজছে। ঠিক আছে তাকে ভেতরেও আনা যাক। আমার দেহের সর্বশক্তি দিয়ে আমার রোগের পুরো বিষটাই তার দেহে ঢেলে দিলাম। কাজটা অন্যায় করলাম বলে ত আমার মনে হল না। কেন না সুরুতে অপরাধটা কিন্তু আমার ছিল না।

এখন একটু ভালো লাগছে, আমার। আমি সিগারেট টানি, মদ খাই, এবং আচরণ করি ৩০।৪০ বছরের মহিলার মত, চোখের নীচে কালো কালো গোল দাগ। জ্বর জ্বর ভাব। এসব কোন কিছুকেই পাত্তা দিলাম না। এখন আমার কাছে অর্থই সব। আসল কথা হচ্ছে পেট ভরে আগে খেয়ে নাও, তারপর অন্যসব কিছু ভাবা যাক।

আমি খাওয়া দাওয়াটা মোটেই খারাপ করি না। সবচেয়ে ভালো খাওয়া দাওয়া করবো না কেন? আমায় ভালো খেতে হবে, ভালো পড়তে হবে। এইটাই হচ্ছে একমাত্র পথ যার সাহায্যে নিজের প্রতি খানিকটা সুবিচার করতে পারি।

*　*　*

কোন একদিন সকালে আমি একটা লম্বা গাউনে দেহ মুড়ে ঘরে বসে আছি। তখন সময় হবে প্রায় দশটা বাড়ীর উঠোনে কার যেন পদধ্বনি শুনলাম। আমি এই মাত্র বিছানা ছেড়ে উঠেছি। কোন কোন দিন দুপুর গড়িয়ে গেলেও পোষাক পরিচ্ছদ বদলাতাম না, ইদানিং আমি ভীষণ অলস হয়ে গেছি। কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়াই ঘণ্টার পর ঘণ্টা এভাবে বসে কাটিয়ে দিতে পারতাম।—কোন কোন দিন দুটো পর্য্যন্ত। চিন্তার কোন ইচ্ছেই থাকতো না।

দরজা পর্য্যন্ত পায়ের শব্দ এলো—ধীরে ধীরে নিঃশব্দে। দরজার ওপাশে একজোড়া চোখ দেখা গেল। আবার কয়েক মুহূর্ত পরে সেটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আমি ঘরে চুপচাপ ঘরে বসে, নড়াচড়া করতেও আলস্য লাগে। কয়েক মিনিট বাদে চোখ দুটো আবার ফিরে আসে। আমি এইবার চোখ দুটীকে চিনতে পারি। ধীরে উঠে দরজা খুলে দিলাম, "মা!"

*　*　*

তারপরে কি ঘটলো তা আজ ঠিক ঠিক বলতে পারবো না, কতক্ষণ আমরা, আমি ও মা, একসংগে কেঁদেছিলাম তাও বলতে পারবো না। মার বয়স ভীষণ বেড়ে গেছে। ওঁর স্বামী চুপিচুপি তাঁর নিজ গাঁয়ে পালিয়ে গেছেন। তিনি যাবার সময় এক সেণ্ট পয়সাও রেখে যান নি। মা দোকানের অবশিষ্ট কিছু জিনিষপত্র বেচে দিয়ে একটা সস্তা ভাড়া ঘরে উঠে যান।

গত পনেরো দিন ধরে মা আমায় খুঁজছেন। শেষ পর্য্যন্ত আমার সাথে তাঁর হঠাৎই দেখা হয়ে যেতে পারে এই মনে করে পুরানো ফ্ল্যাটে ফিরে আসার জন্য তিনি মনস্থির করেন, আমি ত সেই ঘরেই আছি। তিনি প্রথমে আমার সংগে কথা বলতে সাহস করেন নি। আমি যদি তাঁকে না ডাকতাম তাহলে হয়ত তিনি আবার ফিরে যেতেন।

পরিশেষে আমাদের কান্না থামলে আমি হিষ্টেরিয়া রোগীর মত হেঁসে উঠি। কি প্রহসন-তাই না? মা মেয়ের খোঁজ পেলেন, মেয়ে কিন্তু বেশ্যা। আমায় বড় করতে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখন মায়ের দেখাশোনার দায়িত্ব আমার উপর। তাই আমিও বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য।

প্রাচীনতম পেশা বংশ গত হতে বাধ্য—মেয়েদের এটাই বিশেষত্ব :

* * *

আমি যদিও জানতাম যে সান্ত্বনার বাণী শুধুমাত্র ফাঁকা বুলি, তাহলেও মায়ের মুখ থেকে তা শুনতে চাই। মা একসময় পুরুষদের বোকা বানাতে ওস্তাদ ছিলেন এবং তাঁর স্তোকবাক্যকে আমি সান্ত্বনা হিসেবে গ্রহণ করতাম।

এখন মা আমার সেটাও সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন। ক্ষুধার তাড়নায় তিনি যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছেন ; অবশ্য-তার জন্য তাঁকে আমি দোষ দিই না।

আমার আয়ব্যয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে, আমার কাজের প্রকৃতি নিয়ে বিন্দুমাত্র বেশী বিব্রত বোধ না করে আমার সম্পত্তি সব মিলিয়ে দেখতে সুরু করেন। মা আমায় কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে বলবেন এই আশায় আমার রোগের কথা তাঁকে জানালাম, ওমা! তিনি তাঁর ধারকাছ দিয়েও গেলেন না। তিনি আমায় ওষুধ কিনে দেবেন বলে জানালেন।

তাকে আমি প্রশ্ন করি, "আমরা কি চিরটা কাল ধরে এই ব্যবসায় করবো ?" তিনি জবাব দেন নি।

তবে একভাবে বলতে হয় যে তিনি সত্যই আমায় ভালবাসেন ও আমায় রক্ষা করতে আগ্রহী। তিনি এখন আমায় খাওয়াচ্ছেন, আমার স্বাস্থ্যের উপর লক্ষ্য রাখছেন ঠিক সেইভাবে যেভাবে চোরা চাউনি দিয়ে ঘুমন্ত শিশুকে মা লক্ষ্য করেন।

কেবল একটা যে জিনিষ তিনি আমার জন্য করলেন না ; তাহলো এই ব্যবসায় পরিত্যাগ করতে তিনি আমায় বললেন না।

যদিও এই ব্যবসায় চালাতে আমার ভালো লাগে না তা জানা সত্ত্বেও এছাড়া আমি আর কোন কাজ করতে পারি ? আমাকে আর মাকে খেতে পড়তে হবে—এটাই সব কিছু নির্দ্ধারন করে দেয়। মা হোক বা মেয়েই হোক, আর সম্মানিত হোক আর নাই হোক টাকার প্রয়োজন বড়ই নির্মম।

* * *

মা আমার দেখাশুনা করতে চান ; কিন্তু তাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার ধ্বংস দেখতে হচ্ছে। আমি তাঁর সঙ্গে ভালো আচরণ করতে চাইলেও মাঝে মাঝে তিনি বেশ বিরক্ত হয়ে ওঠেন। তিনি সব ব্যাপারটা একাই করতে চান—বিশেষ করে যেখানে অর্থের ব্যাপার জড়িত আছে। তাঁর চোখে যৌবনের সে ঔজ্জ্বল্য না থাকলেও টাকার দর্শন মাত্রই

তাঁর চোখ দুটো কেমন চকচক্ করে ওঠে। বাড়ীতে যখন খদ্দেরের ভীড় থাকে তখন তিনি একেবারে চাকর বনে যান। তবে কেউ যদি চুক্তির থেকে কম টাকা দেন তাহলে তাকে গালমন্দ করতেন এবং পৃথিবীতে যে সব কথা জানা আছে সে সব নামে তাদেরকে ডাকতেন।

আমি খুব বিব্রত বোধ করি। এটা ঠিক যে টাকার রোজগারের জন্যই আমার এই ব্যবসায় ; তার মানে এটা নয় যে তার জন্যে সকলকে গালাগাল করতে হবে। খদ্দেরের সাথে রূঢ় ব্যবহার করতে আমিও জানি ; তবে তা করার আমার নিজস্ব একটা পদ্ধতি আছে। মার পদ্ধতি কিন্তু ভয়ানক স্থূল। তিনি খদ্দেরদের চটিয়ে দেন, টাকার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে এইভাবে কাজ করা আমাদের উচিৎ নয়।

হতে পারে আমার বয়স কম ও আমি সাদাসিদে থেকে মানুষ। মার একমাত্র লক্ষ্য কেবল টাকা। কিন্তু এরকমটি মাকে বাধ্য হয়ে হতে হয়েছে ; কেননা তাঁর অনেক বয়স হয়েছে। হয়ত কয়েক বছর পরে আমিও তাই হব। বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের মনও বুড়িয়ে যায়। ক্রমশঃ তাকে শক্ত সমর্থ হতে হবে—ঠিক রূপার ডলারের মত।

না, মা কখনও জেদ ধরে থাকেন না। যদি কোন খদ্দের চুক্তিমত টাকা না দি• তাহলে তিনি তাঁর ছড়ি, টুপি বা ছোট ব্যাগ বা এমন কিছু কেড়ে রেখে দিতেন যা বিক্রী করে কিছু অর্থ পাওয়া যায় যেমন হাতমোজা। হৈ হট্টগোল আমি পছন্দ করতাম না ; তবে মা সঠিক কাজই করতেন। তিনি বলতেন, "যতটা রোজগার করে নেওয়া যায় এখন তত ভালো। কেন না এই সব ব্যবসায় একবছরে মেয়েদের দশ বছর বয়স বেড়ে যায়। তোমাকে যদি ৭০/৮০ বছরের বুড়ীর মত দেখায় তাহলে তুমি কি মনে করো কেউ তোমার কাছে আসবে ?"

কোন কোন খদ্দের মাতাল হয়ে পড়লে তাকে তিনি টানতে টানতে কোন ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ জামা জুতো পর্য্যন্ত খুলে সম্পূর্ণ উলংগ করে ছেড়ে দিতেন। মজার ব্যাপার হল এই যে পরে এ ব্যাপার নিয়ে লোকটা কোন হৈ চৈ করতো না, হতে পারে সে হয়ত বুঝতে পারতো না যে কেমন ভাবে তার এ হাল হল। বা হয়ত খোলা জায়গায় পড়ে থেকে তার নিউমোনিয়া ধরে যেত। আবার এমনও হতে পারে যে জ্ঞান হবার পর এ হাল কেমন করে তার হল সেটা মনে পড়ে যাওয়ায় লজ্জায় এনিয়ে অভিযোগ করতে অস্বস্তি বোধ করত।

* * *

মা ঠিকই বলেছিলেন যে আমাদের এক বছরে দশ বছর বয়স বেড়ে যায়। ২/৩ বছর পর আমিও বুঝতে পারি যে আমি কত বদলে গেছি। গায়ের চামড়া কর্কশ হয়ে গেছে, ঠোঁট সব সময় ফেটে থাকে, চোখ দুটো সব সময় রক্তাভ। যদিও সকালে অনেক দেরীতে বিছানা থেকে উঠি, তাহলেও আমার ক্লান্তি যায় না।

এ ব্যাপারে আমি সচেতন হলে হবে কি ; আমার খদ্দেররা এ ব্যাপারে প্রায় অন্ধ। ক্রমে ক্রমে পুরানো খদ্দেরদের আসা কমে গেল। নোতুন খদ্দেররা আমার মাথা ধরিয়ে দেয় যদিও তাদের খুসী করতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে যাই। কোন কোন সময় মেজাজ যেত বিগড়ে। রেগে মেগে এত চীৎকার করতাম যে তখন নিজেকেই আমি চিনতে পারতাম না। আজে বাজে কথা বলাটা এখন আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

আমার আরও সংস্কৃতিবান খদ্দেরদের আমার উপর থেকে আগ্রহ চলে গেল। কারণ আমার মধ্যে সেই "ছোট্ট প্রেম পাখীর" গুনটা চলে গেছে। এই শব্দটা আমার সম্বন্ধে তাদের কাব্যিক ভাবাবেগের উক্তি বিশেষ। কেবলমাত্র ক্লাউনের মত মুখে রং মেখে আমি অশিক্ষিত খদ্দেরদের আকৃষ্ট করতে পারতাম। ঠোঁটে পুরু করে লিপস্টিক মেখে যখন কামড় দিতাম তখন তারা খুসী হত।

আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে আমি মারা যেতে বসেছি। প্রতিটি ডলার নেবার সময় আমার মনে হয় আমি যেন মৃত্যুর দিকে এক পা এগিয়ে যাচ্ছি। অর্থের কাজ হচ্ছে প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখা। কিন্তু যে পদ্ধতিতে তা আয় করা হচ্ছে তাতে ফল উল্টো হচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি আমি মারা পড়ছি : মৃত্যুর প্রহর গুনছি।

এই রকম মানসিক পরিবেশে আমি আর অন্য কিছু ভাবছি না ; তার অবশ্য প্রয়োজন নেই। আমি খালি বেঁচে থাকতে চাই দিনের পর দিন ; তাহলেই যথেষ্ট হবে।

আমি যা হতে চলেছি তা ঠিক যেন মায়ের দর্পন। কয়েক বছর ধরে নিজেকে ফেরি করে মায়ের দেহে খালি যা অবশিষ্ট রয়েছে তা হলো কয়েক গোছা সাদা চুল, আর কুঞ্চিত চামড়া। এই ত জীবন !

* * *

নিজে জোর করে হাঁসি চেষ্টা করি অসংযত আচার আচরণ করতে। কয়েক ফোঁটা চোখের জল কোন ভাবেই আমার দুঃখ দুর্দশাকে ধুয়ে মুছে সাফ্ করে দিতে পারে না। আমার জীবনযাত্রার কোন আকর্ষণ না

থাকলেও সেটা একটা জীবন ত ? আমি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাই না। তা ছাড়া আমি যা করছি তা আমার দোষে করছি না। মৃত্যু যদি ভীতিপ্রদ মনে হয় তাহলে তার কারণ হচ্ছে আমি জীবনকে ভীষণ ভালোবাসি। মৃত্যুজনিত বেদনায় আমি ভীত নই। আমার জীবনটা যে কোন মৃত্যুর থেকেও বেশী বেদনাদায়ক। আমি জীবনকে ভালোবাসি—তবে যে ভাবে বেঁচে আছি সেটাকে নয়।

আমি মনে মনে আদর্শ জীবনের যে ছবি আকতাম তা হবে ঠিক যেন স্বপ্নের মত। কিন্তু তারপর যেই কঠিন বাস্তব আমার কাছে ঘনিষ্ট হয়ে এল তখন এই স্বপ্ন কোথায় মিলিয়ে গেল ; এবং আগের থেকে মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। পৃথিবীটা স্বপ্ন নয় জীবন নরক কুণ্ড যেন।

আমি যে মনমরা হয়ে আছি মা সেটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। তাই তিনি আমায় বিয়ে করতে বলেন। স্বামী আমায় খাওয়াবেন এবং মা তাঁর বৃদ্ধ বয়সের জন্য নগদ টাকা পাবেন ; আমিই তাঁর একমাত্র ভরসাস্থল। কিন্তু আমায় বিয়েটা করবে কে ?

* * *

এত লোকের সাথে আমার পরিচয় যে প্রেমের অর্থ টা পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। আমি নিজেকে ভালোবাসি—না তাও বাসি না, তাহলে অপর একজনকে ভালোবাসতে যাবো কেন ? অন্য কাউকে যদি বিয়ে করতেই হয় তাহলে ভনিতা করে তাঁকে বলতেই হবে যে আমি তোমায় ভালোবাসি, বলতে হবে যে বাকি জীবনটা তার সাথে কাটিয়ে দিতে আমি ইচ্ছুক।

ঠিক এই কথাই আমি বলেছি—অনেক লোককে। এ কথাটা শপথ করে বলেছি—কিন্তু তারা কেউ আমায় বিয়ে করতে চায় নি। অর্থের নিয়মই হচ্ছে এই যে, তা মানুষকে আরও তীক্ষ্ণ করে তোলে। তারা সব আমার সঙ্গে একটা মাত্র প্রণয় ঘটিত ব্যাপার করতে আগ্রহী। বেশ্যাবাড়ী যাবার থেকে তাতে খরচ অনেক কম।

যদি কোন টাকা না দিত হয়ত আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি যে সব লোকই বলবে যে তারা আমায় ভালোবাসে।

* * *

ঠিক এই সময় আমি গ্রেপ্তার হলাম। আমাদের শহরের নোতুন পুলিশ প্রধান নৈতিকতা নিয়ে অযথা কড়াকড়ি করতে ভালোবাসেন। তিনি অ-রেজেষ্ট্রীকৃত বেশ্যালয় উঠিয়ে দিতে চান। লাইসেন্স প্রাপ্ত

মেয়েরা কেবল ব্যবসায় চালিয়ে যেতে পারে, কারণ তারা সরকারকে ট্যাক্স দেয়।

তারা গ্রেপ্তার করে আমায় শোধনাগারে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে আমায় সেলাই করা, রান্না করা,. কাপড় কাচা প্রভৃতি কাজ করা শেখানো হল। কিন্তু এসব কাজ ত আগে থেকেই জানতাম। এ সব কাজের ভেতর যে কোন একটা কাজ করে যদি জীবিকা অর্জন করতে পারতাম তবে কবে এই ঘৃন্য ব্যাবসায় ছেড়ে চলে যেতাম।

শোধনাগারের লোকদের এ সব বললাম, ওরা কিন্তু আমায় ঠিক বিশ্বাস করলে না। তারা বলে আমি বদ এবং চরিত্র হীন মেয়ে। শুধু কাজ শিখলেই হবে না, সে কাজকে ভালবাসতে শেখা চাই। তাহলে আমি নাকি স্ব-নির্ভর হতে পারবো। আর হয়ত একটা বরও জুটে যেতে পারে।

ওনারা বড় বেশী আশাবাদী। তবে তাঁদের এই আস্থার সঙ্গে আমি একমত নই। তাঁরা এই ব্যাপারে এত গর্বিত যে তাঁরা বলেন যে এভাবে ডজন খানেক মেয়েকে তাঁরা সংশোধন করেছে এবং তাঁদের বরও জুটিয়ে দিয়েছেন। কেবলমাত্র দুডলার লাইসেন্স ফি ও দায়িত্বশীল কোন দোকানদারের গ্যারান্টি পাওয়া গেলেই যে কোন লোক সংশোধনাগারে এসে তার পছন্দমত বৌ বেছে নিযে যেতে পারে। এটা সত্যই একটা ভালো ব্যবসায়—বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রে।

আমার কাছে এটা কিন্তু এক বিরাট ঠাট্টা। আমি সংশোধিত হতে সরাসরি আপত্তি জানালাম। উচ্চপদস্থ কোন এক অফিসার তদন্ত করতে এলে তার মুখে থুথু ছিটিয়ে দিয়েছিলাম। তাঁরা কিন্তু আমায় ছাড়লেন না। তাঁদের কাছে আমি এক বিপদজ্জনক-চরিত্রের মেয়ে ছেলে। তাঁরা যেহেতু আমায় সংশোধন করতে পারলেন না তাই তাঁরা আমায় এখান থেকে অন্য আরেক জায়গায় পাঠালেন আমি জেলে গেলাম।

* * *

জেল বড় চমৎকার জায়গা। জেল যে কোন লোককে এই বিশ্বাস করিয়ে ছাড়বে যে মানব সমাজের কোন ভবিষ্যৎ নেই। স্বপ্নেও .কখনও আমি কল্পনা করতে পারিনি যে জেল অপেক্ষা অন্য কোন কোটর এত ঘৃণ্য হতে পারে।

তবে একবার যখন এখানে ঢুকতে পেরেছি তখন এখান থেকে চলে যাওয়ার চিন্তা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করলাম। আমি জানি যে জেলের বাইরের জগত এর থেকে বিশেষ একটা ভালো নয়।

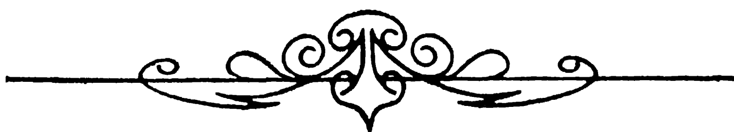
আমার যদি যাবার মত কোন ভালো জায়গা থাকতো তাহলে এই জেলে মরতে চাইতাম না কিন্তু বাইরের পৃথিবীটা কেমন তা আমার জানা আছে যেখানেই মারা যাওনা কেন—সর্বত্রই সমান অবস্থা।

এখানেই, হ্যাঁ এখানেই আবার আমার পুরানো বন্ধু-আধখানা চাঁদের দেখা পেলাম। অনেক দিন তাঁর দেখা পাই নি।

আচ্ছা মা এখন কি করছেন ?

আধখানা চাঁদ আমায় সব কিছু মনে করিযে দেয়।

লেখক—লাও শী



শ্রীযুক্ত পান কেমন করে ঝড় সামলালেন

স্টেশনটা লোকে লোকারণ্য ; তারা সকলেই নিজ নিজ সমস্যা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত। তাই তাদের কাউকেই স্বাভাবিক দেখাচ্ছে না। কুলিরা তাদের নম্বর সাঁটা ইউনিফর্মের দুপকেটে হাত গুঁজে দিয়ে নিশ্চল হয়ে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যা দেখে মনে হয় তারা বুঝি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওরা বেশ ভালো ভাবেই জানে যেপরিমান বখসি্শ তারা বাবুদের কাছ থেকে আশা করে তা পেতে তাদের এখনও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে হবে; এখনই তা পাবার সময় হয়নি। তাই ও ব্যাপারে আগ্রহ দেখানোর মানেই হয় না। আব্‌হাওয়াটা বেশ গুমোট হয়ত বৃষ্টি নামবে। কিছুক্ষণ আগে জ্বেলে দেওয়া বাতির জ্যোতি কমে যাওয়ায় তার নিচে সব কিছুকেই কুয়াশায় ঢাকা বলে মনে হচ্ছে।

ব্ল্যাকবোর্ডে লট্‌কানো নোটিশ থেকে জানা গেল যে পশ্চিম দিক থেকে আগত দ্রুতগামী ট্রেন চার ঘন্টা দেরীতে আসছে। কয়েকঘণ্টা আগে এই নোটিশটা বহুবার পঠিত ও পুনপঠিত হওয়ায় তা এখন পুরানো ছেঁড়া থিয়েটারের টিকিটের মত বাতাসে এলোমেলো ভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে এবং এখন সেটা কারুরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে না। গত এক সপ্তাহ ধরে প্রায় সব ট্রেন সম্বন্ধেই এ ধরনের নোটিশ পড়ায় এরকমটা যে ঘটবে তা সহজেই অনুমেয়।

সকলের মনের ভেতর যে ট্রেনটা এতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুরপাক খাচ্ছিল শেষ পর্য্যন্ত সেই ট্রেনটার আবির্ভাব ঘটলো। সঙ্গে সঙ্গে বিষন্ন ষ্টেশনটা কর্মচাঞ্চল্যে মুখর হয়ে ওঠে। যাঁরা গন্তব্য স্থলে এসে স্বস্তিলাভ করলো বা তাদের জন্য অপেক্ষারত যে সব মানুষদের পেয়ে তাদের আনন্দ হল বা যে সব কুলিরা বখশিস্ পেল সেই সব মানুষদের সম্বন্ধে বিস্তারিত কোন আলোচনা আমি করব না। আমাদের আলোচ্য বিষয় শ্রীযুক্ত পান নামে

শুধু এক ভদ্রলোককে কেন্দ্র করে। তিনি আসছেন রংগলি নামে নিকটবর্তী এক ষ্টেশন থেকে। ট্রেনটা ধীরে ধীরে ষ্টেশনে ঢোকার আগেই তিনি সব কিছু তাঁর মনোমত করে গুছিয়ে নিয়েছেন। এই চার জনের ছোট্ট পরিবারে প্রথমেই আছেন তিনি। তাঁর ডান হাতে কালো চামড়ার ব্যাগ। বাঁহাতে ধরা আছে তাঁর ছ বছরের ছোট ছেলের হাত। তার অন্য হাত ধরে আছে তার আটবছরে দাদার একটা হাত। দাদার অপর হাতটা আবার ধরা আছে মায়ের একটা হাতে। শ্রীযুক্ত পান বলে দিয়েছেন যে তারা যদি পরস্পরের হাত ধরাধরি করে লম্বা একটা লাইন করে না চলে তাহলে সকলের উপর নজর রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ এভাবে হাত ধরাধরি করে চললে তাঁরা সাপের মত একেবেঁকে যত্রতত্র যেতে পারবেন। বারবার করে এই কথাটা তাঁর পরিবারের সকলকে বলে দিয়েছেন যে তারা যেন কোন অবস্থাতেই হাত ছেড়ে না দেয়—তা যাই ঘটুক না কেন। পাছে অন্যেরা তাঁর এই নির্দেশ ভুলে যায় তিনি বাঁ হাত দোলাতে দোলাতে চলেন—যা দেখে লাইনের সকলের তাঁর ঐ নির্দেশ মনে পড়ে যায়।

সকলে হাত ধরাধরি করে লম্বা লাইন করে চলাটা ভালো নিশ্চয়ই তবে তারও বাস্তব কতকগুলি অসুবিধা আছে। ট্রেনটা আসতে আসতে থামতেই সব যাত্রীই তার বোঁচকা বুঁচকি সহ হুড়মুড করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু লাইনের দীর্ঘতার জন্যে শ্রীযুক্ত পানের পরিবারের সকলকে বেশ কষ্টভোগ করতে হল। হাতের কালো ব্যাগটার সাহায্যে রাস্তা করে বুক ও পেট দিয়ে সামনে জোরে ধাক্কা দিতে দিতে শ্রীযুক্ত পান কামরার দরজার থেকে মাত্র দুটি জানলার সামনে এসে হাজির হলেন। তার ছ বছরের ছেলেটা কিন্তু তখনও রয়ে গেছে আরও চারটে জানলা পেছনে। সে কামরার সীট ও লোকেদের মাঝে গাদাগাদিতে চাপা পড়ে গেছে। দুদিক থেকে তার দুহাতে ভীষণ টান পড়ায় তার মনে হল হাত দুটো বোধহয় তার ছিড়ে বেড়িয়ে যাবে। তাই মরীয়া হয়ে সে কেঁদে ওঠে, “গেল, আমার হাতটা গেল।”

বাচ্চা ছেলের কান্নার শব্দ কানে যাবার আগের মুহূর্ত পর্য্যন্ত যাত্রীরা কেউ বুঝতেই পারেন নি যে একটা ছেলে তাদের পায়ের মাঝে আটকা পড়ে গেছে। ভালো করে লক্ষ্য করে তারা দেখে যে চারজনের একটি পরিবারের সকলে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে একটা লাইন করে রয়েছে।

একজন যাত্রী বলেন, "আমায় যেতে দিন না। ছেলেটা ছিঁড়ে যাবে যে!"

"হচ্ছেটা কি? লোকটা বাচ্চাকে কোলে নিচ্ছে না কেন?" দরজার দিকে একটু একটু করে এগুতে অন্য এক যাত্রী বলেন বিড়বিড় করে।

"না।" শ্রীযুক্ত পান ওঁদের সাথে একমত নন। শক্ত করে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে এক লাইনে চলার স্বপক্ষে অনেক ভালো ভালো যুক্তি রয়েছে। সেই যুক্তি সব বোঝার মত যথেষ্ট বুদ্ধি ওঁদের নেই। তাই ওদের সাথে তর্ক করা শুধুই পণ্ডশ্রম। ওদিকে আবার বাচ্চাটা চেল্লাচ্ছে। আমার হাত গেল বলে। এদিকে-আবার শ্রীযুক্ত পান দেখেন যে আগুপিছু করার মত যথেষ্ট জায়গা নেই। তাই তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর দেওয়া নির্দেশ নিজেই ভংগ করে ছেলের হাতটি ছেড়ে দিলেন। "আমার দিকে চোখ রেখে চলিস কোন মতেই চোখের আড়াল হবি না।" উদ্বিগ্ন হযে বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলেন।

টং করে শব্দ তুলে একটা ঝাকুনি দিযে ট্রেনটা একেবারে থেমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে এক দংগল লোক দরজা দিযে ছিটকে বেড়িয়ে গেল। শ্রীযুক্ত পান অনুভব করেন যে এতক্ষণে সামনের চাপটা এইটু শিথিল হলেও পেছনের চাপ হঠাৎ এক বাড়তি গতিবেগ সঞ্চয করে তার পা দুটি বিনা আযাসে তাকে সামনে এগিযে নিয়ে গেল। তিনি চেয়েছিলেন পেছন ফিরে তাঁর বাহিনীকে একটু গুছিয়ে নিতে; কিন্তু এখন সেটা অসম্ভব মনে হওয়ায় তিনি সামনের দিকে চেয়ে চীৎকার করে বলেন, "আমার ঠিক পেছু পেছু এসো।"

যাহোক যেমন করেই হোক্ তিনি কামরার বাইরে চলে এলেন, সঙ্গে সঙ্গে মাথা ফিরিয়ে দেখেন যে তাঁর স্ত্রী ও বাচ্চারা ঠিক তার পেছনে নেই। তারা কামরার ভেতর কোথাও না কোথাও চাপাচাপি করে রয়েছে। তাই দরজার বাইরে তাদের জন্যে অপেক্ষা করাটাই এই সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলেই তাঁর কাছে মনে হল। আরও শতখানেক যাত্রী নামার পর ক্ষীণ আলোর নিচে তাঁর ছোট ছেলের কুঞ্চিত অশ্রু-সজল চোখের দেখা মিললো। শ্রীযুক্ত পান বার চারেক এগিয়ে গিযে অবতরণকারী যাত্রীদের দ্বারা বাধা পেয়ে বার কয়েক আগুপাছু করে শেষ পর্য্যন্ত ছেলেটাকে বাঁ হাতে ধরে প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে দেন। আরও কিছুক্ষণ পরে তাঁর স্ত্রী ও ছেলের দেখা পাওয়া গেল। ভীষণ হাঁফাতে হাঁফাতে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে স্বামীর দিকে বিষন্ন

চোখ মেলে ঠিক সেইভাবে তাকান যে ভাবে সান্ত্বনা পাবার জন্যে বাচ্চা ছেলে তাকায়।

যাহোক শ্রীযুক্ত পান-এর উপস্থিত বুদ্ধি কিছু রয়েছে। পুরো বাহিনীটা আবার একত্র হওয়ায় তিনি আবার এক নয়া ফরমান জারি করেন। আবার আমাদের হাত ধরাধরি করে চলতে হবে। দেখছনা প্ল্যাটফর্মে কত লোক। আবার বাইরে যাবার গেটটা ত লোকের ভীড়ে জমজমাট। এখন যদি আমরা হাত ধরাধরি করে না চলি ত হারিয়ে যেতে বাধ্য।

ছ বছরের ছেলেটার বেশ কষ্ট হয়েছে। সে বাবার পা জড়িয়ে বলে, "বাবা কোলে।"

"ক্ষুদে শয়তান।" শ্রীযুক্ত পান ভীষণ রেগে গেলেও একটু ঝুঁকে বাচ্চাকে কোলে তুলে নেন, আর বড় ছেলেকে বলেন সে যেন তার গাউনের পেছনের খুঁট বেশ শক্ত করে ধরে রাখে আর অন্য হাতে যেন তার মায়ের হাত ধরে থাকে।

এর পূর্বে শ্রীমতী পানকে কখনও এই ধরনের কঠোর পরীক্ষায় পড়তে হয়নি। তিনি বিড়বিড় করে বিরক্তি সহকারে বলেন, "এরকমটা যে ঘটবে তা আগে জানা থাকলে বাইরে বেড়িয়ে উদ্বাস্তু হওয়ার চেয়ে বাড়ীতে বসে মৃত্যুর প্রহর গোনা ভালো ছিল।"

সহানুভূতি মিশ্রিত বিরক্তির স্বরে শ্রীযুক্ত পান বলেন, "এখন দুঃখ করে কি লাভ ? এখনত আমরা পৌঁছে গেছি। তাই দুঃখ করার কোন মানে হয় না। তাছাড়া এখানে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। এখন যাওয়া যাক্। দেখে দেখে চলো।" ঐ চারজন টলতে টলতে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল।

একটা প্রচণ্ড ধাক্কা! সঙ্গে সঙ্গে টিকিট সংগ্রাহক দ্বারা রক্ষিত সংকীর্ণ দরজা দিয়ে গলে ঠিক স্বপ্নোত্থিতের মত শ্রীযুক্ত পান বাইরে বেড়িয়ে এলেন। ঘুর্ণিঝড়ের মাঝে এক এক ফোঁটা জলবিন্দুর মত তাঁর চারদিকের অসংখ্য লোকের ধাক্কায় ভেসে যাওয়া ছাড়া তাঁর অন্য কোন বিকল্প ছিল না। তাঁর পা মাটি স্পর্শ করেনি বলা চলে। মুহুর্তের মধ্যে শ্রীযুক্ত পান ষ্টেশন চত্বরের কাঁটা তারের বেড়া পার হয়ে ট্রামরাস্তার ওপারে সিমেণ্ট বাঁধানো ফুটপাথে এসে হাজির হলেন। দ্রুত পেছন ফিরে দেখেন আলোর নীচে অসংখ্য পাণ্ডুর মুখ, অসংখ্য বোঁচকা বুঁচকী তার দিকে যেন গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে। হঠাৎই তাঁর খেয়াল হল যে যে ছোট্ট হাত তাঁর লম্বা গাউনের পেছনের খুঁট ধরেছিল সেটা আর সেখানে

নেই ; হাতটা কোথায় ছেড়ে গেল—তাঁর খেয়ালই নেই। অবর্ণনীয় ব্যথায় তাঁর হৃদয়মুচড়ে ওঠে। আপনা আপনি মাথাটা তাঁর পেছনে ঘুরে গেল। কিন্তু কোথাও তাঁর বৌ ছেলের দেখা নেই। মনে হল মনে তাঁদের তিনি চিরকালের জন্য খোয়ালেন। তাঁর চোখ জলে ভড়ে যায় ; চোখের জলে তিনি দেখেন আশে পাশের মানুষ, আলো সব যেন সাঁতার দিচ্ছে।

সৌভাগ্যের কথা যে তাঁর কোলের ছেলেটার দৃষ্টি বেশ তীক্ষ্ণ। সে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, "ঐ ত মা।" সে ভালো করে লক্ষ্য করে মায়ের কপালের ভ্রুর কাটা দাগ চিনতে পারে।

শ্রীযুক্ত পান-এর খুসী আর ধরে না। প্রথমেই ছেলের জামার খুঁটে চোখটা ভাল করে ঘসে নিয়ে ছেলের নির্দেশিত দিকটা লক্ষ্য করেন ; কারণ এই সুসংবাদটা কোন মতেই বিশ্বাস করতে সাহস পাচ্ছিলেন না। তিনি দেখলেন যে তাঁর বড় ছেলের ঘাড়ে নিরাপত্তা মূলকভাবে হাতটা রেখে তাঁর স্ত্রী ভীড়ের মাঝে ডাইনে বাঁয়ে করে ছুটছেন। ওরা এখনও ট্রামরাস্তার অন্য পারে রয়েছে। "আদা" বলে দূর থেকে তাঁকে ডেকে তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে ওদের এই ফুটপাথে নিয়ে এলেন। অবশেষে কোল থেকে ছোট্ট ছেলেকে মাটিতে নামিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "যাক সব ত ভালোয় ভালোয় এখন কাটলো।" এই বলে রুমালে মুখ মোছেন। সত্যিই সব ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। কারণ যখন কাঁটাতারের বেড়া পার হতে পেরেছেন তখন তাঁরা যুদ্ধ, ডাকাত, আগুন থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও তাছাড়া তিনি হারিয়ে যাওয়া তাঁর স্ত্রী পুত্রকে আবার ফিরে পেয়েছেন। এটা যেন এক প্রচণ্ড বিপর্য্যয়ের হাত থেকে চারটে প্রাণ আর এক কালো ব্যাগকে উদ্ধার করেছেন। নিশ্চিতভাবে সব ভালোয় ভালোয় কাটলো। গম্ভীর মেজাজে তিনি হাঁক পাড়েন, "রিক্সা ?" অনেকগুলো রিক্সাওয়ালা, কোথায় তাঁরা যাবেন তা জানতে ; হৈ চৈ করে ছুটে এল। তাঁর কথার মর্য্যাদা বাড়াতে মাথাটা একটু তুলে দুটো আঙ্গুল নেড়ে শ্রীযুক্ত পান বলেন, "আমাদের খালি দুটো রিক্সা চাই।" ব্যাপারটা ভালো করে ভেবে নিয়ে তিনি বললেন, "ফোর্থ এ্যাভিন্যু যাবো-দশটা তামার মুদ্রা দেব কে যাবে ?" এই কথাটা বলে তিনি ওঁদের জানিয়ে দেন যে সাংহাই-এর রাস্তাঘাট তাঁর বেশ ভালো করেই জানা আছে।

অনেক তর্কাতর্কির পর ওঁরা প্রতি রিক্সা বাবদ দশটি তাম্রমুদ্রা করে দুটি রিক্সা ভাড়া করেন। বড় ছেলে সহ শ্রীমতী পান উঠলেন একটা

রিক্সায়। অন্যটায় ছোট ছেলে আর কালো ব্যাগ নিয়ে চড়লেন শ্রীযুক্ত পান।

রিক্সাওয়ালা সবে সোজা দাঁড়িয়ে চলতে সুরু করতে যাবে ঠিক তখনই বন্দুক ঘাড়ে এক ভারতীয় পুলিশের প্রসারিত হাত তাকে বাধা দিল। তার ভীতিপ্রদ ভুতুড়ে মুখ দেখে শ্রীযুক্ত পানের হাঁটুতে বসা ছোট ছেলেটা ভয়ে তাঁর বুকে মুখ লুকালো।

বাবা বলেন, "আরে এতে ভয়ের কি আছে? ও ত একজন ভারতীয় পুলিশ। ওর পাগড়ীটা কি সুন্দর লাল তাই না? আমাদের বাড়ী যেখানে সেখানে ওর মত পুলিশ নেই, তাইত এখানে আমাদের চলে আসতে হল। ও আমাদের বাচাবার জন্যেও বন্দুক চালাবে। ওর দাড়িটা খুব মজার। দেখ না। ওকে দেখতে ঠিক মন্দিরের পুরুতের মত।"

ছেলেটা এত ভয় পেয়েছে যে সে এমন কি পুরুতের দাড়ি পর্য্যন্ত দেখতে আগ্রহী নয়। কেবলমাত্র যখনই ট্রামের ঠনঠন্ শব্দ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঠিক তখনই সে বাপের বুক থেকে মুখ তুলে উঁকি মেরে দেখে যে নিমেষের মধ্যে অতি উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত একটা কামরা ছুটে চলে গেল। ট্রামরাস্তার ওপারেও চোখ ধাধাঁনো জিনিষপত্রে ঠাসা উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত ঘর রয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত সে তার বাপের বুক থেকে মুখ তুললো।

ফোর্থ এ্যাভিন্যুতে পৌঁছে তারা একটা ঘরের সন্ধানে প্রায় আধডজন হোটেল দেখলো। সব কটা হোটেলেই "হাউসফুল" সাইন বোর্ড লট্কানো। এক পলকে দেখেই তারা নিশ্চিত হন যে তাঁদের ঘর দেবার জন্য ম্যানেজারকে প্রলুব্ধ করা বৃথা। কেন না হোটেলের আরাম কেদারা, সোফা কৌচ দিয়ে সাময়িক ভাবে বিছানা পাতা হয়েছে। নিশ্চিতভাবে সব হোটেলই পরিপূর্ণ। শেষ পর্য্যন্ত একটা হোটেলের এক করনিকের দেখা মিল্লো যিনি টেনে টেনে বললেন, "ঘর একটা চাই-তাই না?"

"হ্যাঁ আমাদের একটা ঘর চাই। হবে নাকি একটা?" এক চিল্তে আশার আলো শ্রীযুক্ত পান-এর মনের ভিতর দিয়ে বয়ে গেল। তাঁর মনে হল তাঁরা যেন আশ্রয়স্থলে পৌঁছে গেছেন।

"একটা খালি ঘর আছে। ওটা যিনি নিয়েছিলেন মাত্র ২ মিনিট আগে তিনি ওটা ছেড়ে দিয়েছেন। নিজের জন্য তিনি একটা আস্ত বাড়ী ভাড়া করেছেন। কয়েকমিনিট পরে এলে ওটাও পেতেন না।"

"ঐ ঘরটাই আমাদের দেন।" শ্রীযুক্ত পান কোল থেকে ছেলেকে রাস্তায় নামিয়ে ঘুরে তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে রিক্সা থেকে নামতে সাহায্য করেন, "যাই হোক আমাদের কপালটা ভালোই। শেষ পর্যন্ত ঘরও একটা জুটলো।" রিক্সাভাড়া চোকানোর সময় এলে শ্রীযুক্ত পান মহানুভবতা দেখিয়ে প্রতিটি রিক্সা বাবদ চুক্তিবদ্ধ ভাড়ার উপরও আরও একটা করে বাড়তি তাম্রমুদ্রা দিতে গেলেন। তাঁর নিজের বিশ্বাস হচ্ছে কপাল যখন ভালো থাকে তখন অন্য লোকেদের সাথে যদি ভালো ব্যবহার করা যায় তখন ভালো কপাল বরাবর থেকে যায়। কিন্তু দেখা গেল রিক্সা চালকরা ভীষণ অকৃতজ্ঞ। তারা দাবী করে যেহেতু অনেক হোটেল ঘুরতে ঘুরতে অনেক সময় চলে গেছে এখন শ্রীযুক্ত পান-এর উচিত প্রতিটি রিক্সা বাবদ আরও পাঁচটি করে বাড়তি তাম্রমুদ্রা দেওয়া। পরিশেষে হোটেলের এক পরিচারকের মধ্যস্থতায় আরও বাড়তি চারটে তাম্রমুদ্রা দিয়ে তিনি নিস্কৃতি পান।

ঘরটি নীচের তলায়। ঘরে একটা বিছানা ছাড়াও একটা বাতি দুটো চেয়ার ও একটি টেবিল রয়েছে ঘরে ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু নেই। তাঁর পরিবারবর্গ নিয়ে শ্রীযুক্ত পান ঐ ঘরে ঢুকতেই মাছ ভাজার গন্ধের সাথে মেশানো প্রস্রাবের তীব্র কটুগন্ধ তার নাককে সরাসরি আক্রমণ করে। "কি দুর্গন্ধ!" বিরক্তিভরে তিনি বলেন, পাশের ঘর থেকে গরম তেলে খাদ্য ভাজার চ্যাঁক চ্যাক শব্দ ভেসে আসছে। নিশ্চিতভাবে দেওয়ালের ওদিকটায় রান্নাঘর। গন্ধটা যত কটুই হোক্, খোলা আকাশের নিচে গুলি খেয়ে মরার থেকে এটা ঢের ভালো—এই সিদ্ধান্ত করে শ্রীযুক্ত পান একটু যেন স্বস্তি বোধ করেন। আয়েষ করে তিনি একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন।

কালো ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে পরিচারক জিজ্ঞেস করেন। "রাতের খাবার খাবেন ত?"

এই শুনে ছোট ছেলেটা আংগুল চুষতে চুষতে আধো আধো স্বরে বলে, "আমি ভাতের সাথে শূয়োরের মাংস খাবো।"

তার দিকে কঠিন দৃষ্টি দিয়ে মা বলেন, "ভাত আর শূয়োরের মাংস-বটেইত। কোথায় আমরা এখন উদ্বাস্তুর মত ঘুরে বেড়াচ্ছি! বরাত ভালো বলতে হবে যে খাবার এখনও পাওয়া যাচ্ছে—এটা খাব ওটা খাব সব বলো কি করে?"

বড় ভাই ছোটটার থেকে কম যায় না। "আমরা এখন সাংহাইতে

আছি তাই তখন ইংরেজী খানা চেখে দেখতে চাই বাবা" বাবার কাছে সে প্রার্থনা করে।

এইবার শ্রীমতী পানও ক্ষেপে লাল। তিনি এবার বড়টিকে পাকড়াও করে আহতস্বরে বলেন, "তা খাবেনা। তোমাদের কিসসু খেতে দিতে নেই স্রেফ উপোস করিয়ে রাখতে হয়।"

এবার শ্রীযুক্ত পান বিব্রত বোধ করেন। উনি ব্যাপারটা লঘু করার জন্য বলেন, "ওরা জানেনা কি বলছে।" তারপর পরিচারককে বলেন, "আমরা ট্রেনে কিছু খেয়ে নিয়েছি। খালি দুটো ফ্রায়েড রাইস ও ডিম দাও।" পরিচারক হাঁ বা না কোনো কিছু না বলে ঘাড় নেড়ে চলে গেল। লোকটা দরজার চৌকাঠে পা রাখতে না রাখতে পান তাকে ডাকেন, "আমার জন্য এক বোতল শ্যাও জিংস মদ ও দশ ফেট এর মাছভাজা এনো।"

এখন শ্রীযুক্ত পানকে সুস্থ ও শান্ত দেখাচ্ছে। পরিচারক চলে যেতেই তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "এখন আমাদের একটু বিশ্রাম ও মদ্যপান করা দরকার। ভেবে দেখ ত, আমরা বিপদজনক জায়গা ছেড়ে চলে এসেছি এমন এক জায়গায় সেখান বিপদ আমাদের ছুঁতে পারবে না। এটা এমন কিছু একটা যা উৎসব করে আমাদের পালন করা উচিত। এই দেখ না তোমরা হারিয়ে গেলে, তোমাদের খুঁজে পেতে আমার প্রচুর বেগ পেতে হল। চিন্তায় চিন্তায় আমি পাগল হবার যোগাড়। ছোট ছেলেটা খুব চালাক। তাকে টেনে নিয়ে তার মাথায় সস্নেহে চাপড় মারেন। ও তোমায় ঠিক দেখতে পেয়েছে। আর তাইতো তোমায় আবার ফিরে পেলাম। এটাও ত উৎসব করে পালন করার মত একটা ঘটনা। সব কিছুই যখন চমৎকার ভাবেই ঘটে গেল তখন একটু মৌজ করে কয়েক কাপ মদ্যপান করা যাক্।" খুশীতে ডগমগ হয়ে তিনি হাতে করে একটা কাল্পনিক মদের কাপ মুখে তুলে নেন।

তাঁর স্ত্রী কোন জবাব দিলেন না। তিনি তখন তাঁর নিজ বাড়ীর চিন্তায় মগ্ন। এটা ঠিক যে যাতে মূল্যবান জিনিসপত্র সব নিরাপদে থাকে তার জন্য সে সব বাক্স বন্দী করে তাঁরা গির্জায় গচ্ছিত রেখে এসেছেন, তাহলেও অনেক জিনিষই আলগা পড়ে রয়েছে। পরিচারিকা ওয়াংগ বিশ্বাসী কি না সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নন। তিনি আবার ভাবছেন তাঁর গরীব প্রতিবেশীরা এটা জানে কিনা যে বাড়ীটা দেখাশুনার সব দায়িত্ব পরিচারিকা ওয়াংগ এর উপর ন্যাস্ত করে পুরো পরিবারটা পাড়া

ছেড়ে চলে গেছে কি না; রাতে দরজা জানালা সব বন্ধ করার কথা পরিচারিকা মনে রাখছে কি না। বাড়ীর পেছনে তিনটে মোটা মুরগীর কথা, তাঁর ছোট ছেলের জন্য এক জোড়া পাতলুন সেলাই করার কথা এই সব কিছুই তিনি ভাবছেন। ......এই সব চিন্তা যতই তাঁর মনের ভেতর দিয়ে বয়ে যায় ততই তাঁর অস্বস্তি বেড়ে যায়। "ভাবছি পুরো বাড়ীটা ওরা একেবারে কি নোংরাই না করে রাখবে" দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে বলেন।

ছেলেদের মনে এক নিরানন্দের প্রবাহ বয়ে যায়। তারা অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে যে সাংহাই সম্বন্ধে বাবা মার কাছ থেকে এত কথা তারা শুনেছে সেই সাংহাই থেকে এই মাত্র এসে পৌঁছানো সাংহাই মোটেই আকর্ষনীয়, কৌতুহলোদ্দীপক নয়।

জানালা থেকে বৃষ্টির ছাঁট ঘরে ঢুকছে। "আরে সত্যিই বৃষ্টি পড়ছে কপাল ভালো বলতে হবে যে একটু আগে বৃষ্টি সুরু হয় নি।" জানালা বন্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে শ্রীযুক্ত পান বলেন। হঠাৎই তাঁর নজরে পড়ে যায় খোলা জানালার আড়ালে অর্দ্ধলুকায়িত অবস্থায় লট্‌কানো হোটেলের নোটিশটার কি যেন একটা জরুরী কাজের কথা মনে করতে করতে তিনি একদৃষ্টে সেই চিরকুটটার দিকে চেয়ে দেখেন।

"আরে আরে, দু-ডলার; এক পয়সা কম নয়।" এই ছিল তাঁর আতংকগ্রস্ত আর্তনাদ। তিনি স্ত্রীর দিকে তাৎপর্য্য পূর্ণভাবে লক্ষ্য করার জন্যে ঘুরে দাঁড়ান, এই মাত্র তিনি যা আবিষ্কার করলেন তা দেখে তিনি হাঁফাচ্ছেন।

(২)

পরদিন ভোরবেলা। বড় হলঘরটায় কয়েকটা বেঞ্চ জোড়া লাগিয়ে হাত পা গুটিয়ে তার উপরে হোটেলের পরিচারকেরা তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘরের ছাদের সংকীর্ণ ছিদ্রপথ বেয়ে খুব একটা সূর্য্যের আলো ঘরে ঢোকে না। হোটেলের অনেক ঘরে তখনও ক্ষীণ হলদে আলো টিমটিম করে জ্বলছে। কিন্তু এরই মধ্যে শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী পান নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা সব সেরে ফেললেন। গতকালের সাংহাই এর তুলনায় আজকের সাংহাই ভালো হতে পারে এই আশা করে ছেলে দুটি অনেক সকালেই জেগে উঠেছে। কিন্তু তাদের বাবা মা তাদের আর খানিকক্ষণ ঘুমাতে বলায় তারা বিছানায় শুয়ে শুয়ে পরস্পরকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

শ্রীমতী পান ভীষণ উদ্বিগ্নস্বরে বললে, "আমার মনে হয় তোমার না যাওয়াই ভালো। কাগজে যা বেড়িয়েছে তা সবই সত্য—সে ব্যাপারে এত নিশ্চিত হচ্ছ কি করে? এত কষ্ট স্বীকার করে বাড়ী থেকে যখন বেড়িয়ে পড়েছি তখন আবার সেখানে ফিরে যাওয়ার কোন মানেই হয় না।"

"আসলে এ রকম ব্যাপারটা যে ঘটবেই তা আমি আগেই জানতাম। অধিকর্তা গিউ কোন কিছু সহজে ছেড়ে দেবার পাত্তরই নন। যেহেতু ওখানে যুদ্ধ হচ্ছে না, তাই ওখানে যথারীতি স্কুল চালু করতে হবে। হ্যাঁ কথাটা তাঁর মতই শোনাচ্ছে বটে! আমি এই সাংবাদিকটিকে চিনি। উনি শিক্ষাদপ্তরে কাজ করেছিলেন। অতএব এই সংবাদের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে না। আমাকে যেতেই হবে"

"ফিরে যাওয়ার ঝুঁকি কত তা কি তুমি জানো না?" তাঁর কথায় বেদনার আভাস। "দুই এক দিনের মধ্যে আমাদের এলাকাতেও যুদ্ধ স্বুরু হয়ে যেতে পারে। আমি না হয় ধরেই নিলাম যে তুমি ফিরে গিয়ে, স্কুল চালু করে দিলে, তোমার কি ধারণা যে ছাত্ররা স্কুলে আসবে? তাছাড়া আমাদের এলাকায় যুদ্ধ না ছড়িয়ে পড়লেও শিক্ষা দপ্তরের অধিকারিক স্কুল যথারীতি চালু না করার কারণ জানতে চাইলে তাঁকে উত্তর দেবার মত ভালো কারণ ও তোমার জানা আছেই। স্রেফ তুমি ওঁকে জিজ্ঞেস করবে, আজকের দিনে কোনটা বেশী জরুরী, মানুষের জীবন না পড়াশুনা? উনি নিজে ত অমর নন। তুমি ফিরে না গেলে তোমায় অপরাধী তিনি করতে পারবেন না।"

অল্প ঘৃণাভরে শ্রীযুক্ত পান বলেল, "বুঝছনা তুমি। এ রকম যুক্তি কেবল তোমার মত বোকা মেয়েরাই দিতে পারে যারা নিরাপদে কেবল বিছানায় শুয়ে থাকে। ঐ ধরণের কিছু একটা উত্তর দিই তা নিশ্চয়ই তুমি চাও না? আমায় বাধা দেবার চেষ্টা করো না।" তাঁর কণ্ঠস্বরে মীমাংসার সুর। "ফিরে আমায় যেতেই হবে। সামান্যতম বিপদের আশংকা নেই। আর তাছাড়া কিভাবে ক্ষতি এড়িয়ে চলতে হয় সে আমার বেশ ভালোভাবেই জানা আছে।" নিজের কূটনৈতিক চাল দেখে শ্রীযুক্ত পান নিজেই হেসে ফেলেন। "তাছাড়া এক্ষুণি তুমি বাড়ীতে আলগা ফেলে আসা জিনিষের জন্য চিন্তা করছিলে না? একবার ফিরে যেতে পারলে আমি ওগুলোর উপর নজর রাখতে পারবো—যাতে করে তুমি এখানে নিশ্চিন্তে থাকতে পার। পরিস্থিতিটা একটু স্বাভাবিক হলে আমি এসে তোমায় ও ছেলেদের নিয়ে যাবো।"

শ্রীমতী পান জানতেন যে তাঁর স্বামীকে বাড়ী ফিরে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করলে তাঁর আর কোন উপায়ই নেই। এটা অবশ্যই খুবই ভালো হয় যে উনি বাড়ী ফিরে গেলে সেখানকার জিনিষ সব দেখাশুনা করতে পারবেন। কিন্তু এই অনিশ্চিত সময়ে তিনি চলে গেলে তা হবে সমুদ্রে মুক্তা ফেলার মত। ওঁকে তিনি আবার নাও ফিরে পেতে পারেন। বিচ্ছেদের বেদনা ও মৃত্যুর বিভিষিকায় তাঁর হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। চোখের জলে চোখের পাতা ভিজে ওঠে এবং তা তাঁর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ার উপক্রম করতেই তিনি চোখের জল ভুলে স্বামীর দিকে তাকাতে পর্যন্ত সাহসী হলেন না। অকস্মাৎ তাঁর মনে পড়ে যায় যে এ সময় তাঁর চোখের জল ফেলা অশুভ ব্যাপার হবে। আর তাছাড়া এমন কিছু ঘটে নি যার জন্যে চোখের জল ফেলতে হবে। কষ্ট করে চোখের জল আটকে তিনি প্রকৃত আগ্রহের পরিবর্তে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার সুরে বলেন, "তাহলে যাও ; কেমন সব চলছে দেখে এসো সব। শিক্ষা দপ্তর যথারীতি স্কুল চালু করার কথা যদিনা বলেন তাহলে বিকেলের ট্রেনেই—যদি পারো না হলে অন্ততঃ পরদিন সকালের ট্রেনে চলে এসো। দেখ…" আর তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। একফোটা চোখের জল হাতের উপর পড়তেই উনি সেটা দ্রুত মুছে নিয়ে বললেন, "তোমার জন্য এত চিন্তা হয় না।"

শ্রীযুক্ত পান নিজেও বিরক্তবোধ করেন। যেহেতু শিক্ষাধিকারিক চান স্কুল যথারীতি চালু হোক, তাই তিনি কে ? যে তাকে বন্ধ রাখার জন্য জেদ করে থাকবেন। স্বভাবতই এর থেকে যা বেড়িয়ে এলো তা হচ্ছে যে তাঁকে ফিরে যেতেই হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে এখানে তাঁর পরিবারবর্গের কথা চিন্তা না করে তিনি থাকবেন কি করে ? তার স্ত্রীর মুখে বিষণ্ণতার ছাপ তিনি লক্ষ্য করেন। এরকম এক মহিলাকে দুই সন্তান সহ নিঃসহায় দুর্বল অবস্থায় একা ছেড়ে যাওয়া হৃদয় হীনতা ছাড়া অন্য কিছু না। তাদের কোন দুর্ঘটনা ঘটবেনা—এটাই বা তিনি ভাবছেন কি করে ?

এ সব কিছুই তাঁকে রাগত ও অশান্ত করে তোলে। তিনি ক্রুদ্ধ দুপক্ষের উপর যারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য পাঠিয়েছে, ক্রুদ্ধ শিক্ষা দপ্তরের অধিকারিকের উপর যাঁরা অবিলম্বে স্কুল চালু করতে চান, ক্রুদ্ধ নিজের উপর কেন না এ সময় তাঁকে সাহায্য করার জন্য তাঁর উপযুক্ত সন্তান নেই।

যাহোক তিনি মেয়েছেলে নন। তাঁকে আরও দুরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে

হবে। তিনি বোঝেন যে ওখানে ফিরে যাওয়াটাই তাঁর উচিত কাজ হবে। তাই সমস্ত রাগ ভুলে গিয়ে মুখে মানসিক অশান্তির কোন ছাপ না রেখে তিনি এমন ভাবে মাথা নাড়লেন, যে মনে হয় যেন তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে এক মত। "আমি যদি গিয়ে দেখি যে অধিকারিকের স্কুল চালু করার কোন বাসনাই নেই তাহলে তোমার কথামত বিকেলের ট্রেনেই ফিরছি।" তিনি নরম স্বরে বলেন।

বাবার শেষ কথাটা ছেলে দুটো শুনে ফেলেছে। বালিশে মাথার অর্ধেকটা ডুবিয়ে ছোট ছেলেটি আধো আধো স্বরে বলে, "আমিও বাড়ী ফিরে যাবো বাবা।"

মুখ ভেংচে বড়টি ছোটটির পেছনে লাগে। "আমি মা বাবা বাড়ী ফিরে যাবো। তুমি এখানে একা একা থাকবে।"

চোখে জোরে জোরে আঙুল ঘসে তারস্বরে ছোটটা কেঁদে ওঠে; চোখে কিন্তু এক ফোঁটা জল নেই। গলা চড়িয়ে শ্রীযুক্ত পান বললেন, "তোমরা দুজনেই এখানে মায়ের কাছে থাকবে। বাজে কথা ছেড়ে এখন প্রাতরাশের জন্য তৈরী হও ত।" স্ত্রীর সাথে আরও দুচারটে জরুরী কথা সেড়ে তিনি ষ্টেশানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান।

রাস্তায় পথচারীদের বিভিন্ন মন্তব্য থেকে তিনি জানলেন যে, "ট্রেন আর চলছেনা। ট্রেন যদি নাই চলে সব ঝামেলা ত মিটেই গেল। এরপর আমার স্কুল থেকে দূরে থাকার জন্যে ওঁরা যদি আমায় গুলি করে মারার সিদ্ধান্ত নেন ত কি করা যাবে? আমি তার কি করবো?" তিনি ভেঙ্গে পড়েন। আর কপাল যদি তাঁর ভালো থাকে ত প্রমাণিত হবে এটা গুজব ছাড়া অন্য কিছু নয়; সঠিক পরিস্থিতিটা কি সেটা জানতে তাঁর মনে হল রিক্সাওয়ালার আরও দ্রুত ছোটা উচিত।

কপালটা তার সত্যিই ভালো। ষ্টেশনে এমন কোন নোটিশ টাঙ্গানো নেই যাতে লেখা রয়েছে যে সব ট্রেন বাতিল হয়ে গেছে। ব্লাকবোর্ডে কেবল একটা মাত্র নোটিসে ঘোষণা করা হয়েছে যে রাতের ট্রেনটা চার ঘন্টা দেরী করে আসছে। টিকিট ঘরের সামনে জনতার ভিড় নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে দুটো একটা লোক টিকিট কিনতে সেখানে যাচ্ছে। ষ্টেশনে ভীড়ের অর্ধেকটা হল যাত্রীদের জন্য অপেক্ষারত আত্মীয় ও অর্ধেকটা হল দর্শক। কেউ কেউ ক্যামেরা নিয়ে অপেক্ষা করে রয়েছেন ট্রেন আসার সাথে সাথে ষ্টেশনের কর্মব্যস্ততার ছবি তোলার আশায়, যে ছবি ভবিষ্যতের কোন যুদ্ধ ও পরিবর্তনের ইতিহাস নামে কোন বইতে

ব্যবহার করা যেতে পারে। লগেজ রুমে গাদাগাদি করে এত স্যুটকেশ ও ব্যাগ জমা হয়ে রয়েছে যে তারা প্রায় ঘরের শিলিং ছোঁয় ছোঁয় আর কি।

তিনি স্বস্তি ও মনমরা দুই-ই অনুভব করেন। অল্প কিছু দ্বিধার পর তিনি একটি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটে ট্রেনের কামরায় উঠে বসেন। সূর্য্যের স্বচ্ছ আলো কামরাকে আলোকিত করলেও গরম তেমন নেই। অনেক সীট খালি পড়ে রয়েছে। মনে করলে তিনি শুয়ে পড়তে পারেন। তিনি মনে মনে ভাবেন, 'এটাই ত স্বাভাবিক। আমার মেজাজ ভালো থাকলে এটা একটা উপভোগ্য ভ্রমণ হতে পারতো।'

সেনা বাহিনীর ট্রেনটাকে আগে যেতে দেবার জন্যে এই ট্রেনটাকে বহু জায়গায় থামিয়ে দেওয়া হল। ট্রেন রংগলি পৌঁছাতে বেলা তিনটে পার হয়ে গেল। শ্রীযুক্ত পান তাড়াতাড়ি নিজের বাড়ী যান। বাড়ীটার গেটটা বেশ শক্ত করে বন্ধ দেখে তাঁর মানসিক উত্তেজনা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়। কারণ সাংহাই যাবার প্রাক্কালে তিনি পরিচারিকা ওয়াংগকে এই সাবধানতা অবলম্বনের ব্যাপারটা বারবার বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন।

কয়েকবার ধাক্কাধাক্কির পর পরিচারিকার দেখা মিলল। সে শ্রীযুক্ত পানকে সশরীরে দেখেত থ, "বাবু, ফিরে এলেন যে বড। তাহলে এখন আর এখান থেকে পালানোর কোন দরকার আর নেই ?"

তাডাতাড়ি বাড়ী ঢুকে চারদিকে চোখ বোলাতে বোলাতে বিড়বিড় করে পান কি যেন বললেন। তারপর তালা খুলে নিজের ঘরের ভেতরে ঢুকে সব জিনিষপত্র ঠিক ঠিক আছে কিনা একবার দেখে নিলেন। নাঃ কোন পরিবর্তন হয়নি। গতকাল যেখানে যেভাবে সব জিনিষপত্র রেখে গিয়েছিলেন ঠিক সেই সেই জায়গায সবকিছু রয়ে গেছে। তাঁর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি কিছু কমলো। কোন মতেই তিনি কিন্তু সম্পূর্ণ শান্ত হতে পারছেন না। তারপর আবার ঘরে তালা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে পরিচারিকাকে বলেন, "দ্যাখ গেটটা যেন ভালো করে তালা লাগানো থাকে।"

পরিচারিকা ত অবাক্। সে গেটে তালা লাগিয়ে ভেতরে গিয়ে ভাবতে বসে। কর্তা গিন্নী শহরে কোথাও না কোথাও রয়েছেন। তাঁরা হয়ত মনে করেছিলেন আমিও হয়ত ওঁদের সাথে যেতে চাইব তাই তাঁরা মিথ্যে করে সাংহাইতে যাবার গল্প ফেঁদেছে। "তা নাহলে কর্তা এত তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলেন কি করে ? গিন্নীমা আর ছেলেরা ত তাঁর সঙ্গে নেই।

কোথায় তাঁরা পালিয়ে থাকতে পারেন? ওঁরা আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন না কেন? হতে পারে এত লোককে জায়গা দেবার মত বড় ঘর তাঁদের নেই হয়ত। হতে পারে ওরা হয়ত বিদেশীদের জন্য নির্দিষ্ট করা বড় লাল বাড়ীতে রয়েছেন। সেনারা ঐ বাড়ীটা বেশ ভালো করেই জানেন তাই যুদ্ধের সময়েও ঐ বাড়ীটা স্পর্শ পর্য্যন্ত তারা করবে না। তবে আমায় সত্যি কথা বলা তাঁদের উচিত ছিল। কেননা আমি যাবার জন্যে মোটেই আগ্রহী ছিলাম না। এমন কি ওঁরা আমায় সাধলেও আমি যেতাম না। বিন্দুমাত্র ভয় আমি পাই নি। যুদ্ধ যদি এখানেও লেগে যায় তাকে কি? কবরে যাবার পোষক আমার অনেকদিন আগে থেকেই বানানো হয়ে গেছে। মনশ্চক্ষে তিনি দিব্যি দেখতে পেলেন তাঁর ভাগ্নীর উপহার দেওয়া সুন্দর কাজ করা কবরে যাবার জুতো এবং এই ভেবে মনে মনে সান্ত্বনা পেলেন যে তিনি যখন নরকে যাবেন তখন সেখানকার রাজা এই পোশাক দেখে তার সংগে সম্মান দিয়ে কথা বলবে।" তাঁর এই প্রতিক্রিয়া তাঁর মনে খানিকটা আনন্দ এনে দেয় যাতে করে কর্তা গিন্নী কোথায় আছেন এই চিন্তা থেকে নিজের মনকে তিনি মুক্ত রাখনে পারেন।

আধিকারিক সত্য সত্যই স্কুল চালু করতে চান কিনা তা জানতে শ্রীযুক্ত পান প্রথমেই সেই সাংবাদিকের কাছে গেলেন যিনি একসময় শিক্ষা দপ্তরে কাজ করতেন। উনি জবাবে বলেন, নিশ্চয়ই। একথাও আবার তিনি বলেছেন যে কিছু কিছু শিক্ষক নিজেদেরকে ক্ষতির সীমানার বাইরে রাখতে এত ব্যস্ত যে তার ফলে তারা তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা দেখিয়েছে। এর থেকেই প্রমানিত হয় যে তারা শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার সম্পূর্ণ অযোগ্য। তাদের কাউকে কাউকে এখনই ছাঁটাই করার সুবর্ণ সুযোগ। ঘোষনাটা হৃদয়ংগম করতে তিনি সোজা হয়ে বসেন। সঙ্গে সঙ্গে সাংহাই থেকে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে নিজের বুদ্ধিকে তিনি বারবার অভিনন্দিত করেন। তারপর সোজা স্কুলে এসে লেখার তুলি তুলে নিয়ে ছাত্রদের অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে একটা সার্কুলারের খসড়া লিখে ফেলেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে যুদ্ধ এবং যুদ্ধ চলা দুটোই ভাবনার বিষয়, কিন্তু ছোট ছোট ছেলেদের কাছে তা ভাত কাপড়ের মত যা একদিনের জন্য ফেলা রাখা চলে না। যেহেতু এখন গ্রীষ্মাবকাশ শেষ হয়ে গেছে তাই স্কুল যথারীতি চালু হতে চলেছে। গত বিশ্ব যুদ্ধের সময় ইউরোপে বোমার আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে শূন্যে একটা

জাল পাতা হয়েছিল যাতে করে পড়াশুনা বাধাহীন অবস্থায় চলতে পারে। নোটিশে আরও বলা হয়েছে যে এধরণের বিরত্ব দেখানো হবে অতুলনীয় ব্যাপার। আশা করা যায় যে মা-বাবারা এটা ভালোভাবে উপলব্ধি করে এমন ভাবে তাঁদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাবেন যা দেখে মনে হয় যেন কোথাও কিছু ঘটেনি। এসব কিছু ছাত্র ও স্কুলের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রাম শহরের সম্মানার্থে করা হচ্ছে।

তিন তিনবার খসড়াটা পড়ে তিনি এই ভেবে পরিতৃপ্তি বোধ করেন যে খসড়ায় আর কিছু যোগ করার কোন প্রয়োজন নেই। শ্রীযুক্ত পান আশা রাখেন যে শিক্ষাদপ্তরের আধিকারিক যখন এটা পড়বেন তখন তিনি নিশ্চয় মন্তব্য করবেন যে, "লোকটা আমার মতই একই চিন্তা করেন।" আত্ম সন্তুষ্টির মেজাজে তিনি নিজেই স্টেনসিল কেটে শতাধিক লিফলেট ছেপে স্কুলের দারোয়ানকে দিয়ে ছাত্রদের বাড়ী বাড়ী পাঠিয়েদেন, কাজটা করে দায়িত্ব পালন করার পরে তিনি তাঁর নিজস্ব ব্যাপারে মনসংযোগ করেন। যেহেতু স্কুল যথারীতি চালু হতে চলেছে তখন সাংহাই যাবার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর স্ত্রী ও ছেলেদের নিশ্চয় হোটেলে কষ্টভোগ করতে হচ্ছে। ওদের সম্বন্ধে তাঁর আর কিছু করার কি আছে? উনি বড়জোর ওঁদের সাবধানে নিরুদ্বেগে থাকতে বলতে পারেন। অতএব সার্কুলার লেখার পর পড়ে থাকা কালী দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে চিঠি লিখে ফেলেন একটা।

পরদিন চায়ের দোকানে সঠিক খবর পেলেন তিনি যে রেল চলাচল বাতিল হয়ে গেছে। খবরটা পেয়ে তিনি একেবারে চুপসে গেলেন। তাঁর মনে হল তাঁর স্ত্রী ও ছেলেরা যেন নাগালের বাইরে অনেক দূরে শূন্যে ভেসে গেছে। তাই বিষণ্ন হৃদয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে স্কুলে এসে দারোয়ানের কাছে গতকালের অভিযানের রিপোর্ট সংগ্রহ করেন। "সার্কুলার নিয়ে বেড়িয়ে প্রথমেই দেখলাম যে প্রায় বিশটা বাড়ী তালা চাবি দিয়ে শক্ত করে বন্ধ; প্রচুর ধাক্কাধাক্কির পরও কেউ বেড়িয়ে এল না। দরজার ফাঁক দিয়ে সার্কুলারটা গলিয়ে দিলাম। ৩০টা বাড়ীতে গিয়ে দেখি কেবল পরিচারকেরা আছে। বাড়ীর কর্তারা সন্তান সন্ততি সহ সাংহাই পালিয়েছে। কবে তারা স্কুলে ফিরবে কেউ বলতে পারলো না। বাকিরা সার্কুলারটা নিলেন বটে তবে তাঁরা বললেন যে কতদিন তাঁরা বাঁচবেন তার স্থিরতা যখন নেই তখন সাময়িক ভাবে পড়াশুনা বন্ধ রাখা ভালো।"

"তাই নাকি ?" শ্রীযুক্ত পান-এর কিন্তু এ ব্যাপারে মোটেই মন নেই। আরও বিষাদপূর্ণ চিন্তায় তিনি এখন চিন্তিত। একটা সিগারেট শেষ করার পর তিনি একটা সিদ্ধান্তে আসেন। তারপর সেখানে রেড ক্রশ সোসাইটির শাখা অফিসে গেলেন।

সেখানে তিনি বলেন যে তিনি সোসাইটির সদস্য হতে চান ও সেই বাবদ অর্থও দিয়েদেন। আরও বলেন যে তাঁর স্কুলে অনেক ফাঁকা জায়গা পড়ে রয়েছে এবং তার ইচ্ছা যে আপতকালীন সময়ে রেডক্রশ সোসাইটি যেন সেটা মেয়ে উদ্বাস্তুদের রাখার জায়গা হিসাবে ব্যবহার করে। এই রকম দাতব্যের প্রস্তাব সানন্দে গৃহীত হল। তাছাড়া শ্রীযুক্ত পান শহরের এক সুপরিচিত সম্মানীয় ব্যক্তি। শাখা অফিস স্কুলে টাঙ্গানোর জন্যে ওঁকে রেডক্রেশের পতাকা একটা দিলেন এবং একটা ব্যাজও দিলেন যাতে করে বোঝা যাবে তিনি ঐ সংস্থার একজন সদস্য।

শ্রীযুক্ত পান পতাকা, ব্যাজ এমনভাবে হাতে ধরে রাখেন যে মনে হয় এগুলো যেন তাঁর জীবন ও নিরাপত্তার গ্যারান্টিযুক্ত মন্ত্রঃপুত রক্ষাকবচ। তাঁর মন এক অনির্বচনীয় খুশীতে ভরে ওঠে। "এখন সব কিছুই সম্পূর্ণ নিরাপদ.........।" কিন্তু......। হাসি মুখে শাখা অফিসের লোকটার কাছে আবার তিনি ফিরে আসেন। বলেন, "আমায় বাড়তি একটা পতাকা, কয়েকটা ব্যাজ দিতে পারেন ?" তাঁর যুক্তি হচ্ছে যে স্কুলের পেছনেও একটা দরজা রয়েছে, আর ব্যাজ এত ছোট আকারের যে সহজেই সেটা হারিয়ে ফেলতে পারেন, তাই বাড়তি কিছু ব্যাজ থাকা ভালো।

রেডক্রশ সোসাইটির লোকটা পরিহাসছলে বলেন, "ওগুলো খাবার জিনিস নয়, আবার খেলনাও নয়, একাধিক ব্যাজ নিলেও আপনার সদস্য পদ একটাই। তাই বাড়তি নিয়ে কি করবেন ?" শেষ পর্যন্ত শ্রীযুক্ত পানকে খুসী করতে তিনি আরও কয়েকটি ব্যাজ দিলেন।

শরৎকালের মৃদু মন্দ বাতাসে পতাকা দুটো আকাশে পত্‌পত্‌ করে উড়তে থাকে তবে কোন পতাকাই স্কুলের পেছনের দরজার কাছ দিয়েও যায়নি। দ্বিতীয় পতাকাটি শ্রীযুক্ত পান-এর বাড়ীর দরজায় উড়ছে। দাতব্যের পবিত্র আলোর মত শ্রীযুক্ত পান-এর কোটের কলারের ভাঁজে একটা ব্যাজ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে, ফলে তাঁকে এক নোতুন রকমের সাহস জোগায়। বাকি ব্যাজগুলি কাগজের মোড়কে বেঁধে তাঁর কোটের পকেটে

সযত্নে রাখা আছে। তিনি মনে মনে বলেন, একটা ব্যাজ তাঁর স্ত্রী, একটা "আদা" ও আরেকটা ছোটটার জন্যে। যদিও ওঁরা সবাই এখনও তাঁর নাগালের বাইরে অনেক দূরে সাংহাইতে রয়েছে তাহলেও এ ব্যাজগুলি তাদের নিরাপত্তার এক ধরণের দ্বিগুণ নিশ্চয়তা, যেটা তাদেরকেও নোতুন সাহস দেবে।

(৩)

বিঝুয়াংগএ যুদ্ধ স্থরু হয়ে গেল

রংগলির খুব অল্প সংখ্যক বাড়ী তাদের দরজা সে সময় খুলে রাখত। দোকানগুলি স্বাভাবিকভাবে বন্ধ ছিল। প্রায়ই সেনারা রাস্তার উপর মার্চ করতে করতে যেত। তারা খুব শীঘ্রই যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যাবে। তাই তারা এমন ভাব দেখাত যেন তারা সব সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী। তাই তাদের দেখা কোন কিছুকেই তারা ধর্তব্যের মধ্যে আনছেই না। পায়ের তলায় যা কিছু পড়বে তা তারা যেন পদদলিত করে যেতে চায়। এই ভাবেই জোর করে সেনাবাহিনীতে লোক নেওয়া শুরু হল। তারা যাতে পালিয়ে না যেতে পারে তাদের বেঁধে তাদের রক্ষীদের সাথে এক লাইনে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই কারণে লোকে রাস্তায় বেরুতে ভয় পেত। বাড়ী থেকে বেরোনো যখন জরুরী হয়ে পড়ে তখনই কেবল তারা ছোট ছোট গলি দিয়ে যাতায়াত করে, এমন কি রেডক্রশের ব্যাজ পরে শ্রীযুক্ত পানও উদ্ধত ভংগীতে খোলাখুলি বেরুতে সাহস পান না। রংগলির রাস্তা ঘাট সব জনশূন্য শান্ত দেখাচ্ছে।

কয়েকদিন হল সাংহাই থেকে কোন কাগজ আসছে না। মাঝে মাঝে স্থানীয় সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে যুদ্ধের খবর সেঁটে দেওয়া হয়। যথারীতি সেখানে লেখা থাকে শত্রু সেনারা নির্মূল হয়ে গেছে। আর না হয় আমাদের বাহিনী বেশ কয়েক 'লি' এগিয়ে গেছে। রাস্তার কোণে নোতুন কোন বুলেটিন দেখা দিলে জনতা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সেটা পড়তে এখানে এসে হাজির হয়। বুলেটিন পড়ে তারা খুব একটা আশ্বস্ত বোধ করে না, কেন না সেখানে অনেক কথা অকথিত থেকে যায়। তাদের পড়া হয়ে গেলে ভ্রূ কুঞ্চিত করে আগত অমংগলের আশংকা নিয়ে চলে যায়।

কয়েক দিন ধরে শ্রীযুক্ত পান ভীষণ মনমরা হয়ে কাটালেন। তিনি উদ্বিগ্ন তাঁর অনুপস্থিত স্ত্রী পুত্রদের জন্য যাদের সম্বন্ধে তাঁর কাছে কোন

খবরই নেই। তাঁর মনে হল আর হয়ত তিনি ওদের সাথে মিলিত হতে পারবেন না। আবার তিনি চিন্তিত নিজের নিরাপত্তা প্রশ্নটাও রয়েছে। বিঝুয়াংগ থেকে এ জায়গার দুরত্ব মাত্র একশত 'লি'। যদিও রেডক্রশের ব্যজের সাহায্যে কিছু উদ্দেশ্য সফল হলেও কেউই তার প্রাণের গ্যারান্টি দেয় নি। তাই শেষ পর্য্যন্ত ব্যাজটা যদি কোন কাজেই না আসে ত ক্ষতি পূরণ চাইব কার কাছে? বুলেট, গোলাগুলি, ডাকাত আর আগুন-এর কোনটাই হাসির ব্যাপার নয়। অতএব আমার নিজের জীবনের নিরাপত্তার গ্যারান্টির জন্য অন্যকোন পদ্ধতি খুঁজে বার করতে হবে। অতএব যুদ্ধক্ষেত্র সম্বন্ধে এদিক সেদিক থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে থাকেন এবং যে সংবাদই তিনি পান তা যদি চালু গুজব থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হয় ত তার মধ্যে সামান্যতম সত্যতা আছে বলে তিনি নিশ্চিত ভাবে মেনে নেন। তারপর তিনি তাঁর মধ্যে নিজের স্বার্থের প্রতিক্রিয়ার হিসেব করেন। ভীত সন্ত্রস্ত কাউকে রাস্তা দিয়ে ছুটে যেতে দেখলেই তিনি ভয় পেয়ে যান। কারণ তিনি নিশ্চিত যে লোকটা ভীতিপ্রদ বিশ্বাসযোগ্য কোনো খবর পেয়েছে। যেহেতু লোকটি সম্পূর্ণ অপরিচিত তাই তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে কিছু জানা থেকে বিরত থাকেন।

আহতদের চিকিৎসার জন্য রেডক্রশ যুদ্ধক্ষেত্রে যে সব লোক পাঠায় সামরিক পরিবহন গাড়ীতে করে তাদের অনেকেই প্রায়ই ফিরে আসেন। স্বভাবতঃই রেডক্রশ সোসাইটি সংবাদ সরবরাহের শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম। যদিও শ্রীযুক্ত পান ঐ সংস্থার একজন সদস্য তাহলেও তিনি সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাদের অফিসে যেতেন না। কেননা সর্বসমক্ষে তিনি যে ভয় পেয়েছেন তা স্বীকার করতে লজ্জা পেতেন। আবার যেহেতু এই সংস্থাটি বিশ্বাসযোগ্য সংবাদের প্রতিষ্ঠায় তাই অন্যত্র যাওয়া বোকামি। তাই প্রত্যেকদিন তিনি উত্ত-এর বাড়ী যেতেন; উও ঐ অফিসে কাজ করতেন। উত্ত হয়ত বলেনা আজ কোন খবর নেই বা এপক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে ভালো লড়েছে বা হেন তেন; তারপর সব শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শ্রীযুক্ত পান বাড়ী ফিরে যেতেন।

একদিন প্রায় সন্ধ্যের সময় শ্রীযুক্ত পান উত্ত-এর বাড়ী গেলেন। কিন্তু সেদিন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থাকার পর উও বাড়ী ফিরলেন।

অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে উনি উওকে জিজ্ঞাসা করেন, "নতুন কোন খবর নেই তাই না? বুলেটিনের খবর অনুযায়ী আমরা ব্যপক আক্রমণ সুরু করে দিয়েছি তাই ত?"

চিন্তিত স্বরে গোঁফে তা দিতে দিতে উও বলেন, "খবর খারাপ।"

"কি বললেন ?" শ্রীযুক্ত পান-এর হৃৎপিণ্ডের শব্দ দ্রুত বেড়ে যায়। এবং তিনি অনুভব করেন যে ধরা পড়ে গেছেন।

যাতে কেউ শুনে না ফেলে তাই চাপাস্বরে উও বললেন, "বিশ্বস্ত খবর হচ্ছে এই যে বিঝুয়াংগ থেকে আট 'লি' দূরে ঝেনগান শহরটা অপর পক্ষের হাতে চলে গেছে।"

শ্রীযুক্ত পান মরীয়া হয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন। তারপর ২।১ সেকেণ্ড নিরব থেকে "আমি তবে যাই।" কথাটি বিড়বিড় করে বলতে বলতে চলে যান।

বিশেষ করে সেদিন বিকেলে রাস্তার সব আলো ক্ষীণ হযে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। শ্রীযুক্ত পানের মনে হয কে যেন তাঁকে পেছু থেকে তাড়াকরে ফিরছে। ভীত ও উদ্বিগ্ন চিত্তে তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টলতে টলতে বাড়ী ফিরলেন। পরিচারিকাকে বলেন, "দরজায় তালা লাগিযে শুযে পড। আজ রাতে আমি খুব ব্যস্ত থাকবো। রাতে বাড়ী ফিরছি না।" পোষাক রাখার আলমারী খুলে দেখলেন যে প্যাড দেওয়া পুরানো সিল্কের গাউনটা পডে রযেছে। তিনি এইটা স্যুটকেশে ভরে নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। স্যুটকেশটা তাঁরা গির্জেতে গচ্ছিত করে এসেছেন। এটা হারানোটা ঠিক হবে না। আবার ছেলেদের ডোরাকাটা সুতীর জামা পড়ে রযেছে। এগুলো এখনও পড়া যাবে। একটা পুরানো সিল্কের সার্টও পড়ে রয়েছে। এটা তাঁর স্ত্রী কেনোমতেই খোয়াতে চাইবেন না। এ সব বোঁচকা-বুঁচকি বেধে বাইরে বেড়িয়ে এলেন।

"এই রিক্সা! ফুক্‌সিং লেনের লাল বাড়ীতে যাবো। দশ সেণ্ট দেব।"

"দশ সেণ্ট মাত্র। ও দিন ভুলে যান!" রিক্সা চালক টেনে টেনে বলেন। "আজকাল কটা রিক্সা রাস্তায় বেড়োয়? আজকের দিনে কয়েকটা সেণ্ট রোজগার করতে কে বাবা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় বেড়োয়—যদি তা বেঁচে থাকার জন্য খুব জরুরী না হয়? ৩০ সেণ্ট লাগবে। যাবেন ত চলুন।"

"৩০ সেণ্টই দেবো চলো।" "শ্রীযুক্ত পান দ্রুত রিক্সায় চড়ে বসেন। তোমায় কিন্তু আমার কথা শুনতে হবে।"

"এই যে পান সাহেব, কোথায় চললেন?" হুয়াংগ নামে এক সহকর্মী তাঁকে দেখতে পেয়ে ডাকেন।"

"এই একটু এদিকে………।" শ্রীযুক্ত পান এত ভয় পেয়েছেন যে কে তাকে ডাকলো সে ব্যাপারে তার কোন ভাবনা নেই। তাছাড়া রিক্সা এত জোর ছুটছে যে ঐ লোকটি যে তার পেছু পেছু ধাওয়া করে জবাব দাবী করবে তার সুযোগ দিচ্ছে না। বাকি কথা সব তিনি গিলে ফেলেন।

লাল বাড়ীটায় লোকে লোকারণ্য। এখানে বেশীর ভাগ মানুষই এসেছেন গত দশ দিন আগে। লোকেরা সব চেঁচামেচি করছে। বাচ্চারা কাঁদছে। অনেক ঘরেই আলো জ্বলছে। তার ফলে একটা হৈ হুল্লোরের পরিবেশ বিরাজ করছে সেখানে। বাড়ীর কর্তা তাঁকে জানালো, "এখানে একটা ঘরও খালি পড়ে নেই। কিন্তু আপনি যেহেতু মালপত্র নিয়ে এসে পড়ছেন তাই আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারছি না। আবার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আরো কিছু লোক এসে পড়েছেন এবং তাদেরও ফেরাতে পারিনি; ওঁরা পাশের ঘরে রয়েছেন। ঐ ঘরটা সাধারণতঃ রান্না ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমি গিয়ে দেখছি ওরা আরও এক-জনকে নিতে পারেন কিনা ওই ঘরে।"

শ্রীযুক্ত পান একটু সান্তনা পেলেন। "হ্যাঁ, হ্যাঁ ওঁরা নিশ্চয় আরও একজনকে নিতে পারবেন। এ রকম একটা সময়ে সারারাত ঘুমই আসবে না; বসার একটা জায়গা পেলেই চমৎকার হবে।"

একহাতে তাঁর পুঁটলি নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকতে যাবার মুহূর্তে প্রথমে তাঁর মনে হল এই সব ভয় সন্ত্রাস অলীক মাত্র। তিনি চোখ বন্ধ করে পুনরায় খুলে দেখেন; আরে। কোন কিছুই ত বদলায়নি। তারপর উনি দেখলেন যে জানালার পাশে বসে যে লোকটি গোঁফে তা দিতে দিতে তাঁর বিপরীত দিকে বসে থাকা লোকটির সাথে কথা বলছেন তিনি শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক ছাড়া অন্য কেউ নন।

শ্রীযুক্ত পান দ্বিধাগ্রস্ত; তাঁর যে পা-টি দরজার চৌকাঠের উপর রয়েছে তা কাঁপছে। সেটা তিনি সড়িয়ে নিতে চাইলেও নিলেন না। তাঁকেও আধিকারিক দেখেছেন। "আরে পান সাহেব যে।" তাঁর বিহ্বলতা চাপা দিতে মুচকি হাসেন। "আসুন। ভেতরে বসুন।" বাড়ীটার কর্তা যখন দেখেন যে ওরা পরস্পরের পরিচিত তখন তিনি নিজের কাজে মনোযোগ দিতে ওখান থেকে সড়ে যান।

"তাহলে আধিকারিক সাহেব, আপনিও এখানে? এ ঘরে আরও একজনের জায়গা হবে কি?"

"কেন হবে না? আমরাও এখানে মাত্র তিনজন। আমাদের সংগে

একটা মাদুরও রয়েছে। ওটার উপর পালা করে আমরা একটু শুয়ে নিতে পারি। এখনও শীতটা জাঁকিয়ে পড়ে নি, তাই যা রক্ষে।”

ঘরটা খুব একটা বড় নয়। মেঝেতে মাদুরের উপর এক চশমাপরা মাঝ বয়সী ভদ্রলোক বসে আছেন। তাঁর চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ থাকলেও ঘুমানোর কোন বাসনাই তাঁর নেই। দেওয়ালে ঠেসানো রয়েছে স্টোভ, প্যান ও কয়েকটা পাত্র। জানালার ঠিক পাশে তিনটে চেয়ার রয়েছে। একটা চেয়ার দখল করেছেন আধিকারিক; আরেকটাতে বসে ওঁর খুড়তুতো ভাই—ছেলেটির বয়স বিশের ঘরে; তাঁর মাথার চুল চক্‌চক্ করছে। এক কোণে পড়ে রয়েছে গাছের ডাল দিয়ে বোনা ঝুড়ির তিনটে বোঝা। এগুলি বোধ হয় ঐ তিনজনের মালপত্র। ঘরকে ভরিয়ে তুলতে ঐ তিনটে বোঝাই যথেষ্ট। আর কোন ফাঁকা জায়গা ঘরটিতে নেই। বৈদ্যুতিক বাতির উপর পুরু ময়লা থাকায় ঘরের সব জিনিষকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।

শ্রীযুক্ত পান অন্যান্য তিনটে বোঝার পাশে নিজেরটাও রেখে দেন। তারপর অপরাধ স্বীকার করার ভংগীতে ঐ ফাঁকা চেয়ারটায় বসে পড়েন। তাঁকে তাঁর অন্যান্য সংগীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার পর তিনি জিজ্ঞেস করেন; “আপনার ঝেনগানের খবরটা জানেন ত?”

“হ্যাঁ ঝেনগান হাতছাড়া হবার পর বিঝুয়াংগ আরও বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে গেছে।”

“আমাদের সেনারা যে দক্ষিণের রাস্তা সম্বন্ধে অসতর্ক ছিলেন ঝেনগান হাতছাড়া হওয়া তার একটা লক্ষণ। ঝেনগান থেকে বিঝুযাংগ পর্য্যন্ত গোপনে আসার পথটা শত্রুপক্ষের কাছে সহজ হয়ে গেল। এই মুহূর্তে তারা হয়ত ঢুকেই পড়েছে। তা যদি সত্য হয় তাহলে এখানে যা ঘটবে তা ভাবাই যায় না।”

“তা যদি হয় ত চারদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।”

“কিন্তু এটাও নিশ্চয় তোমার জানা আছে যে এপক্ষের জেনারেল দিউ বোকা নন, উনি বিখ্যাত তাঁর রণকৌশলের জন্য। তিনি হয়ত এসব যে ঘটবেই তা আগে থেকে জেনে রেখে অন্য পক্ষকে তিনি কিভাবে প্যাঁচে ফেলবেন তার একটা পরিকল্পনা ছকে রেখেছেন। হয়ত ঠিক এই মুহূর্তে উনি ঘটনার মোড় ফিরিয়ে দেবেন এবং আক্রমণ করে শত্রুকে তার নিজের আস্তানায় ফিরিয়ে দেবেন।”

“তা যদি হয় ত বিরাট একটা কাজ করা হবে এবং সব ঝগড়ার

পরিসমাপ্তি ঘটবে। আমরা যারা শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করি তারা যথারীতি স্কুল চালু করতে পারবো।"

"শিক্ষা" শব্দটা উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে আধিকারিক তাঁর নিজ পদমর্যাদা সম্বন্ধে হঠাৎই সচেতন হয়ে পড়েন। তাঁর গোঁফে কয়েকটা মোচড় দিয়ে তিনি বলেন, "এই যুদ্ধ বিভিন্ন বয়সের ছাত্রদের প্রকৃত ক্ষতি করেছে।—অন্য লোকের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।" এই ছোট্ট ঘরের দম বন্ধ করা পরিবেশের কথা সাময়িক ভুলে গিয়ে তিনি অনুভব করেন যে এখনো যেন তিনি শিক্ষাদপ্তরের সম্মানীয় আসনে বসে আছেন।

কিছুটা অবজ্ঞা ভরে মাদুরে বসা মাঝবয়সী লোকটি বলে ফেলেন, "অপর পক্ষের কম্যাণ্ডার ঝিউ একটা ঘৃণিত লোক। অপর পক্ষ যদি তোমায় আক্রমণ করে তাহলে তার প্রতিরোধ করছ কেন, সে হেরে যেতে বাধ্য। বুদ্ধিমান হলে সে কোন প্রতিরোধই করত না। তাহলেই এসব যুদ্ধটুদ্ধ হতোই না।"

আধিকারিকের খুড়তুতো ভাই উত্তর দেন, "ও খুব বোকা। শেষ পর্য্যন্ত ও লড়ে যাবে। আর এই সময় আমাদের অন্ধকার ঘুপচি ঘরে পচে মরতে হবে।" কথাগুলি তিনি খুব হালকা চালেই বলেন।

শ্রীযুক্ত পান-এর মন সুদুর সাংহাই-এ তাঁর স্ত্রী ও ছেলেদের কাছে চলে যায়। ওরা সব ভালো আছে ত? কোন অসুবিধা হচ্ছে না ত? আচ্ছা এখন ওরা কি করছে?—ঘুমোচ্ছে? যেহেতু ওরা তাঁর কাছে নেই এবং নিজের কল্পনার সাহায্যে ওদের সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ছবি পাচ্ছেন তাই তাঁর মনে হয় এই যুদ্ধে অন্যান্যদের চেয়ে তাঁরই বেশী ক্ষতি হয়েছে। তাঁর চোখ দুটো বিপন্নভাবে নিবদ্ধ থাকে জানলা ছাড়িয়ে বাইরে উঠোনটায়। তারপরই কিন্তু তাঁর মন চলে আসে উও-এর কাছ থেকে তিনি যে ভয়াবহ সংবাদ শুনেছেন এবং তার জন্যে যে বিপদ দেখা দিতে পারে তাতে।

আধিকারিক জেনেশুনেই বলেন, "বলা শক্ত! যুদ্ধক্ষেত্রে সব সময় সাফল্য নির্ভর করে সঠিক সময়টি যথাযথ ব্যবহার। হাওয়া যে কোন সময়ে ঘুরে যেতে পারে এবং আমরা যেমন ভাবছি ঘটনা সেরকম নাও ঘটতে পারে। হয়ত এই মুহূর্তে আমরা ....।" মাঝবয়সী ভদ্র-লোকের দিকে চেয়ে একটু মুচকি হাসলেন।

মাদুরে বসা চশমা পরা মাঝবয়সী লোকটি, আধিকারিকের খুড়তুতো ভাই এবং শ্রীযুক্ত পান অর্থাৎ ঘরের সব প্রাণী তাঁর এ হাসির তাৎপর্য

ধরতে পারেন। এখন যেখানে তাঁরা রয়েছেন সেখানে যে তাঁরা বেশ নিরাপদেই রয়েছেন, যে ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়ে তাঁরাও পরিতৃপ্তির হাসি হাসেন।

ছোট্ট উঠোনটা আগাছায় ভরে উঠে মশা ও সব ধরণের পোকামাকড়ের একটা আরামদায়ক আশ্রয় স্থল হয়ে ওঠে। ঘরের আলো তাদের আকৃষ্ট করে ঘরে আনার ফলে ঐ চারজন ভীতু লোকের খুব কষ্টভোগ করতে হয়। ডাশ পোকা তাঁদের মুখ আক্রমণ করে। বিশেষ এক ধরণের মশার হঠাৎ হঠাৎ কামড়ে এক একজনকে লাফ দিতে বাধ্য করে। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়ে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে গোলাগুলির শব্দ বা ভীত সন্ত্রস্ত মানুষদের হৈ চৈ কান পেতে শোনেন। রাতে ঘুমানোর প্রশ্নই নেই। আধিকারিক যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঠিক তেমনি করে তাঁরা সবাই পালা করে করে সকলেই একটু গড়িয়ে নিলেন।

পরদিন সকালে দেখা গেল শ্রীযুক্ত পান-এর চোখ রক্তাভ এবং শীতে তিনি ঠক্ঠক্ করে কাঁপছেন। উনি বাইরের হালচাল ভালো করে বুঝতে একা একা বেরিয়ে পড়েন। আজকের সকালটা অন্যান্য দিনের সকালের মতই সাধারণ সকাল। কতকগুলি নেড়ী কুকুর ল্যাজ তুলে রাস্তার এদিক সেদিক শুঁকে বেড়াচ্ছে ; একটা লোক ঘুমন্ত চোখেই টলতে টলতে তাঁকে পেরিয়ে গেল। রাস্তার একটা কোণে বাঁক নিলেন শ্রীযুক্ত পান। এখনও পর্যন্ত অস্বাভাবিক কোন কিছু তার চোখে পড়লো না। আতঙ্কের কথা মনে পড়তেই তাঁর পক্ষে হাসি চেপে রাখা দায়! কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায়—এতে হাসির কি আছে? যাহোক্ অহেতুক ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে অতি সতর্কতা অবলম্বন করা ভালো।

যুদ্ধ শেষ হল তিন হপ্তা বাদে। জনসাধারণের সবাই পরস্পরকে ঘাড় নেড়ে এই বলে আশ্বস্ত করে যে, "এখন সব আবার ঠিক হয়ে যাবে ; যুদ্ধ না থাকলে আমরা সবাই নিরাপদে থাকবো।" কিন্তু শ্রীযুক্ত পান-এর মনে সুখ কোথায়? কারণ ট্রেন চলাচল সুরু না হলে তিনি তাঁর স্ত্রী পুত্রদের সাংহাই থেকে নিয়ে আসতে পারছেন না। দুটি মাত্র চিঠি তিনি পেয়েছেন, দুটো চিঠিই সংক্ষিপ্ত ; সে চিঠি দুটো তাঁকে খুশী করার পরিবর্তে উদ্বিগ্ন করে তোলে। আবার নিজে এত দুর্বল ভবিষ্যত বক্তা দেখে নিজের উপরই তিনি চটে যান। তাঁর পুরো পরিবারকে সাংহাইতে নিয়ে যাবার বাড়তি খরচটা তিনি সহজেই বাঁচাতে পারতেন। আবার

কয়েক সপ্তাহ ধরে অবিবাহিতের মত জীবন যাপন করার কোন প্রয়োজনই তাঁর ছিল না।

শীঘ্রই শিক্ষা দপ্তরে স্কুল চলু করার ব্যাপারটা বিবেচিত হতে পারে মনে করে তিনি খবরটা জানতে সেখানে গেলেন। অভ্যর্থনা অফিসে ঢুকেই তাঁর চোখে পড়লো যে কয়েকজন কেরানীর বড় বড় কাগজ কাটা আর কালি গুঁড়ো করার ব্যস্ততা। সব কিছু দেখে তাঁর মনে হল সবাই যেন কোন উৎসব পালন করতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

"এই-ত পান সাহেব এসে গেছেন। ওঁকেই-ত খুঁজছিলাম।" চীৎকার করে বলেন একজন। "ইয়াণের ধাঁচে উনি খুব ভালো লিখতে পারেন। একাজ আপনারই জন্যে।"

বাকিরা পোঁ ধরে। "বটেই ত! শ্রীযুক্ত পানই একমাত্র লোক যিনি এত বড় বড় লেখা ভালো লেখেন।"

"কি লিখবো? কি সব হৈ চৈ হচ্ছে তার তো কিছুই জানি না।"

"কম্যাণ্ডার দিউ এর জয়লাভ করে ফিরে আসায় তাকে স্বাগত জানাতে যে চারটে তোরণ হবে তার ফেস্টুনের লেখা আপনাকে লিখে দিতে হবে।"

"এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমি কি লিখব?"

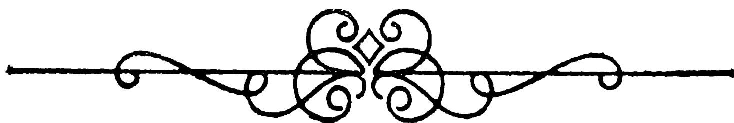
"আমরা এ ব্যাপারে একমত যে এ ব্যাপারে আপনিই একমাত্র উপযুক্ত লোক। বিনয় করার প্রয়োজন নেই।" শ্রীযুক্ত পানের হাতে লেখার বুরুশ গুঁজে দিতে দিতে সবাই চতুর্দিক থেকে এইসব কথা বলে।

শ্রীযুক্ত পান অভিভূত। লেখার বুরুশ নিয়ে কালিতে ডুবিয়ে কিছুক্ষণ নিরব থাকার পর তিনি একটা কাগজে লেখেন, "সমস্ত লোকের কীর্তি ছাপিয়ে তাঁর কীর্তি।" দ্বিতীয় কাগজে লেখেন, "তাঁর বিস্ময়কর শৌর্য দক্ষিণ প্রদেশে ঝড় বইয়ে দিয়েছে।" তৃতীয় কাগজটীতে লেখেন, "সাধুতা পরোপকারিতার মতই, বদান্যতা"। কিন্তু তার লেখনী "বদান্যতা" লেখার পরই তার মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে বেগার ধরার দল, বিস্ফোরণের গোলা, জ্বলন্ত গৃহ, ধর্ষিতা মহিলা ও উদ্বাস্তুদের পাণ্ডুর মুখ ও পচা মৃতদেহের ছবি।

ফেস্টুন লেখা দেখতে দেখতে একজন প্রশংসা করার জন্যে বলেন, "এই বর্ণনামূলক আখ্যায় জনসাধারণের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাচ্ছে।"

অপর একজন মন্তব্য করেন, "আমি অবাক হচ্ছি এই কথার মানানসই জবাব তিনি কি দেবেন?"

লেখক—ইয়ে সেংতাও



'বিচ্ছেদ'

এই সর্বপ্রথম আমি কান্না সুরু করলাম যখন একটা দৈত্যের হাত আমায় এক শ্বাসরোধকারী যন্ত্রনাদায়ক জাল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এলেন।

চোখ খুলে দেখি সেই দৈত্যটা তার এক হাত দিয়ে আমার গোড়ালি ধরে উল্টো ভাবে এমন করে আমায় ধরে রেখেছে যার ফলে মাথাটা আমার নিচের দিকে ঝুলছে আর আমার গোলাপি হাতের মুঠি দুটো মাথার দুদিকে দুলছে।

তারপর অপর এক দৈত্য তাঁর বিশাল হাত দিয়ে খুব আলতো ভাবে আমার পিঠ ধরে রেখেছেন। সেই দৈত্যটা ধবধবে সাদা বিছানায় শুয়ে থাকা এক মহিলার দিকে ফিরে মুচকি হেসে বলেন, "ধন্যবাদ! বেশ মোটাসোটা ছেলে হয়েছে।" এবং সাথে সাথে তিনি আমায় একটা ছোট বাক্সে শুইয়ে দিলেন; বাক্সের চারদিকে সাদা বর্ডার দেওয়া।

মাথা ঝাঁকিয়ে চেষ্টা করি বাক্সের বাইরেটা দেখে নিতে। সাদা আলখাল্লা ও টুপি পড়া এক দল নার্স ঘিরে রয়েছেন ঐ পাণ্ডুর ও ঘর্মাক্ত কলেবরের মহিলাটিকে-যাঁর শ্বাস ফেলা দেখে মনে হয় তিনি বুঝি এইমাত্র দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন; ফোলা ফোলা তাঁর চোখের পাতাদুটি আধবোঁজা। ধাতৃবিদ্যা বিশারদ ডাক্তারের কথা শুনে মহিলাটি চোখ বোজেন—শান্তিতে।

তিনি বিড়বিড় করে বললেন; "ধন্যবাদ ডাক্তার! আপনাকেও কম পরিশ্রম করতে হয় নি।"

আমি চীৎকার করে কেঁদে ফেলি: "না মা। আমাদেরই ধকল গেছে বেশী—এই মাত্র ত মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা কষে পৃথিবীতে এলাম।"

ধবধবে সাদা পোষাক পড়া নার্সেরা চাকাওয়ালা স্ট্রেচারে করে মাকে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল; আর আমায় বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো বারান্দায়;

—যার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক ভদ্রলোক—যাকে দেখে মনে হয় তিনিও বুঝি এইমাত্র দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছেন। ডাক্তার তাঁর দিকে ঈশারা করতেই তিনি চলে এলেন। লোকটা এমন ভাবে তাঁর হাত বাড়ালেন যেন তিনি আমায় ধরতে চান। কিন্তু ধীরে ধীরে তা তিনি সড়িয়ে নিলেন। তাঁর বিষন্ন মুখ আমার মুখের উপর নামিয়ে আনেন; চোখে তাঁর বিস্ময়ও চিন্তার আভাস।

ডাক্তার বলেন, "ছেলেটা ভারি সুন্দর না ?"

লোকটা আম্‌তা অম্‌তা করেন, "হয়ে, কিন্তু মাথাটা ওর ভীষণ লম্বা।'

হঠাৎই মাথায় ভীষণ ব্যথা মনে হওয়ায় আমি আবার কান্নায় ফেটে পড়ি।

"বাবা তোমার ধারণাই নেই কি যন্ত্রণাদায়কভাবে ঐ মাথাটা চাপা ছিল।"

"অবাক্। কি সুন্দর কণ্ঠস্বর ?" ডাক্তার হেসে আমায় নিকটবর্তী এক হাসিখুসি ভরা নার্সের হাতে দিয়ে দিলেন।

তারপর আমায় রাখা হলো খোলামেলা, আলো বাতাস যুক্ত একটা ঘরে। দেওয়াল জুড়ে]সেখানে সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়েছে বাক্স বিছানা-যেখানে সব বাচ্চারা শুয়ে আছে। কেউ কেউ শান্তভাবে ঘুমাচ্ছে, তাদের ছোট ছোট মুঠি মাথার দুদিকে পড়ে রয়েছে। অন্যান্যরা কাঁদছেঃ "তেষ্টা পেযেছে," "খিদে পেয়েছে," "গরম লাগছে", বা "আমি ভিজে গেছি।" যে নার্স আমায় বয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি যেন এসব শুনতেই পাচ্ছেন না তিনি ধীর পদক্ষেপে ঘরের অপর প্রান্তে বাথরুমে চলে যান এবং আমায় স্নানের গ্রামলার পাশে পাথরের টেবিলে শুইয়ে দিলেন—মাথাটা আমার জলের কলের দিকে মুখ করে রাখা হয়েছে। ঈষদোষ্ণ জলের তোড়ে আমার মাথা ও দেহ থেকে গোলাপি শ্লেষ্মা সব দূর হয়ে যায়।

আমি কেঁপে উঠলেও নিজেকে বেশ তাজা মনে হয়। মাথা ঘুরিয়ে গামলার অপর দিকের টেবিলটা দেখতে গিয়ে দেখলাম যে সেখানে আরেকটি বাচ্চা রয়েছে; মাথাটা তার গোল, বড় বড় চোখ, গায়ের রং কালো ও বলিষ্ঠ দেহ। তাকেও অপর একজন নার্স স্নান করাচ্ছেন। সে জেগে রয়েছে এবং জানালার বাইরে শান্তভাবে তাকিয়ে রয়েছে। এতক্ষণে আমায় জল থেকে তুলে নিয়ে লম্বা সাদা ঢিলে জামা পড়ানো হয়েছে; তাকেও তাই করা হল। স্নানের গামলার দুদিক থেকে

পরস্পরের দিকে আমরা উভয়েই তাকালাম আমার নার্স তাঁর সাথীর সাথে গল্প জুড়ে দেন !

"তোমার বাচ্চাটা সত্যিই বড় আর বলিষ্ঠ, কিন্তু আমারটা সুন্দর আর পাত্‌লা।"

এই কথা শুনে অপর বাচ্চা মাথা তুলে আমায় আড়চোখে দেখে নেয় —যেন সে করুণা করছে আমায়।

"কেমন আছ ?" আমি লজ্জিতভাবে শুরু করি।

"তুমি কেমন বন্ধু ?" সে নম্রভাবে জবাব দেয়।

এতক্ষণে নার্সেরা পাশাপাশি দুটো বাক্সে শুইয়ে দিলেন আমাদের দুজনকে এবং তাঁরা চলে যান।

আমি ঘনিষ্ঠ স্বরে তাকে বলি: "ওহো, আমার সর্বাংগে ব্যথা। পৃথিবীতে আসার শেষ চার ঘণ্টা আমার সত্যিই খুব কষ্টে কেটেছে। তোমার কি রকম ?"

"আমার প্রায় আধঘণ্টা ধরে দমবন্ধ করা অবস্থা—অবশ্য খুব একটা খারাপ নয়। আমার মাকেও খুব একটা কষ্ট পেতে হয় নি।" সে হাতটা মুঠো করে এবং হাসে।

আমি আর কথা বললাম না, কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলি এবং বড় একঘেঁয়ে লাগছে আমার। আমি যখন চতুর্দিক দেখতে থাকি, সে মিষ্টি করে বলে।

"ক্লান্ত তুমি, ঘুমোও। আমার মনে হয় আমারও তাই করা উচিত।"

আমি যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন বাক্স থেকে তুলে কাঁচের দরজা পর্য্যন্ত আমায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। সেখানে একদল ছেলেমেয়ে, দরজার কাঁচে তাদের নাক এবং হাতের চেটো চ্যাপ্টা করে সিঁটানো মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে ঠিক যে ভাবে তারা রাস্তার পাশের দোকানে সাজানো খেলনা দেখে। আমাকে লক্ষ্য করে অঙ্গ ভঙ্গী সহকারে তারা বলে যে আমার ভ্রূদুটো নাকি আমার পিসির মতো, আমার নাক কাকার নাকের মত, চোখ দুটো ঠিক আমার মামার মত এবং মুখটা আমার মাসির মত। যেন তারা আমাকে নিজেদের মধ্যে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করে নিতে চেষ্টা করছে।

চোখ বন্ধ করে আমি মাথাটা নাড়লাম। আমার কাঁধে প্রচণ্ড ব্যথা।

আমি জোরে আর্তনাদ করি: "আমি আমিই ! নিজের চেহারার সঙ্গেই কেবল আমার মিল আছে, অন্য কারুর সঙ্গে নয়। আমায় আবার ঘুমাতে দাও।"

'নার্স মুচকি হাসে, যখন আবার আমায় সেখান থেকে নিয়ে আসে দেখি বাচ্চার দলও, ঐ জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছে, ঠেলাঠেলি করছে এবং ঘুরে ফিরে আমায় আরেকবার দেখে নিতে চাইছে। বড় ঘরটায় আমাকে ফিরিয়ে আনা হল।'

ঠিক এই সময় আমার প্রতিবেশীর ঘুম ভাঙ্গে। "উঠে পড়েছ? কারা কারা তোমায় দেখতে এল?"

যখন আমায় বাক্সের মধ্যে রাখা হচ্ছিল তখন উত্তর দিলাম আমি, "জানি না। হয়ত কাকা কাকী, মামা মাসিরা—বেশ একদল বাচ্চাও এসেছিল মনে হল ওরা সকলেই বেশ পছন্দ করেছে আমায়।"

সে কয়েক মুহুর্ত নিরব থাকে। "চমৎকার! এখানে আমি দুদিন রয়েছি এবং এখনও পর্যন্ত এমন কি আমার বাবাকেও দেখিনি!"

আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যে কতক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছি। এখন অবশ্য আমার পিঠ আর ঘাড় ততটা ব্যথা করছে না। আমি কিন্তু ভিজে গেছি। অন্যান্য বাচ্চাদের অনুকরণ করে কাঁদি:

"ভিজে গেছি! ভিজে গেছি! সর্বাঙ্গ আমার ভিজে গেছে।"

যেমনটা ভেবেছিলাম ঠিক সেই মত দেখি একজন নার্স এসে আমায় বাক্স থেকে তুলে নিল। ভীষণ খুশী হলাম। যাহোক্ সে কিন্তু এইসব পাল্টানোর বদলে আমায় খানিকটা জল খাইয়ে দিলে।

বিকেলে তিন চারটে নার্স, কড়া মাড় দেওয়া সাদা আলখাল্লার খস্‌খস্ শব্দ তুলে, দ্রুত ঘরে ঢুকে আমাদের দুজনকে বাক্স থেকে তুলে নিয়ে পোষাক বদলে দিলে। আমার সঙ্গীটাও বেজায় খুশি।

"আমরা আমাদের মাকে দেখতে যাচ্ছি। বিদায়!"

আমার বন্ধুকে একটা বড় বিছানায় অন্য বাচ্চাদের সাথে একসঙ্গে শুইয়ে চাকা ঘুরিয়ে বাইরে নিয়ে গেল, আর আমায় একটি নার্স বয়ে নিয়ে চললো কাঁচের দরজা পেরিয়ে বারান্দার ডানদিকের প্রথম ঘরটায়। উঁচু বিছানায় মা আমার শুয়ে, তীব্র আগ্রহ সহকারে তিনি আমার আসাটা লক্ষ্য করছেন। আমায় তাঁর হাতে রাখা হতেই মা তাঁর বুকের বোতাম খুলে দেন। তাঁকে কম বয়সের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে। তাঁর ঘন কালো চুল কানের পেছনে খোঁপা করে বাঁধা এবং তাঁর ভ্রূদুটো প্রতিপদের চাঁদের মতই বাঁকা। বিছানার পাশে রাখা ক্ষীণ আলোয় তাঁকে স্থির মূর্ত্তির মত দেখাচ্ছে; তাঁর মুখটা প্রায় সম্পূর্ণ রক্ত শূন্য, চোখ তাঁর বড় বড় এবং কালো।

আমি দুধ খেতে সুর করতেই মা তাঁর চিবুক আমার চুলে স্পর্শ করে রাখেন, তিনি আমার ছোট ছোট আঙ্গুল নিয়ে খেলা করতে করতে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন, চোখে তাঁর সম্পূর্ণ বিস্ময় ও আনন্দ।

২০ মিনিট ধরে চেষ্টা কারেও আমি এক ফোঁটা মায়ের দুধ খেতে পেলাম না। আমি ক্ষুধার্ত এবং আমার জীভ এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর কোন স্বাদলাভ থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেল ; হাঁ করতেই মায়ের স্তন আমার মুখ থেকে খসে পড়ল। আর আমিও সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র কান্না লাগিয়ে দিলাম। ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে হাতে আমায় নিয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে ভোলাতে থাকেন তিনি,

"সোনা কাঁদে না বাবা।"

তিনি বেল বাজাতেই একজন নার্স ঘরের ভেতর এসে হাজির।

মা তাঁকে বলেন, "তোমায় বিরক্ত করছি ভাই। আমার বুকে এক-ফোঁটা দুধ নেই, তাই ও চেঁচাচ্ছে।"

"তার জন্যে অত ভাবছেন কেন? দুধ ঠিক সময় আসবে। আর ও এত বাচ্ছা যে এ ব্যাপারে ওর কোন বোধই নেই।" নার্স আমায় তাঁর হাত থেকে তুলে নিতেই মা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমায় ছেড়ে দেন।

সে আমায় বাক্স বিছানায় শুইয়ে দিল, বন্ধু দেখি তার খাটে অনেক আগে থেকেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে সে স্বপ্নের মধ্যেই এক পরিতৃপ্তির হাসি হাসছে। চারিদিক চোখ বুলিয়ে নিলাম। আমার ঘরের সঙ্গীর মধ্যে অনেকেই গভীর ঘুমে অচেতন ; খুব অল্প সংখ্যক সঙ্গী আধা জাগা অবস্থায় মুখে হুস হাস শব্দ করছে বা হঠাৎ হঠাৎ কেঁদে উঠছে। দুগ্ধাভাবে মৃতপ্রায় আমি চিন্তা করছি আমার মায়ের বুকে দুধ কখন আসবে? যদিও কেউই ব্যাপারটা উপলব্ধি করছে না তাহলেও আমার খুব খারাপ লাগছে। অন্য সকলকে ঘুমতে আর উত্তমরূপে খেতে দেখে আমার একই সঙ্গে হিংসে হল আবার লজ্জাও পেলাম ; আমি চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম এই আশায় যে সেই ডাক শুনে কেউ যদি আমায় দেখতে আসে। আটঘণ্টা ধরে কাঁদাকাটার পর একজন নার্স ঘরে এলেন। তিনি মিষ্টি করে ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকিয়ে আমার পিঠে আস্থাব্যঞ্জক দুটো চাপড় মেরে মায়ের প্রতি কৃত্রিম রাগের ভান করে বললেন :

"ইস সত্যিই ত! তোমার মা তোমায় পেটভরে খেতে দেয়ান ; কাঁদে না কাঁদে না। এখন একটু জল খাওত সোনা?" এই বলে ফিডিং

বোতলের চুষিটা আমার মুখে গুঁজে দিলেন আমিও সেটা ব্যগ্র সহকারে চুষতে চুষতে ক্রমশঃ ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন স্নানের সময় স্নান করার গামলায় বসে আমরা দুজনে বেশ খানিক গালগল্প করলাম। সে এমন ভাবে মাথা দোলাচ্ছে আর চোখটা আরামে অর্দ্ধেক বুজছে যা দেখে মনে হয় যেন সে তার স্নান করাটা ভীষণ ভাবে উপভোগ করছে। বন্ধু বলে, "কাল আমি পেটভরে দুধ খেয়েছি। আমার মায়ের মুখ কালো এবং গোল; আর খুব সুন্দর! আমি হচ্ছি তাঁর পঞ্চম সন্তান। মা নার্সকে বলেছেন হাঁসপাতালে আমিই তাঁর প্রথম প্রসব করা সন্তান। এক দাতব্য চিকিৎসালয় মাকে হাস-পাতালে পাঠিয়েছে।' বাবা আমার গরীব। উনি একজন কসাই—শূয়োর কাটেন। ঠিক এই মুহূর্তে কয়েক ফোঁটা বরিক অ্যাসিড চোখে চ'লে যায়। বিরক্ত হয়ে সে খানিক কেঁদে জোর করে চোখ খুলে আবার বলে চলে।

"এব্যাপারটা ঠিক শূয়োর কাটার মত হল না কি? একটা চকচকে ছুরি শূয়োরের পেটে ঢুকিয়ে দাও; বের করে আনার সময় দেখবে তা রক্ত মাখা। বড় হলে আমিও বাবার মত কষাই হবো কেবলই শূয়োর কাটব না, সেই সব লোকগুলোকেও কাটবো যারা শূয়োরের মত খায় কিন্তু কাজ করে না ……।"

নীরবে সব শুনলাম। বক্তব্যের এই অংশে আসতেই আমি চোখ বুজে চুপচাপ পড়ে থাকি।

"তুমি কেমন আছ? গতকাল ভাল করে খেয়েছত? তোমার মাকে দেখতে কেমন?" আমি পুনরায় উত্তেজিত হয়ে উঠি, "না।" গতকাল বিকেলে আমি কিছুই খাইনি—আমার মায়ের বুকে দুধ নেই। নার্স বলেছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর বুকে দুধ এসে যাবে। মাকে দেখতে সুন্দর আর পড়তে জানেন। তাঁর বিছানার পাশেই দেখলাম এক গাদা বই। আর ঘরটা তাঁর ফুলে ফুলে ভরা।

"তোমার বাবা?"

"তিনি ওখানে ছিলেন না। মা একাই ছিলেন, আর তিনি কারুর সাথেই কথা বলছিলেন না। আমার বাবা সম্বন্ধে কোন কিছুই আমার জানা নেই।"

আমার বন্ধুটি ঘোষণা করেন, "ওটা প্রথম শ্রেণীর ওয়ার্ড, তাই ঐ ঘরে একটি মাত্র বিছানা। আমার মায়ের ঘরে খালি গোলমাল।

ঘরে এক ডজন বা ঐ সংখ্যক বিছানা। এই ঘরের অনেক শিশুর মা ওদের সঙ্গেই থাকেন এবং তাঁরা সকলেই আমার মতো হৃষ্টপুষ্ট।"

পরদিন সকালে আমি আমার বাবাকে সর্বপ্রথম দেখলাম, যখন আমার মায়ের কাছে দুধ খাওয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দেখলাম বাবা মায়ের বালিশের উপর ঝুঁকে রয়েছেন। আবার বাবা মার মুখটা বেশ টান টান হয়ে রয়েছে এবং তাঁরা দুজনেই বেশ চিন্তিতভাবেই আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। বাবার মুখ রোগা এবং ভাসা ভাসা, চোখের পাতা টানা টানা, চোখ দুটো তাঁর বেশ স্নেহার্দ্র। ভ্রূদুটো তাঁর সব সময় কোঁচকান থাকায় তাঁকে বেশ ভাবুক ভাবুক বলে মনে হয় সব সময়।

আমার বাবা আমায় দেখে মন্তব্য করেন, "এখন আমি বেশ ভাল করে দেখলাম ও তোমারই মত সুন্দর দেখতে।"

"ওর চোখ দুটো কিন্তু ঠিক তোমার মত বড় বড়। মা হাসলেন, আলতোভাবে আমার মুখ স্পর্শ করলেন।"

বাবা দাঁড়িয়ে পড়ে বিছানার ধারে বসলেন। তিনি আমার মায়ের হাত নিয়ে তাতে দুটো ছোট ছোট চাপড় মারেন। "আর আমাদের একা একা থাকতে হবে না। ওর দেখাশোনার ব্যাপারে তোমায় আমি সাহায্য করবো। ওর সঙ্গে ক্লাসের পর খেলা করবো। আমরা ওকে ছুটীতে আমাদের সঙ্গে পাহাড়ে এবং সমুদ্রের ধারে নিয়ে যেতে পারি। ওর শরীর উপর নজর রাখতেই হবে আমাদের যাতে করে ও আমার মত রোগা না হয়ে যায়। যদিও শরীরে আমার কোন রোগ নেই তাহলেও আমার দেহে তেমন শক্তি নেই।"

আমার মা সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন। "নিশ্চয়ই; ওকে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে এবং আঁকতে শেখাতে হবে। আমি এ দুটোর কোনটাই পারি না। তাই আমার মনে হয় জীবনটা আমার সম্পূর্ণতা লাভ করলো না।"

"ওকে তুমি কি বানাতে চাও? সংগীতজ্ঞ না লেখক?"

"ও যা হতে চাইবে, তাই করবো। যাই হোক সে যখন ছেলে এবং চীনের যখন আশু প্রয়োজন এখন বিজ্ঞান, তাই মনে হয় ওর বিজ্ঞানী হওয়াই সবচেয়ে ভাল হবে।"

দুধ না পাওয়ার জন্য আমি ভীষণ চটে ছিলাম, তবে ওদের কৌতূহলোদ্দীপক কথপোকথন আমার কান্না বন্ধ রেখেছিল।

"ওর লেখাপড়ার জন্য আমাদের সঞ্চয় করতে হবে এবং তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুরু করা যায় ততই মঙ্গল।"

বাবাকে মা বললেন, "তোমায় একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম গতকাল আমার ভাই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল ওর ছ'বছর বয়স হলে ওকে একটা সাইকেল কিনে দেবে।"

"বাচ্চাটার দেখ সব কিছুই আছে, আমার বোন ওকে একটা দোলনা কিনে দিল না?" "এই সব ব্যাপারে বাবা আমার খুবই গর্বিত।"

আমার মাথায় চুমো খেয়ে মা বিড়বিড় করেন। "খোকা-তোমার কত লোক ভালো-বাসে তোমার ভাল লাগছে না? বড় হলে খুব ভালো ছেলে হতে হবে—হবে ত?"

আমি আমার বাক্সে ফিরে এলাম খোস মেজাজে— আমি যে ক্ষুধার্ত সে কথা মনেই পড়লো না। যাই হোক্ বন্ধু আমার বিশেষ চিন্তিত।

"বন্ধু আজ আমার বাবাকে দেখলাম। উনি একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং আমার ভবিষ্যৎ শিক্ষার ব্যাপারে মায়ের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। তিনি শপথ করেছেন আমায় শিক্ষিত করে তোলার জন্যে তাঁর যা করণীয় তা সব করবেন। মা বললেন যে তাঁর বুকে দুধ এল কি এল না তাতে কিছু যায় আসে না। কেন না যখন বাড়ী যাবো সেখানে গোরুর দুধ পাব এবং পরে ফলের রস ইত্যাদি ইত্যাদি আরও কত কি?" এক নিঃশ্বাসে এই কথাগুলো আমি উগড়ে গেলাম।

বন্ধু আমার দিকে চেয়ে হাসলো যার অর্থ অবজ্ঞাও হতে পারে আবার করুণাও হতে পারে। বললে, "তুমি কত ভাগ্যবান। একবার বাড়ী গেলে আমি কিন্তু আর মায়ের দুধ পাবো না কেননা মা অন্য এক বাড়ীতে স্তন্যদানকারী নার্স হিসেবে বাড়ী থেকে অনেক দূরে চলে যাবেন। বাবার কাছ থেকে এটা আমি শুনলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই এখান থেকে বাড়ী চলে যাব ঠাকুমার তত্ত্বাবধানে থাকবো—ওঁর বয়স এখন ৬০ এর উপরে। তিনি আমায় গলাভাত, সেদ্ধ চালের পুডিং ও সয়াবিন পাউডার খাওয়াবেন। যাই হোক, দুঃখ আমার সে জন্যে নয়।"

চুপ করে রইলাম, পরিতৃপ্তির ভাবটা আমার কোথায় যেন উবে গেল এবং লজ্জা পেলাম।

চোখে গর্ব ও সাহসের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে সে বলে চলে—"তুমি থাকবে ঝড় বৃষ্টির ছোঁয়া বাঁচিয়ে টবে সাজানো ফুল গাছের মত একটা নির্দিষ্ট তাপ-মাত্রার কাঁচ ঘরে। আর আমি পড়ে থাকবো রাস্তার ধারের এক চিলতে ঘাসের মত—মানুষ ও জানোয়ারেরা সমভাবেই পদদলিত করে যাবে আমায় —লড়াই করবো ঝড় ও বাগানের সাথে। হয়ত তুমি আমায় কাঁচ ঘরের

জানলা থেকে দেখবে এবং করুণা করবে। কিন্তু করুণার কোন প্রয়োজন নেই। আমার মাথার উপর থাকবে অসীম নীল আকাশ, তাজা বাতাস, ঝিঁ ঝিঁ পোকা ও প্রজাপতি আমার জন্যে গাইবে, নাচবে। আমারও অনেক সাহসী নম্র বন্ধু থাকবে। তাদেরকে যতই মারো পুড়িয়ে দাও নিঃশেষ করা যাবে না ; তারা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীকে সবুজে সবুজে ভরিয়ে দেবে।"

ভীষণ লজ্জায় কান্না পাচ্ছে আমার, আমতা আমতা করে বলি, "আমি-ত অত হাল্‌কা হতে চাইনি।"

আমার দুঃখের কারণ উপলব্ধি করে সে নরম হয়ে আশ্বাস দিয়ে বলে, "এটা সত্যি ? আমরা কেউই অন্য মানুষ থেকে পৃথক হতে চাই না, কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের ছিঁড়ে দুভাগ করে দিচ্ছে। ঠিক আছে দেখা যাক্ ! পরবর্তীকালে আমাদের কি ঘটে।"

'বাইরে পশমের গোলার মত বরফ পড়ে জমা হচ্ছে ছাদের সবুজ টালির উপর। মা আর আমি নববর্ষের প্রাক্কালে বাড়ী যাব, আমার বন্ধু ও তার মা ও আমাদের মতন নববর্ষের প্রাক্কালে বাড়ী যাচ্ছে, কেন না ওর মাকে নববর্ষের পূর্বেই কাজে যোগ দিতে হবে। শুধু আমাদের জন্য হাতে রয়েছে মাত্র ১২ ঘণ্টার মত সময়। তারপর আমরা ডুবে যাব অসীম জনসমুদ্রে। আচ্ছা আর কোনদিন কি আমরা পুনরায় একই ছাদের নীচে পাশাপাশি শোবার সময় পাবো ?'

সস্নেহ দৃষ্টিতে আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। তবে দৃঢ়সংকল্প বদ্ধ মুখ, দৃঢ় চাপা ঠোঁট, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন চোখ, এবং অল্প বাঁকা চিবুক বৈকালিক আলোয় ঝাপসা দেখাচ্ছে।

"সে শূয়োর জবাই করবে ; মানুষও জবাই করবে...।" আমি ভাবি। চাদরের নীচে আমার হাত দুটো একসাথে মুঠো করা ; আমার অযোগ্যতায় নিজেই আমি লজ্জিত।

বিকেলে মায়েদের কাছ থেকে ফিরে এসে আমরা পরস্পর সংবাদ বিনিময় করি। আমরা দুজনেই নববর্ষের প্রাক্কালে বাড়ী না গিয়ে নববর্ষের দিন বাড়ী যাব কেন না আমার বাবা মনে করেন যে নববর্ষের প্রাক্কালে সারাবাড়ী হৈ চৈ তে ও ব্যস্ততায় ভরা থাকবে, ফলে মা ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। আর এদিকে বন্ধুর বাবাকে মহাজনের কাছে থেকে লুকিয়ে থাকতে হবে, কেন না ওরা সাধারণতঃ বছরের শেষে দেনা পাওনার হিসেব নিকেশ করতে আসে। এবং তিনিও চাননা যে তাঁর স্ত্রীও এসময় বিরক্ত বোধ করেন। অতএব আমরা আর একদিন একসাথে থাকবো।

মধ্যরাত থেকে সর্বত্র একের পর এক আতসবাজী পোড়ানোর ধুম শুরু হয়ে গেল। ভীষণ তুষার-এর মাঝে হঠাৎ হঠাৎ কুকুরের ডাক শুনে মনে হল তারা যেন আমাদের বলছে, জীবনের ভালোবাসা ও ঘৃণার আরেকটি বছর শেষ হতে চলেছে। আগামীকাল থেকে পুনরায় নম্রতার মুখোশ পড়ার আগে তারা চায় আজ রাতে তাদের সব কাজের জন্য রাতটাকে শেষ বারের মত ভোগ করতে। অভিযোগ করতে, গালিগালাজ করতে, কাঁদতে। শহরের সমস্ত বড রাস্তায় এবং অলিতে, গলিতে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি স্পন্দিত হচ্ছে—আতসবাজীর শব্দে সেগুলো সব কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

কেঁপে উঠলাম। তাকিয়ে দেখি বন্ধুটি নীচের ঠোঁট নীরবে কামড়ে রযেছে। এইভাবে রাত কেটে গেল। ঠিক ভোর হবার আগে মনে হলো আমি যেন ওর দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ শুনলাম।

সকালে নববর্ষের খুশীতে ঝলমল করতে করতে দুটি নার্স আমাদের স্নান করাতে এলো। ওদের মধ্যে একজন নার্স একটা ছোট সুটকেশ থেকে বার করে আমায় একটি ফ্ল্যানেলের ইজের পডালো, কডাই শুটি রং-এর সোয়েটার ও টুপি পডালেন, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সেই রং-এর মোজা পড়লাম। দুহাতে আমায় তুলে ধরে আমায় ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে মন্তব্য করেন তিনি ঃ

"ইস। কি সুন্দর! তোমার মা কি করে তোমায় সাজাতে হয় তা ভালো করেই জানে।"

পোষাকটা যদিও আরামদায়ক ও নরম, তাহলেও ওটা পড়ে আমার গা কুটকুট করতে থাকে ও গরম লাগে এবং তাই আমার কাঁদতে ইচ্ছে করলো।

ইত্যবসরে আরেকজন নার্সের হাতে ছিল আমার বন্ধুটি। আমি ত অবাক্! তাকে চেনাই যাচ্ছেনা। তার কোমরের নীচে হাল্কা রংএর নীল কাপড় জডানো রযেছে। সে পড়ে রয়েছে সুতীর প্যাডের একটা জামা। তার আবার হাতাটা হাতের চেয়ে অনেক বড়। এবং সেই জামাটা এত শক্ত যে বড় একটা ঘুড়ির মত তা থেকে হাত দুটো বিশ্রীভাবে বেড়িয়ে আছে। এইমাত্র মাটিতে ফেলে দেওয়া আমাদের সাদা ঢিলে জামা দুটো দেখে-মনটা খুব বিমর্ষ হয়ে যায়, বিমর্ষ এই কারনে হই যে আমরা প্রকৃতই এখন থেকে স্থায়ীভাবে আলাদা হলাম—বস্তুগত ও মানসিক উভয় দিক থেকেই।

বন্ধুর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হতেই সে হাসে—যার দ্বিবিধ মানে হতে পারে—হয় সে গর্বিত আর নয়ত অল্প লজ্জিত। বলে ঃ

'সুন্দর জামা পড়ে তোমায় ভারী ভালো দেখাচ্ছে। আমি দেখ বর্ম পড়েছি কেন জান! জীবন রণাঙ্গণে যাতে করে জীবিকার জন্য লড়াই করতে পারি।'

ধোপার বাক্সে ব্যবহৃত ঢিলে জামা দুটো ফেলে দিযে আমাদের দুজনকে কোলে নিয়ে নার্স দু'জন দ্রুত বাইরে চলে যায়। কাচের দরজায পৌঁছতেই কিছুতেই আমি আর চীৎকার করে আমার কান্না ধরে রাখতে পারলাম না। আমার বন্ধু ও তার চোখের জল ধরে রাখতে পারলে না। আমরা পরস্পরের দিকে জোরে জোরে হাত নাড়তে থাকি।

"বিদায়। প্রিয় বন্ধু।"

যেহেতু ভিন্ন রাস্তায এখন থেকে চলেছি তাই বারান্দার দুটো প্রান্তে পৌঁছেই আমাদের কান্না মিলিযে গেল।

মা তৈরী ছিলেন; ঘরে তিনি বাবার পাশে দাঁড়িযে ছিলেন। বাবার হাতে একটা ছোট্ট স্যুটকেশ মা আমায তাঁর হাতে নিয়ে চোখের জল মুঝিযে মিষ্টি করে বললেন ঃ

"কাঁদে না সোনা। আমরা বাড়ী যাচ্ছি। মা তোমায় ভালোবাসে বাবাও বাসে।"

একটা চাকাওয়ালা চেয়ার চালিযে নিয়ে আসা হল। মা তাতে চেপে বসেন, তাঁর গায়ে কড়াই শুটি রং সবুজ কম্বল জড়ানো কোলে তিনি আমায় নিযেছেন। বাবা চেযারের পেছু পেছু চলেছেন। যে সব ডাক্তার, নার্স আমাদের বিদায় জানাতে এসেছিলেন তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা লিফটে করে নিচে নেমে এলাম।

আধখানা কাঁচের দরজার বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। গাড়ীর দরজা বাবা টেনে খুলতেই, এক গোছা বরফ গাড়ীর ভেতর ঢুকে গেল; মা সঙ্গে সঙ্গে কম্বল দিয়ে আমার মুখ ঢেকে দিলেন। আমরা চাকাওয়ালা চেয়ার ছেড়ে গাড়ীতে চড়ে বসতেই দরজাটা জোরে বন্ধ করে দেওযা হল আমার মুখ থেকে মা ঢাকা সড়িয়ে নিতেই দেখলাম গাড়ী ভরা ফুলের তোড়া আর মা বাবার প্রিয় মুখ।

হাসপাতালের গেটের সামনেটা রিক্সায় রিক্সায় রাস্তা বন্ধ। রাস্তা পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে করতে গাড়ীর জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখি যে আমার দশ দিনের সেই বন্ধু তার বাবার হাতে রয়েছে;

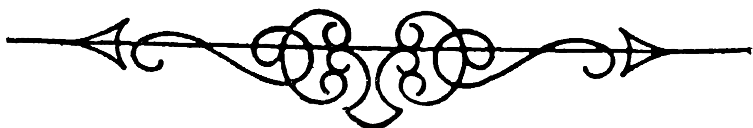
তার মা বাবার পেছনে। তাঁর হাতে নীল কাপড়ে জড়ানো ছোট পুঁটলি। তার বাবার মাথায় কালো ফেল্ট টুপি, সুতির প্যাডের কোট, তাঁর ছোট বাচ্চার মুখ তাঁর শক্ত কাঁধে টুপির চওড়া কিনারার তলায় রাখা রয়েছে। আমি আমার বন্ধুর মুখ দেখতে পেলাম—তার ভ্রুতে ও চিবুকে বরফের কুঁচি, চোখটা শক্ত করে বোজা। ঠোঁটে তার গর্বিত হাসি। হাসপাতাল ছাড়ার মুহূর্ত থেকেই সে তার সংগ্রাম সুরু করে দিয়েছে।

আমাদের গাড়ীটা উড়ন্ত বরফ কুঁচি ও নববর্ষের কাঁসর ঘণ্টা ধ্বনির মাঝ দিয়ে ছুটে চলেছে। নিবিড়ভাবে মা আমায় জড়িওে ধরে ফিসফিস করে বলেন।

"সোনা! দেখ! আমাদের পৃথিবীটা কত মসৃণ আর পরিষ্কার।"

আমি কেঁদে ফেললাম।

লেখক - বিং সিন্



লেকের ধারের সেই ছোট্ট ছেলেটা

বিখ্যাত ঐ লেকটায় বেড়াতে যাবার বাসনা বড় একটা আমার হতো না—যদিও আমি বাস করতাম লেকের তীরের ঐ ছোট্ট শহরটায়। বড় বড় নলখাগড়ায় ও বেনুবনে ঠাসা ঐ এলাকাকে আমার অস্বাভাবিক রকমের কোলাহলপূর্ণ, সংকীর্ণ জায়গা বলেই মনে হত। কোন কোন দিনে বিকেলবেলায় ওখানে বন্ধুবান্ধব নিয়ে যেতাম নৌকা বাইচ করতে—কিন্তু প্রত্যেকবারই এই জায়গাটাকে আমার পাগলা গারদ বলেই মনে হত। সমবেত ঝাঁক ও করতাল বাদন উঁচু পর্দায় বেহালাবাদন, অশোভন গান, পুরুষদের কর্কশ কণ্ঠস্বর, তেলচুকচুকে কালো চুল বাঁধা রং মাখা মেয়েদের প্রলুব্ধকর হাসি, নৌকার ছোট ছোট মণিহারী দোকানের ফেরিওয়ালাদের হাকডাক এ সব কিছুই যেন লেকের জলের শান্ত উপরিতলকে তীব্র জলোচ্ছাসের সাহায্যে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে।

তাই যখনই আমি ঐ লেকে যেতাম, তখন আমার চতুর্দিকের পরিবেশের প্রতি আমার চোখ, কানকে বন্ধ রেখে নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকতাম। কখনও কখনও যখন লেকের জলে সূর্য্যাস্তের রং প্রতিফলিত হতো, তখন আমি শীতল ঝিরঝিরে বাতাস উপভোগ করতে লেকের ধারের শান্ত এলাকায় পায়চারী করতাম। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পর সবুজ ঘাসের ভেতর ব্যাঙদের গান শুনতাম, লক্ষ করতাম ডালে ডালে কিচিরমিচির ডাক ডাক্তে ডাকতে পাখীদের লঘুভাবে ভেসে যাওয়া। প্রকৃতির এই গভীর সচেতনতায় মুগ্ধ হয়ে এবং অসংখ্য অতি ব্যাপক চিন্তায় উত্তেজিত হয়ে নিজে বেশী উৎসাহিত বোধ করতাম।

একদিন সূর্য্যাস্তের সময়, তার লাল ও বেগুনী ছটা বাঁধের উপর উইলো গাছের পান্না রংকে আলোকিত করে তুলেছে। মন্দিরের পাশের ঐ ছোট্ট পুকুরে এক মানুষের থেকেও উঁচু সব জলপদ্ম ফুটে রয়েছে। বিশুদ্ধ সাদা মণির মত পদ্মফুল যদিও দুপুরের পরে তার পাপড়িগুলো

ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিয়েছে তাহলেও এখনও দু একটা মৌমাছি তাদের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে সেখানে উড়ে বেড়াচ্ছেই শুধু তাই না—এ জায়গা ছেড়ে যেতে চাইছে না তারা। ঘন সবুজ রং-এর জলে লাল মেঘকে সোনালী দেখাচ্ছে, তাদের মাঝে দ্রুত ডুবে যাওয়া সূর্য্য কিরণ বিচিত্র রং-এর সমাবেশ ঘটাচ্ছে। স্তরে স্তরে কেবল রং—কোথাও পরস্পর বিজড়িত বিভিন্ন রং, আবার কোথাও পরস্পর বিরোধী বিচিত্র রং-এর সমাবেশ—চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্যে ঝলমল করছে।

আগের রাতে ছয় সাত ঘণ্টা ধরে প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেছে। আজ আকাশ একেবারে পরিষ্কার। লেকের পশ্চিম ধার ধরে আমি পায়চারী করতে করতে সদ্যস্নাত দৃশ্যাবলী উপভোগ করছিলাম। আমার চামড়ার জুতো ঢালু রাস্তার শ্যাওলা লাগা পাথরের উপর তার স্পষ্ট ছাপ রেখে চলেছে।

লেকের ঠিক মাঝখানে লোকগুলো সব ভীষণ জোরে চাঁচাচ্ছে, ঝগড়া করছে। আমি আস্তে আস্তে পাথুরে রাস্তার দূরের শেষ সীমা পর্য্যন্ত হেঁটে চলেছি। স্পন্দিত উইলো লতা ও জলজ উদ্ভিদ যারা কম্পিত নলখাগড়ার পাশে থেকে সবেমাত্র ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে তারাই এখন জলের ধারে পশ্চিমের ঝিরঝিরে বাতাসে নাচছে। সমগ্র লেকের এলাকার মধ্যে মনে হয় এই জায়গাটাই সর্বাপেক্ষা শীতল ও শান্তিপূর্ণ; মাঝে মধ্যে দু-একজন পথচারীর পায়ের শব্দ ছাড়া আর যে কেবল একটা শব্দ শোনা যায় তা হলো যে সব ছোট পাখীরা সন্ধ্যাবেলাকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানায় তাদের কিচির মিচির ডাক। তাদের সঙ্গে তাল রেখে সঙ্গত করে চলেছে জড়ানো ঘাসের ভেতর ব্যাঙের কর্কশ ডাক।

যদিও এ সব কিছুই অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকে আমায় বেশ প্রফুল্ল রেখেছে তাহলেও এই দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া দৃশ্যকে মনের মধ্যে ধরে রাখার কোন বাসনাই আমার ছিল না। কারণ এটা আমায় একটা কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়; তাহলো, "মুমূর্ষু সূর্য্যের গোধুলি"—এ লাইনটা আমায় বিমর্ষ করে তোলে।

গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে মাথা নীচু করে ক্লান্ত ভারী পদক্ষেপে হেঁটে চলেছি, লাল এবং বেগুনি রং-এর সূর্য্যাস্তের আলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে—সূর্য্যের আলো প্রতিফলিত জলে এখনই অর্ধেকেরও বেশী ডুবে গেছে। যদিও জানি যে দেরী হয়ে যাচ্ছে তাসত্ত্বেও বাড়ী ফেরার কোন ইচ্ছে আমার নেই। লেকের ধারে বিরাট সাদা পাথরে আমি বসে

পড়লাম। গ্রীষ্মকালের শেষের দিকের রাতে ঘুঘু রে পোকার গুণগুণ শব্দ শুনতে শুনতে আমি লেকের জলের উপরিতলে ভেসে বেড়ানো সোনালী কুয়াশায় শরৎকালের বাতাস সম্বন্ধে সচেতন হয়ে পড়ি। একা উইলো গাছের নিচে বসে লক্ষ্য করি দূরে গোধুলীর আলো মিলিয়ে যাচ্ছে এবং সন্ধ্যার প্রথম আলোর মৃদু শিখা দেখা যাচ্ছে। আবহাওয়াটা দিনের মত খুব গরম নয় ; সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে আসে স্নিগ্ধ শীতলতা। সে সময় হয়ত এই শীতলতায় আমি এক অব্যক্ত উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে পড়ি।

অলস সব চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎই উইল গাছের পেছনে মর্মর শব্দ কানে ভেসে আসে। ঐ গাঢ় অন্ধকারে এই শব্দটা এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে আসে যে আমি তাতে একটু বিচলিত বোধ করি। এক মুহূর্ত পরে মনে হল নলখাগড়ার খাঁড়ির ভেতর দিয়ে কে যেন আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছে। তড়াক করে দাঁড়িয়ে আমি উইলো গাছদের বৃত্তাকারে ঘুরে খাঁড়ির অপর প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে এলাম। এতক্ষণে অন্ধকারটা আরও গাঢ় হয়েছে। পরিষ্কার করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। নলখাগড়ার পাশে কর্দমাক্ত ঐ তীরে মনে হল যেন কোন কিছু বসে আছে।

চেঁচিয়ে ডাকি, "কে ওখানে ?"

ছায়ামূর্তি কোন জবাব দিল না।

সাধারণতঃ এ জায়গাটা ভীষণ নির্জন ; রাতের বেলায় তা আবার আরও ফাঁকা হয়ে যায়। এখন ক্রমশঃ অন্ধকার বেড়েই চলেছে। উইলো ও নলখাগড়ার মর্মর শব্দ ক্ষীণতর হয়ে পড়েছে। একটু ভীত হয়ে পড়ি। আবার চীৎকার করি, "কে ওখানে ?" ওখান থেকে চলে যেতে যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছি ঠিক সেই সময় কর্দমাক্ত তীরে ঐ ছায়া মূর্তি ভীষণ ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দেয়, "আমি ···ছোট্ট শুন,······আমি এখানে······মাছ ধরছি।"

শেষ কথাটা সে প্রায় গিলেই ফেললো এবং তার স্বরটা খানিক কেঁপে ওঠে। কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয় যেন ১০।১২ বছরের বাচ্চা ছেলের গলা। আমার ভীষণ সন্দেহ জাগে।

"অন্ধকারে মাছ ধরছ কেমন করে ?" আমি তাকে জিজ্ঞেস করি। "দেখতে পাচ্ছ কেমন করে ?"

আবারও ছোট ছায়ামূর্তি কোন উত্তর দিল না।

"কোথায় থাকো ?"

"হর্স হেড লেন-এ।"

ঐ ক্ষীন কণ্ঠস্বরে এমন কিছু একটা ছিল যা শুনে মনে হল এটা আমার

পরিচিত স্বর। আরেকটু তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করি, "তুমি কি বরাবরই এখানে বাস করতে ?"

ছোট্ট ছেলেটি দ্রুত উত্তর দেয়, "না, আগে থাকতাম পিরস্ট্রীটে—।"

হঠাৎই আমার মনে পড়লো "ওহোঃ! তুমি চেন-এর ছোট ছেলে না ?...তোমার বাবা কামার না ?"

ছেলেটা বাঁশের ছিপ্ টেনে তুলে ছুটে আমার কাছে চলে এলো, খালি পায়ে কর্দমাক্ত তীর ধরে। "হ্যাঁ! বাবা কামার—। কিন্তু তুমি কে ?"

আমি কাছে এসে ছেলেটার দিকে চেয়ে দেখলাম। আমি তাকে চিনতেই পারছি না। পাঁচ ছয় বছরের প্রিয় সেই ছোট্ট শুনের আজ কি হাল হয়েছে! তার মুখটা কালো—হয় কাদার জন্যে আর না হয় বাতির কালো ভূষোতে। পরনে তার বাড়ীতে বোনা নীল কোর্তা ওটা হাটুর অনেক উপর পর্য্যন্ত দীর্ঘ এবং তা থেকে কাদা আর ঘামের বোটকা গন্ধ বেড়ুচ্ছে। সে আমায় তার নাম ধরে ডাকতে দেখে অবাক্ হয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকে। আমি কে ও কিন্তু তা জানে না।

আমার মনে পড়ে গেল তার পাঁচ ছয় বছর বয়সের সময়ের সব কথা।— আমি সে সময বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করতে ভীষণ ভালো বাসতাম। যখনই ওদের বাড়ীর পাশ দিয়ে গেছি দেখেছি ও মায়ের কোলে বসে আছে বড় ছায়াঘন ঐ দেবদারু গাছের নীচে। সকল সময় সে আমায় ছোট্ট মোরগের বিষয় সেই গানটা গেয়ে শোনাতো।

তারপর ছ বছরের উপর সময় কেটে গেছে এবং প্রায়ই আমায় বাড়ীর বাইরে থাকতে হত। আমার পরিবারের লোকেরা বলেছিল যে ছোট্ট শুন-এরা এখান থেকে উঠে গেছে ; কোথায় ? তা কিন্তু সঠিক করে কেউ বলতে পারলো না। ওর বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে দরজায় অন্য লোকের নাম দেখে আমি দুঃখ পেয়েছি—যেন আমি একজন স্থায়ী বন্ধু হারিয়েছি।

তারপর আজ এই শীতল গোধূলিতে লেকের পারে পুনরায় সেই ছেলেটার দেখা পাওয়ায় আমার বিস্মীত হওয়া ছাড়া উপায় কি ? সবচেয়ে যেটা বিস্ময়ের তা হলো কেমন করে সেই গোলাপি গাল ও পরিষ্কার ফর্সা হাত বিশিষ্ট ছোট্ট শুন আক্ষরিক অর্থে রাস্তার ভিখারিতে রূপান্তরিত হল ? ওর বাবা ছিলেন একজন সম্মাণীয় কর্মকার। এবং তাঁর ছেলেকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রতিপালন করতে যথেষ্ট ক্ষমতা ধরেন।

শুনকে আমি নিয়ে এলাম. ঐ পাথরটার কাছে এবং সেখানে তাকে

আমার পাশে বসালাম। আমি তাকে জানালাম যখন সে খুবই বাচ্চা ছিল তখন কেমন করে তার সাথে প্রায়ই দেখা করতে যেতাম, তাকে হাসাতাম, ওর সাথে খেলা করতাম। ও ত কিংকর্তব্যবিমূঢ়! সব শুনে সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকে আমি প্রশ্ন করতে সুরু করে দিলাম।

"তোমার বাবা এখন কোথায় ?"

"বাড়ীতে।" তুমি হয়ত বলবে···ছোট্ট শুন জবাব দেয় দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে। তার অভিব্যক্তি দেখে আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে সে ভাবছে যে তার পুরানো বন্ধুটা কেমন যেন অদ্ভুত !

"তিনি কি এখনও কাজ করেন ?"

"কি বললে ? ·····উনি প্রতিদিনই বাইরে যান, কিন্তু তিনি কখনও বাড়ীতে টাকা নিয়ে ফেরেন না।·· কাজ করেন কি না ?···জানি না।"

"তোমার মা কি করেন ?"

"মারা গেছেন।" প্রত্যুত্তরে ছেলেটার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

ভীষণ আঘাত পেলাম। অবশ্য এটা ঘটতই। ছোট্ট শুনের মা ছিলেন একজন ছোটখাটো পল্‌কা মহিলা। লোকে বলতো যে তিনি তেরো বছরে সাতটি সন্তানের জন্ম দেন। তার মধ্যে কেবল লু শুনই বেঁচে আছে। কিন্তু আমি ভাবি নি যে তিনি এত তাড়াতাড়ি মারা যাবেন !

"বাড়ীতে এখন তোমার আর কে কে আছেন ?"

"আমার আরেকটি মা আছে···নোতুন মা—।"

"তাই নাকি ? তোমরা কি আগের চেয়ে আরও গরীব হয়ে গেছ ? তোমায় কে দেখছে···"

ছোট্ট শুন সবসময়ই ছিল বেশ চালাক চতুর ছেলে। আমার এই চাঁচাছোলা প্রশ্ন শুনে সে বহু দূরে অস্পষ্টতায় তাকিয়ে থাকে। তারপর মাথা নামায়। অনেকক্ষণ পরে চাপাস্বরে বলে ;

"কোন কোন দিন আমাদের খাওয়া জোটে না প্রায়ই বাবাকে বাড়ীর বাইরে যেতে হয়—।"

"কোথায় যান তিনি ?"

"জানি না—পরদিন সকালের প্রাতরাশের পরও তিনি বাড়ী আসেন না।···শুনেছি উনি নাকি কোন আফিং এর আড্ডায় কাজ করেন।··· কোথায় সেটা ? তা আমি কিন্তু জানি না।"

কথাগুলি সে চাপা স্বরে খুব ধীরে ধীরে বলে চলে। আমি ক্রমশঃ

ব্যাপারটা বুঝতে সুরু করেছি। এখন এটা চালিয়ে যেতে আমি বদ্ধপরিকর।

"কত?—মানে তোমার নেতুন মায়ের বয়স কত? তিনি তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন ত?"

"শুনেচ্চি ওঁর বয়স মাত্র ত্রিশ! পূর্বদিকের ফটকের ভেতরের কোন এক পরিবারে তাঁর জন্ম।" তাঁর মুখে একটা অস্বস্তির ভাব প্রকাশ পায়। ওকে আমি জিজ্ঞেস করি—

"তিনি কি তোমায় মারধোর করেন?"

"তিনি? না, না, ওঁর অত সময়ই নেই।" একথাটা সে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

অতবড় সংসার প্রতিপালনের দায়িত্ব যদি একা ঐ তরুণী যুবতীর উপর থাকে তাহলে নিশ্চিতভাবে ব্যয় করার মত বাড়তি সময় তাঁর থাকবেই না।

"কি ধরণের কাজ তিনি করেন?"

"কাজ? কাজ ত তিনি করেন না। কিন্তু তিনি প্রতিদিন অনেক রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকেন। সেই কারণেই আমি বাড়ী থাকতে পারি না—প্রতিদিন তাই আমায় চলে আসতে হয় এই নলখাগড়ার ঝাঁড়িতে; কেবল মাত্র এইখানেই·· ···· ঠিক এ জায়গায়।"

"কি বললে?"

ছোট্ট শুন বড়দের মত গুরুগম্ভীর ভাব মুখে আনতে শিখে গেছে। সে নাক কুঁচকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে, "আমাদের বাড়ীতে সর্বদাই অতিথি গিজগিজ করে। কোন কোম সময় এক রাতে দু তিনজন পর্য্যন্ত অতিথি থাকে, আবার কোন কোন সময় একটাও আসে না।"

কে যেন আমায় চাবুক মারলো। কিন্তু সে বলে চলে:

"·· ··আমার মা আয় করেন আমাদের খাদ্য কেনার জন্য—ওরা এলেই মা আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন। অনেক রাত পর্য্যন্ত আমায় বাড়ী ঢুকতে দেন না। আমার বাবা সব জানেন। তিনিও রাতে বাড়ী ফেরেন না·· · ·।"

এতক্ষণে আমি ভালোভাবেই জানলাম ছোট্ট শুণ কি ধরণের পরিবেশ থেকে আসছেন। এটা যেন অনেকটা উপন্যাসের মত; একটি অবিন্যস্ত চুল বিশিষ্ট, পাণ্ডুর, শীর্ণ, কোটরাগত চোখ বিশিষ্ট ছেলে রোজ রাতে বাধ্য হয়ে নলখাগড়ার জংগলে ঘুরে বেড়ায়—খালি পায়ে, তার ক্ষিধে

পেলে সে তার বন্ধুদের—পাখী আর ব্যাঙদের সঙ্গে কথা বলে—আর না হয় জংগলের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের গান শোনে।

ওর বাবা একটা আফিংএর আড্ডার বেহারা। তার মা—সৎমাকে শুধু বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে জঘন্য কাজ করতে হয়—তিনি তাঁর নিজের মাংস বিক্রি করেন।

নিস্তব্ধ নির্জন রাতে সে যখন বাড়ী ফেরে তখন তার সাথী থাকে কেবল মাত্র আকাশের তারাগুলি। পরদিন আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এটা অনেকটা উপন্যাসের মত। আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। পরিষ্কার প্রিয় ছেলে হিসেবে ওকে আমার এত ভালো করে মনে আছে! ওর এ হাল হোল কেমন করে?

ওকে জিজ্ঞেস করি, "অতিথিরা কি ধরণের লোক, যাঁরা তোমাদের বাড়ীতে রোজ রাতে আসেন?"

ছোট্ট শুন বলে, "রোজ রোজ তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয় না। আর যাও বা দেখা হয় তাও কয়েক মুহুর্তের জন্য। কেউ কেউ আসেন সামরিক পোষাক পরে তার একটা চোখ আড়াল করা থাকে মাথার সামরিক টুপিতে। কারুর গায়ে কেরোসিন তেলের গন্ধ। জামা থেকে ঝুলছে মোটা রূপোর চেন দেওয়া ঘড়ি। কেউ কেউ আবার শিক্ষিত লোকদের মত লম্বা গাউন পরে আসেন। সাধারণতঃ প্রতি রাতে আমাদের তিন চার জন অতিথি আসেন, কিন্তু অন্যসময় আমাদের দরজায় এমন কি একটাও অতিথি আসতো না।"

"কেন এমন হয়?"

আমি বেশ ভাল ভাবে বুঝতে পারছি যে অনবরত প্রশ্ন করে করে ওর প্রতি আমি নির্দয় ব্যবহার করছি; কিন্তু আমার যে প্রশ্ন বন্ধ রাখার জো নেই।

ছোট্ট শুন হাসে। "জানো না? ইস হেড লেনের সব বাড়ীই তো প্রতি রাতে খোলা থাকে অতিথিদের জন্য", সে এই মনে করে আবার হাসে যে একজন শিক্ষিত লোক হয়ে আমি কত কম জানি।

ওকে জিজ্ঞেস করার মত আর আমার কিছু নেই। তার বেদনাদায়ক ইতিহাস আরও জানতে ঐ নিষ্পাপ শিশুকে আরও কিছু প্রশ্ন করতে এবার কিন্তু আমার রুচিতে বাঁধে। হাবেভাবে মনে হয় তার মনে অন্য কিছু একটা যেন রয়েছে। সে আনমনে গোধুলির মধ্য দিয়ে আকাশের মিটমিট করে জ্বলা তারা দেখতে থাকে।

৬

ছেলেটার মা যদি বেঁচে থাকতেন তা হলে ব্যাপারটা নিশ্চয় অন্য রকম হত। আমি মনে মনে ভাবি। যে জীবন হতভাগিনী—ছেলেটার বর্তমান মা—মহিলা মেনে নিয়েছেন তাকে কোন ভাবেই নরক থেকে ভালো বলা চলে না।

আহাঃ! একেই বলে পরিবার! পারিবারিক সংগঠন ও তার উপর যুগের ছাপ—বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাপার। আমি এখানে এসেছিলাম বৃষ্টির পর অলসভাবে লেকের ধারে পায়চারী করতে। কিন্তু তার পরিবর্তে বহু অসুবিধেজনক সমস্যায় হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

চিন্তা করুন ত একবার! ক্ষুধায় ও অস্বস্তির তাড়নায় একটা বাচ্চা ছেলেকে রোজ বিকেলে আসতে হয় নলখাগড়ার জংগলে এবং সেখানে থাকতে হয় মাঝরাত পর্য্যন্ত। তার মা-কে সহ্য করতে হয় সবচেয়ে অবমাননাকর জঘন্যতম জীবন—যেহেতু এত বড় সংসার প্রতিপালনের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত। এরকম জীবন হচ্ছে অমানবিক! আমাদের বর্তমান সমাজের গরীব মানুষেরা কেবলমাত্র এই রকম হতাশাব্যঞ্জক এবং আত্মহননকারী পথই গ্রহণ করতে পারে।

আমার হৃদয়ভরে গেল দ্বিধায়। ভীষণ উত্তেজনা বোধ করি। চুপচাপ বসে থাকতে পারছিনা এবং এই লেকের ধারের প্রাকৃতিক দৃশ্য যা এতদিন ধরে আমায় সজীব ও আরামপ্রদ অনুভূতি দিয়ে এসেছে তাকে গাঢ় অন্ধকার যেন গিলে ফেলেছে।

এখনও যে ছোট্ট শুন বাড়ী ফিরে যেতে সাহস পাচ্ছেনা এটা জেনে তাকে একা একা ঐ লেকের ধারে তারার আলো দেখার জন্যে ছেড়ে যেতে মন আমার রাজী হলো না। উইলো গাছের নীচে আমি তার পাশে বসলাম। যদিও আমি ওকে আরও প্রশ্ন করতে চাইছিলাম তবে আমার মনে হলো সেটা হবে আরও নিষ্ঠুর। নীরবে চিন্তা করে দেখলাম যে শিশু গড়ে ওঠে তার পরিবেশের সাহায্যে।...এবং আমি ছোট্ট শুন ও তার মত অন্য শিশুদের কথা চিন্তা করে শিউরে উঠি।

হঠাৎই লেকের বিপরীত দিক হতে এক উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। "ছোট্ট শুন......কোথায় তুমি?" আমি একলাফে দাঁড়িয়ে পড়ি। ছেলেটা এত ভয় পেয়েছে যে সে জলে বাঁশের ছিপটা ফেলে দিয়ে একটা ছোট রাস্তা ধরে দ্রুত চলতে সুরু করে দেয়। আমি সম্পূর্ণভাবে হতবাক্। কি ঘটেছে তা আমি কিছুই জানি না। ঠিক সেই সময় এক মাঝবয়সী

লোক নলখাগড়ার জংগল থেকে বেরিয়ে এসে ছোট্ট শুনের হাত ধরে তাকে নিয়ে ছুটতে থাকে ;

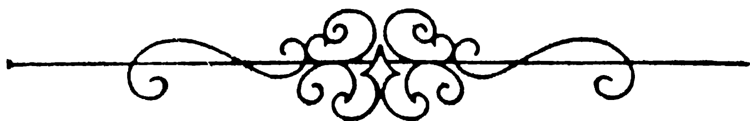
সে লোকটাকে বলতে শুনলাম :

"আজ রাতে পুলিশ তোমার বাবাকে গ্রেপ্তার করেছে···ওরা আফিং এর আড্ডায় হানা দেয়···আমরা তোমার মাকে বলতে পারিনি। উনি এখন জমিদার উও এর সঙ্গে আছেন। কার এত বড় সাহস যে তাঁকে এখন বিরক্ত করে ?···খোকা, তুমি হচ্ছ এখন একমাত্র লোক যাকে আমরা প্রতিবেশিরা সংবাদটা দিতে পারি।"

তাদের ছায়াগুলি সব ক্রমশঃ রাতে মিলিয়ে গেল এবং সাথে সাথে মানুষের কণ্ঠস্বরও ধীরে ধীরে বিলিন হয়ে গেল।

ক্লান্ত পদক্ষেপে বাড়ীর দিকে চললাম। এমন লোক কমই রয়েছেন যাঁরা রাতের গভীর কুয়াশার মধ্যেও রাস্তায় বেড়াতে বেরোয়। সেদিন সন্ধ্যায় পরিবেশের অস্বাভাবিক ভারী আবহাওয়ার চাপ যেন আমার বুকে ভীষণ বোঝা হয়ে দেখা দিল। যে তারাগুলি আমায় পথ দেখাত তারা আজ যেন ভীষণ নিস্তেজ ; রোজকার মত অত উজ্জ্বল নয়।

লেখক—ওয়াঙ তঙজাও



বড়দি শ্রীমতী লিউ

বেজিংএ সে বছর অস্বাভাবিক ধরণের গরম পড়েছিল। যদিও রাস্তার সব আলো অনেক আগেই জ্বলে গেছে, তাহলেও যে লোকটা গলির ঐ কোণে দাঁড়িয়ে দুটো ছোট ছোট গামলা বাজিয়ে তার সঙ্গে তালরেখে তার বন্য আপেলের তৈরী সুরা হেঁকে হেঁকে বিক্রী করে চলেছে এখনও; তাঁর ঘোষণাটা অনেকটা সেই ব্যালে নাচিয়েদের সঙ্গে গল্প বলে চলার মতই। পিঠে বাজে কাগজের ঝুড়ি নিয়ে এক মহিলা তার সামনে দিয়ে পেরিয়ে গেল; তার মুখটা একটা ভাঙ্গা খড়ের টুপির আড়ালে চাপা পড়ে গেলেও ঐ সুরা বিক্রেতাকে প্রীতি সম্ভাষণ জানানোর সময় তাঁর সুন্দর মসৃণ দাঁতের পংক্তি নজরে পড়ে। সে বিষন্ন মনে বেশ গুরু-গম্ভীর কদমে একটা পদক্ষেপের পরে আরেকটি পদক্ষেপ ফেলে ঠিক উটের মত হেঁটে যায় তার বাড়ীর ফটক পর্যন্ত।

তার পেছনে একটুকরো ফাঁকা চত্বর; সেই চত্বরটা ঠিক ফাঁকা চতুষ্কোণের আকারে ছোট ছোট একতলা কতগুলি বাড়ী দিয়ে ঘেরা; চত্বরের একদিকে একটা ধ্বসে পড়া ঘরে থাকে মেয়েটি। সেই চত্বটার বেশীর ভাগ এলাকায় পাথর কুঁচি ছড়ান থাকলেও মেয়েটির দরজার ঠিক সামনে শশাগাছ আর কিছু লম্বা সস্যের দণ্ড রয়েছে। তার ঘরের জানালার ঠিক নিচে সাদা সুগন্ধি ফুল ফুটেছে। শশাগাছের নিচে কয়েকটা পচা কাঠ পড়ে রয়েছে—সেগুলো নিশ্চয়ই বসার আসন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মেয়েটা দরজার কাছে পৌঁছতেই ভেতর থেকে একটি লোক বেড়িয়ে এসে তার পিঠ থেকে বোঝা নামাতে সাহায্য করে।

"বৌ, আজ কিন্তু তোমার দেরী হয়ে গেছে।"

অবাক হয়ে মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে থাকে। "তার মানে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, যে বৌ খুজে বেড়াচ্ছ? আমায় ঐ নামে কখনও ডাকবে না তা বলে দিলাম কিন্তু।" ঘরে ঢুকে মেয়েটা মাথার ভাঙ্গা

খড়ের টুপিটা দরজার পেছনে টাঙ্গিয়ে রাখে। তারপর ঐ বিশাল মাটির জালা থেকে চেড়া বাঁশের অংশের সাহায্যে ঘন ঘন জল তুলে কয়েকবার এত জলপান করে যে দম নেবার ফুরসৎ পর্যন্ত তার থাকে না। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে গাছের কাছে যায় সেখানে বড় ঝুড়িটা একপাশে সরিয়ে রেখে ঐ পচা কাঠের উপর গিয়ে বসে।

লোকটির নাম লিউ জিয়ানগাও। সে মোটামুটি মেয়েটার সমবয়সী বয়স প্রায় তিরিশ। মেয়েটার নামের পদবীও লিউ। কিন্তু জিয়ানগাও ছাড়া অন্য কেউ জানেনা যে ওর পিতৃদত্ত নাম চুন তাও—বা বসন্তের পিচফল। প্রতিবেশীরা তাকে বাজে কাগজ সংগ্রাহিকা বড়দি লিউ বলে ডেকে থাকে। এই নামটা তার পেশার সুবাদে হয়েছে—বড় রাস্তায় ও সরু গলির কোণে আবর্জনার স্তূপ ঘেঁটে ঘেঁটে বাজে কাগজ খুঁজে বার করে এবং দেশলাই এর বিনিময়ে পুরানো লেখা কাগজ খরিদ করে তাকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত চড়চড়ে রোদের নিচে বা বরফের মত ঠাণ্ডা বাতাসে তার জন্য নির্দিষ্ট করা ভাগের ধূলো গলাধ-করণ করে তাকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হয়। কি শীতকাল, কি গ্রীষ্মকাল, প্রতিদিন বাড়ী ফিরে সে ভাল করে হাত পা মুখ ধুয়ে ফেলে ও স্নান করে। প্রত্যেক দিন তার জন্য এক বালতি জল নিয়ে তার অপেক্ষায় থাকতে একদিনের তরেও জিয়ানগাও ভুল করেনি।

সে গাঁয়ের প্রাথমিক স্কুল থেকে পাশ করা লোক। বছর চারেক আগে একদল সেনা লুঠ করতে করতে তার গাঁয়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। ফলে তাদের পুরো পরিবারটাকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পালাতে বাধ্য করে। পথে অন্য আর এক উদ্বাস্তু চুন্‌তাও এর সঙ্গে পরিচয় হয়, তারা একত্রে কয়েক শ মাইল চলার পর পুনরায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

পরে সে একদল লোকের সঙ্গে বেজিং-এ আসে। সেখানে বিদেশী পরিবারের ঘরে বাচ্চাদের দেখাশুনার কাজ সে পায়,—কেননা সেই পরিবারের গৃহিনী এক অনভিজ্ঞা গাঁয়ের মেয়ের সন্ধান করছিলেন। যেহেতু মেয়েটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও দেখতেও ভালো তাই গৃহিনী তাকে খুব পছন্দ করতেন। কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা ভালো চাকর হতে পারেনা ও গালাগাল খেতেও তারা বেশ অভ্যস্ত নয়, অতএব দুমাস না পেরুতেই চুনতাও সেখান থেকে পালালো। তার প্রেমিকের অবস্থা তখন বেশ ভালো যাচ্ছিল না, তাই সে বাজে কাগজ কুড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ব্যবসায় থেকে তার জীবন ধারণের জন্য যথেষ্টই আয় হত।

চুনতাও-এর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর জিয়ানগাও-এর গল্প অতি সাধারণ। সে প্রথম তার এক আত্মীয়ের খোঁজে ঝুয়োঝাও গেল। কিন্তু সে লোকটা চলে গেছে। আবার তার পরিবারের লোকেরা যখন জানলো যে এক কপর্দকশূন্য লোক এসেছে তারা তখন তার প্রতি খুব একটা আন্তরিকতা প্রদর্শন করলো না। সে তখন বেজিং-এ চলে আসে। সেখানে একদল লোকে বৃদ্ধ উও-এর সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেয়। উও গলির কোণে দাঁড়িয়ে বন্য আপেলের সুরা বিক্রয় করে। বৃদ্ধ উও তাকে ঐ ভগ্নস্বাস্থ্য বিশিষ্ট ঘরটা—বর্তমানে যে ঘরে সে রয়েছে—ধারে ভাড়া দিল এই সর্তে যে যদি কেউ ঐ ঘর ভাড়া নিতে চায় ত তাকে ঘর ছেড়ে দিতে হবে। জিয়ানগাও-এর কোন কাজ ছিল না। তাই সে বৃদ্ধ উওকে সুরা বিক্রয়ে সাহায্য করতো এবং তার হয়ে হিসেব রাখতো। বৃদ্ধ উওকে সে কোন ভাড় দিত না; কাজের বদলে সেও কোন অর্থ জিয়ানগাওকে দিত না। তার বদলে তাকে দুবেলা খেতে দিত। বাজে কাগজ সংগ্রাহিকা হিসেবে চুনতাও-এর আয় খুব খারাপ ছিল না। কিন্তু যাদের সাথে সে থাকতো তারা তাকে পণ্যদ্রব্য রাখতে দিত না। তাই সে ঘরের সন্ধানে উত্তর শহরের ফটকের ধার বরাবর বেরিয়ে পড়ল এবং প্রথম বাড়ীর দরজায় সে করাঘাত করতেই যে লোকটা বেরিয়ে এলো সে হচ্ছে জিয়ানগাও। অনেক আনুষ্ঠানিক পর্ব নিজে বাঁচিয়ে সে শেষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধ উও-এর কাজ থেকে ভাড়া নেয় এবং জিয়ানগাওকে তার সাহায্যকারী হিসাবে রেখে দেয়।

এসব কিন্তু তিন বছর পূর্বেকার ঘটনা। যেহেতু সে অল্প-বিস্তর পড়তে জানতো তাই সে চুনতাও-এর সংগৃহীত বাজে কাগজের স্তূপ থেকে ঘেঁটে ঘেঁটে তুলনামূলকভাবে মূল্যবান জিনিষ—যেমন খোদাই করা কোন ছবি বা বিখ্যাত কোন লেখকের লেখা চিঠি পুঁথি—পৃথক করে রাখতে পারতো। দুজনের সহযোগীতায় তাদের ব্যবসায় বেশ জমে ওঠে। জিয়ানগাও তাকে মাঝে মাঝে পড়তে শিখাতে চেষ্টা করে, কিন্তু এ ব্যাপারে সে খুব একটা সাফল্যলাভ করেনি। সে নিজে ভালো করে পড়তে জানে না। তাই নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে লোকেদের বোঝাতে তার বেশ অসুবিধে হত।

তাদের এই একত্রিত জীবন—বিবাহসংক্রান্ত পরম সুখের প্রতীক হিসাবে খাসী করা পাতিহাসের মত আদর্শ স্থানীয় না হলেও একজোড়া চড়ুই পাখির মিলনের মতই আনন্দের।

এখন বর্তমানে ফিরে আসা যাক্। চুনতাও ঘরে প্রবেশ করতেই এক বালতি জল নিয়ে সেও তার পেছু পেছু ঘরে এসে হাজির।

বেশ খুশী মনে সে বলে, "বৌ হাত মুখ ধুয়ে নাও। আমি অনাহারে আছি। আজ রাতে ভালোমন্দ কিছু খাওয়া যাক্—যেমন ধরো চাটুতে ভাজা পেঁয়াজের পিঠে? কি ঠিক আছে? যদি রাজি থাকো বলো বাইরে গিয়ে জিনিষ পত্র সব কিনে আনি?"

"বৌ, বৌ" ঐ নামে আমায় ডাকা বন্ধ করতে পারো না?" অধৈর্যভরে দাবী করে চুনতাও।

"তুমি যদি ঐ ডাকে সাড়া দাও—মাত্র একবার তাহলে পুরানো জিনিষের দোকানে কালই গিয়ে তোমার জন্যে একটা ভালো দেখে খড়ের টুপি কিনে আনি। তুমি বলোনি যে একটা টুপির বিশেষ প্রয়োজন?" জিয়ানগাও বলে।

"ঐ শব্দটা শুনতে আমার মোটেই ভালো লাগে না।"

চুনতাও বিরক্ত বোধ করছে দেখে সে প্রসংগান্তরে যায়। 'আচ্ছা বলো ত আজ রাতে কি খেতে চাও?'

'যা তোমার পছন্দ তাই কিনে আনো—তোমায় তা আমি রেঁধে দেবো।'

কিছুক্ষণ বাদে জিয়ানগাও ফিরে এলো কিছু পেঁয়াজ ও এক বাটি তিলের শস্ নিয়ে। তারপর তা টেবিলে রেখে দেয়। চুনতাও এর ধোয়া-ধুয়ির কাজ শেষ। হাতে একটা লাল কার্ড নিয়ে সে ঘরে ঢোকে।

এটা বোধহয় কোন বড় অফিসারের বিয়ের সার্টিফিকেট। এবারে কিন্তু এটা ছোট বাজারে বিক্রী করো না। সবচেয়ে ভালো হয় যদি কারুর হাত দিয়ে এটা পিকিং হোটেলে পাঠাতে পারো। সেখানে এটার বেশী দাম পেতে পারি।

খেলাচ্ছলে জিয়ানগাও জবাব দেয়, "কার্ডটা আমাদের। তা যদিনা হত তাহলে তোমায় বৌ বলে ডাকার অধিকার আমার কোথায়? দুবছর ধরে তোমায় পড়তে শেখাচ্ছি কিন্তু এখন দেখ্ছি তুমি নিজের নামটা পর্যন্ত চিনতে পারো না।"

"এতগুলো শব্দ কেই বা শিখতে পারে? আর ঐ বৌ, ব্যাপারটা চিরতরে বাদ দিয়ে দাও দিকিনি! আমায় ঐ নামে ডাকা পছন্দ করি না। একটু গুরুত্ব দাও—ওটা কে লিখেছে?"

"আমি লিখেছি—। আজ সকালে পুলিশ এদিকে ভাড়াটেদের চেক-আপ করতে এসেছিল। সে বলে গেল যে গত দুদিন ধরে সামরিক

আইনটা একটু কড়াকড়ি হয়েছে, প্রতিটি পরিবারকে জানাতে হবে তাদের সঙ্গে কারা কারা বাস করছে এবং তাদের সাথে ওদের সম্পর্কটাই বা কি ? বৃদ্ধ উও বললে যে আমি যদি আমাদের নাম স্বামী স্ত্রী বলে উল্লেখ করি তাহলে অনেক ঝামেলা থেকে রেহাই পেতে পারি। পুলিশও বললে যে দুজন অবিবাহিত ছেলে মেয়ে এক সঙ্গে বাস করছি সেটা যদি লেখা হয় তাহলে সেটাও ভালো দেখায় না। অতএব গতবারের অবিক্রীত লাল সার্টিফিকেট পুরণ করে দিলাম এই লিখে যে আমরা বিবাহিত—১৯১৯ সাল থেকে।”

“কি বললে—১৯১৯ ? তখন তোমায় এমন কি চিনতাম না পর্য্যন্ত ! সত্যি তুমি আমাদের গাড্ডায় ফেলবে দেখছি। আমরা স্বর্গ ও মর্তকে একসাথে পূজো করলাম না—আমরা পরস্পরের মদের পাত্র থেকে মদ্যপান পর্য্যন্ত করলাম না ; তাহলে কেমন করে বলা যাবে যে আমরা স্বামী স্ত্রী।”

যদিও এ ব্যাপারটার সে ঘোরতর বিরোধী তাহলেও সে এসব কথা বেশ শান্তস্বরে বলছিল। সে বেশ পরিবর্তন করে নীল কাপড়ের তৈরী একটা প্যাণ্ট ও সাদা একটা জামা পড়েছে। সাজসজ্জা ছাড়াই তার মুখে একটা স্বাভাবিক সতেজ সৌন্দর্য্য রয়েছে। ওর যদি বিয়ে করার ইচ্ছে থাকতো তো যে কোন স্থানীয় ঘটক তাকে অতি সহজেই ২৩/২৪ বছরের বিধবা বলে চালিয়ে দিতে পারতো। সেও দাবী করতে পারতো—চলতি বাজার দর অনুযায়ী কমপক্ষে একশত আশি ডলার।

কার্ডখানার ঠিক মাঝখানে ভাঁজ করে সে হাসতে হাসতে বলে, “ভাঁড়ামি করে যেন যত্র তত্র বলে বেড়িয়ো না। চমৎকার বিয়ের সার্টিফিকেট ! চলো এখন চাটুতে ভেজে পেঁয়াজের পিঠে করেছি—খাওয়া যাক্ এবার !” উনোনের ঢাকা তুলে আগুনের শিখার ভিতরে কার্ডটা গুঁজে দেয়। তারপর টেবিলে ময়দা মাখতে সুরু করে।

কাষ্ঠহাসি হেসে জিয়ানগাও বলে, “ইচ্ছে হলে ওটা তুমি পুড়িয়ে দিতে পারো। পুলিশ স্বামী স্ত্রী হিসেবে আমাদের নাম টুকে নিয়ে গেছে। ওরা যদি সরকারী ভাবে পরীক্ষা করতে আসে ত বলে দেব যে কার্ডটা হারিয়ে গেছে—যখন রাস্তায় রাস্তায় উদ্বাস্তু হয়ে ঘুরে বেড়াতাম—তখন তোমায় আমি বৌ বলেই ডাকবো—তা তুমি পছন্দ করো আর নাই করো। বৌ, বৌ !! আমি কালই তোমায় একটা টুপি কিনে দেব। অবশ্য তোমায় একটা আংটি কিনে দেবার সংগতি আমার নেই।”

'ওসব ছাড়োতো। দেখছি তুমি আমায় পাগল করে দেবে।'

"মনে হয় তুমি এখনও লি মাও-এর কথা ভাবছ।" জিয়ানগাও-এর কণ্ঠস্বরে সে তেজস্বীতা আর নেই—কয়েক মুহূর্ত পূর্বেও যা ছিল। কথা গুলো চাপাস্বরে বললেও সে সব চুনতাও এর কানে গেল।

"তাকে ভাবছি কি না? মাত্র ত এক রাতের জন্য স্বামী-স্ত্রী। তার-পর প্রায় পাঁচ বছরের মত বিচ্ছিন্ন আমরা। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আবার তার কোন খবর নেই—ভেবে কি হবে?"

বিয়ের দিন কি কি ঘটেছিল সে জিয়ানগাওকে সব বলেছিল। যখন তাকে পুষ্প শোভিত পাল্কীতে করে বরের বাড়ী নিয়ে আসা হয় তখন ভোজসভায় অতিথিদের চেয়ারে বসার ঠিক আগে একটা লোক ছুটে এসে ঘোষণা করে যে পাশের দুটি গাঁয়ে একদল সেনা জড়ো হয়েছে—ট্রেঞ্চ খোঁড়ার জন্য তারা লোক ধরে ধরে চালান দিচ্ছে। তাই সকলেই পালাচ্ছে নব-দম্পতিও তাদের জিনিষপত্র পুঁটলি করে বেঁধে অবশিষ্ট গ্রামবাসীদের সঙ্গে দ্রুত পালালো পশ্চিমে। দ্বিতীয় রাতে তারা যখন রাস্তায় আগুয়ান লোকেদের কাজ থেকে হঠাৎ চিৎকার শুনলো—"পালাও ডাকাত আসছে।" "জলদি লুকিয়ে পড়ো।"

সঙ্গে সঙ্গে ঠেলাঠেলি ও বিশৃংখলা সুরু হয়ে গেল। সবাই প্রতি-যোগীতায় লেগে গেল—কে কত তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হতে পারে। কেউই নিজেকে ছাড়া অন্য কারুর সম্বন্ধে চিন্তা করলো না। পরদিন ভোরে সূর্য্য উঠলে দেখা গেল একডজন লোকের কোন হদিশ নেই। এদের মধ্যে লি মাও ও চুনতাও ছিল।

এখন সে বলে, "নিশ্চয় তখন ওকে ডাকাতে নিয়ে গিয়েছিল, মনে হয় ওকে অনেক পূর্বেই খুন করা.হয়েছে। বাদ দাও ত! ওর সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করাই ভালো।"

পেঁয়াজের পিঠে তৈরী করে টেবিলে রেখে দেয় মেয়েটা। এক বাটি শশার ঝোল তুলে নিয়ে তারা দুজনে একত্রে চুপচাপ খেয়ে চলে।

খাওয়া শেষ করে ওরা দুজনে গাছ তলায় বসে খানিক গালগল্প করে নেয়। ঠাণ্ডা মৃদু বাতাস অসংখ্য ছোট ছোট জোনাকিকে উপর থেকে নীচে গাছের ডালে নামিয়ে আনে দেখে মনে হয় যেন আকাশ থেকে অসংখ্য তারকার পতন হচ্ছে; ওদিকে অসংখ্য প্রকৃত তারকা শশাগাছের পাতার মধ্য দিয়ে জ্বল-জ্বল করে জ্বলছে। রাতে প্রস্ফুটিত সাদা সুগন্ধী ফুল তাদের পাপড়ি খুলে সমগ্র বাগানটাকে সুগন্ধে ভরিয়ে তোলে।

জিয়ানগাও বলে, "কি সুন্দর গন্ধ!". একটা ফুল তুলে সেটা সে চুনতাও এর মাথায় পরিয়ে দেয়।

"আমার সুগন্ধি সাদা ফুল নষ্ট করো না বলে দিচ্ছি। আর রাতে চুলে ফুল দেওয়া—দূর! আমি বেশ্যা নাকি?" চুল থেকে ফুল খুলে নিয়ে তার গন্ধ শুঁকে তার পাশটিতে কাঠের উপর রেখে দেয়।

"আজ অত দেরী হল যে?"

হ্যাঁ আজ একটা ভালো ব্যবসা করেছি। আজই বিকেলে বাড়ী ফেরার পথে হাউমাম বাঁকের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন দেখলাম যে কিছু ঝাড়ুদার এক বড় ঠেলা ভরতি বাজে কাগজ নিয়ে চলেছে। ওদের জিজ্ঞেস করলাম এ সব তারা কোথায় পেয়েছে। জবাবে তারা বলে যে পুরানো রাজপ্রাসাদের শেন উও ফটকের কাছে পেয়েছে। দেখলাম ঠেলাটা লাল আর হলদে রং-এর সরকারি দলিলের মত দেখতে কাগজ পত্রে ঠাসা। জিজ্ঞেস করি ওগুলো তারা আমায় বিক্রী করবে কিনা। ওরা বেশ বিনয়ী হয়ে বললে, যদি তুমি চাও তাহলে আমরা তোমায় একটা বিশেষ দর দেব তা দিয়ে তুমি নিয়ে যেতে পারো। বাড়ীর জানালার নিচে চুনতাও বড় ঝুড়ি দেখিয়া বলে যে, "এ সবের জন্য খরচ হয়েছে আমার মাত্র এক ডলার। হতে পারে পুরো টাকাটাই জলে গেল—ঠিক বলতে পারছিনা। যা হোক কাল এসব ঘাঁটা-ঘাঁটি করা যাবে।"

"রাজপ্রাসাদ থেকে পাওয়া জিনিস পত্র থেকে ভয় পাবার কিছু নেই। তবে স্কুল ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের কাছ থেকেই ভয়টা বেশী। ওদের কাগজ খুব ভারী ও দুর্গন্ধযুক্ত। ওর থেকে কি যে বেরুতে পারে তা কে জানে।"

"সমস্ত দোকানদারেরা বিদেশী কাগজ মোড়ক হিসেবে ব্যবহার করে আসছে গত কয়েক বৎসর ধরে আমি ভাবতেই পারছিনা ওগুলো আসছে কোথা থেকে। ওগুলো কোন সংগ্রাহকই ঘাঁটতে চায় না। ভারী বলে ঐ সব কাগজ কিনতে হচ্ছে আমাদের বেশী দাম দিয়ে। কিন্তু বিক্রী করার সময় দাম পাই খুব কম।"

"বেশী বেশী মানুষ এখন বিদেশী ভাষা পড়ছে। প্রত্যেকেই চায় বিদেশী খবরের কাগজ পড়তে যাতে করে ওদের সাথে তারা ব্যবসা করা শিখতে পারে।"

"তা করুক গে যাক্। আমরা বিদেশী কাগজ কুড়োবই।"

"মনে হচ্ছে এখন থেকে সব জিনিষেই বিদেশী লেবেল আঁটা থাকবে।"

বিদেশী কাপড়, বিদেশী টুপি, বিদেশী পোষাক ত আছেই এর পরে দেখে নিও, "বিদেশী উটের চল হবে।"

চুনতাও হাসে। "অন্য লোকদের সম্বন্ধে কথা বলা তোমার সাজেনা। তোমারও যদি টাকা থাকতো তাহলে তুমিও হয়ত বিদেশী বই পড়তে চাইতে এবং বিদেশী ভাবাপন্ন বৌ চাইতে।"

"ভগবান জানেন আমি কখনও বড়লোক হব না; আর যদি হইও আমি বিদেশী ভাবাপন্ন বৌও খুজব না। আমার যদি সামান্য কিছু অর্থ থাকতো তাহলে সোজা গাঁয়ে চলে যেতাম এবং কিছু ভালো চাষের জমি কিনে আমরা একত্রে চাষবাস করতাম।"

চুনতাও যেদিন তার স্বামীকে হারিয়ে, বাড়ী ছেড়ে পালাতে বাধ্য হযেছিল সেদিন থেকেই তাঁর মনে গাঁ কথাটার সম্পর্কে একটা কেমন যেন অপ্রীতিকর অনুভূতি রয়ে গেছে। "তুমি তাহলে এটাই চাও?" সে জানতে চায়। "তোমার জমি কেনার পূবেই তোমার টাকা ও তুমি নিজে গবগব করে হাওয়া হয়ে যাবে। গাঁ হচ্ছে একটা নরক বিশেষ। আমি কিন্তু সেখানে আর ফিরে যাচ্ছি না—এমন কি এখানে যদি উপোষ করতে হয় তাহলেও না।"

"আমি কিন্তু আবার আমার জিন জিয়ান গাঁ দেখতে চাই।"

"যেখানেই যাওনা কেন সব গাঁ-ই একরকমের। লুঠতরাজ করা সেনারা যদি সেখানে নাও থাকে তাহলে ডাকাতদল আক্রমণ করবেই। ডাকাত যদি না থাকেও জাপানিরা থাকবেই। কে এমন সাহসী আছে যে ফিরে যেতে চায়। এখানে আমরা খুব ভালো আছি—বাজে কাগজ কুড়োচ্ছি। আমাদের যা দরকার তা হলো একজন সাহায্যকারী লোক। আমাদের যদি এমন কেউ একজন থাকতো যে বাড়ীতে তোমার কাজ—বাজে কাগজ বেছে রাখা করত, তাহলে দিনের বেলায় তুমি দোকান খুলে বসে সরাসরি খরিদ্দারকে জিনিষ বেচতে পারতে। একটা যদি মধ্যস্ত রেখে দি তাহলে কোন কিছু ভালো জিনিষ নজর এড়ানোর সম্ভাবনা কম থাকে।"

"আরও তিন বৎসর যদি এ ব্যবসায় আমি থাকতে পারি তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি কোন ভালো জিনিষ আমাদের নজর এড়িয়ে যায় ত তার সম্পূর্ণ দোষ আমার। গত কয়েক মাসে আমি অনেক কিছু শিখেছি। ব্যবহৃত ডাকটিকিটি—কোনটার অর্থকারী মূল্য রয়েছে। কোনটার নেই—এ ব্যাপারর প্রায় সব কিছু আমি জেনে ফেলেছি। কয়েক-

দিন আগে কাংগ ইয়াওয়েই এর* লেখা কি একটা যেন পেলাম। আন্দাজ করো ত ওটা বেচে আজ কত পেলাম?" খুসী হয়ে জিয়ানগাও বুড়ো ও কড়ে আঙুল দেখিয়ে বলে, "আশি সেণ্ট।"

"তবেই বোঝ! আমরা যদি প্রত্যহ নোংরা খুটে আশি সেণ্ট আয় করি তাহলে ত সেটা খুব খারাপ হবে না। গাঁয়ে ফিরে যাবো কেন? তাই যদি করি তাহলে কি সেটা বিপদ ডেকে আনা হবে না?" চুনতাও-এর হাসি হাসি ভাব ঠিক যেন শেষ বসন্তের কালো ডানা ওয়ালা সোনালি পাখীর সুরেলা গানের মত। "আমি হলফ করে বলছি যে আজ যেসব কাগজ এনেছি তার ভেতর থেকে তুমি নিশ্চয় ভালো অনেক জিনিষ পাবে! শুনে এলাম কাল রাজপ্রাসাদ থেকে আরও অনেক ভালো ভালো জিনিষ বেরুতে পারে। ওরা বল্লে যে রাজপ্রাসাদের সব জিনিষ বাক্সবন্দী হয়ে দক্ষিণে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ পুরানো কাগজ চায় না। আমি দেখলাম যে প্রাসাদের ডনঘুয়া ফটকের বাইরে টাল করে কাগজ সব পড়ে রয়েছে। বলতে গেলে ওরা এসব বিলিয়ে দিচ্ছে-সব কিছু। কালকে ওখানে গিয়ে সবকিছু জেনে এসো না?"

ওরা জানবার পূর্বেই মাঝরাত হয়ে গেছে। চুনতাও উঠে আড়মোড়া ভেঙ্গে বলে, "আমি ক্লান্ত, বিশ্রাম নেওয়া যাক্।"

জিয়ানগাও মেয়েটার পেছু পেছু গিয়ে ঘরে ঢোকে। সেখানে জানালার পাশে ইঁট দিয়ে তৈরী খাট পাতা রয়েছে।—সেটা এত চাওড়া যে তিনজন লোক সেখানে অনায়াসে শুতে পারে। তেলের আলোর শিখায় দেওয়ালের দুটো ছবি আবছা দেখা যাচ্ছে। একটা ছবি "আটপরী মিলে মাহ্‌জংগ খেলছে।" অন্য ছবিটি একটি সিগারেটের বিজ্ঞাপনে সুন্দরী মেয়ের ছবি। জিয়ানগাও-এর মনে হল চুনতাও যদি ছেঁড়া খড়ের টুপি ফেলে দিয়ে একটা সুন্দর গাউন পড়ে—সে গাউন কোন নামী পোষাকের দোকান থেকে কেনার প্রয়োজন নেই—এমন কি স্বর্গীয় সেতুর বাজারে পুরানো পোষাকের দোকান থেকে কিনলেও চলবে—একটা গোল টিলার উপরে বসে, তাহলে তাকেও বিজ্ঞাপনের মেয়ের মত কেতাদুরস্ত মেয়ের থেকে ভিন্ন দেখাবে না। এই জন্যে সে চুনতাও এর পেছনে লাগে, বলে, 'বিজ্ঞাপনের মেয়েটা হচ্ছে তারই ছবি।'

চুনতাও পোষাক খুলে একটা পাতলা সুজনীতে দেহ মুড়ে মুখটা বিছানায় উপুড় করে শুয়ে পড়ে। তাদের রাতের অভ্যাস অনুযায়ী তার

* কুইং রাজত্বের সময়কার একজন পণ্ডিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক।

পিঠ, পা মালিশ করে দেয় জিয়ানগাও। অভ্যাসবশতঃ চুনতাও ক্রমশঃ গা এলিয়ে দেয়। ঠোঁটে তার ক্ষীন হাঁসি তখন—যখন জিয়ানগাও তেলের বাতির টিমটিমে আলোয় তার ক্লান্ত পেশীগুলি দলাই-মলাই করে দেয়।

আধঘুমন্ত অবস্থায় সে বিড়বিড় করে বলে, "তুমিও বিছানায় এসো; আজ রাতে কাজ করো না। তোমায় কাল খুব ভোরে উঠতে হবে।"

আস্তে আস্তে চুনতাও-এর নাক ডাকতে থাকে। জিয়ানগাও আলো নিভিয়ে দেয়।

ভোরে উঠে তারা নিজ নিজ কাজে বেড়িয়ে পড়ে। দেখে মনে হয় ওরা যেন এক জোড়া দাঁড়কাক-খাদ্যের সন্ধানে বাসা ছেড়েছে।

দুপুরের তোপ দাগার ঠিক পরেই দশটি মঠের হ্রদের মেলায় ঢাক ঝাঁক যখন খুব গোলমাল সৃষ্টি করে চলেছে ঠিক তখনই প্রাসাদের পিছনের দরজা দিয়ে চুনতাও বেড়িয়ে এলো—পিঠে তার কাগজ ভর্তি ঝুড়ি, চলেছে সে 'সিয়া' সেতুর দিকে। মেলা প্রাঙ্গনের কাছাকাছি আসতেই পথের ধার থেকে কে একজন তাকে ডাকে,

"চুনতাও, চুনতাও।"

মাঝে মধ্যে জিয়ানগাও তাকে প্রদত্ত এই নামে ডাকে। গাঁ ছাড়ার পর তিন বছরের মধ্যে কেউ তাকে ঐভাবে ঐ নামে খোলা জায়গায় ডাকে নি।

"চুনতাও আমাকে তোমার মনে নেই?"

সে ঘুরে তাকিয়ে দেখে যে রাস্তায় এক ভিখিরি বসে আছে। করুণা-উদ্রেককারী ডাক তার কাছ থেকেই আসছে। মুখটা তার ঘন দাড়িতে ভরা। সে দাঁড়াতে অক্ষম—কেন না তার দুটো পাই নেই। তার ছেঁড়া ধূসর পোষাকের সাদা ধাতুর বোতামে মরচে ধরেছে। জামার কাঁধের সেলাইটা ছিঁড়ে গেছে। তার মধ্য দিয়ে দেহের চামড়া দেখা যাচ্ছে। একটা অবর্ণনীয় তকমাহীন টুকি তীর্যকভাবে তার মাথায় পড়ান রয়েছে।

চুনতাও নির্বাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

"চুনতাও! আমি লি মাও।"

সে দুপা এগিয়ে এল। কালিঝুলি মাথা চোখের জল তার দুগাল বেয়ে ঝড়ে পড়ে। তার দাড়ি ভিজে গেছে। তার হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে যায় ভীষণ। কয়েক মিনিট তার গলা দিয়ে কোন স্বর বার হলো না।

অনেক পরে সে বলে, "মাও! তুমি ভিক্ষে করছ! পা দুটো গেল কি করে?"

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "সে এক লম্বা কাহিনী। বেজিংএ কতদিন ধরে আছ। কি বিক্রী করছ ?"

"বিক্রী করছি ? আমি বাজে কাগজ কুড়োই। বাড়ী গিয়ে আমরা অনেক গল্প করব।"

চুনতাও একটা রিক্সা ডেকে লি মাও-কে তার উপর তোলে আর তার মেঝেতে ঝুড়িটা নামিয়ে রাখে। রিক্সাওয়ালা রিক্সা টানতে টানতে চলে ও সে তা ঠেলতে ঠেলতে চলে। উত্তরের প্রাচীরের নিকটে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে তার ছোট ছোট পেতলের বাটি বাজাতে বাজাতে বৃদ্ধ উও তাকে ডাক দেয়।—যখন তারা তার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন।

"বড়দি আজ যে বড় সকাল সকাল ফিরলে নিশ্চয় আজ ব্যবসায় বেশ ভালো হয়েছে ?"

জবাবে মেয়েটা চীৎকার করে বলে, "দেশ থেকে এক আত্মীয় এসেছে।"

তাদের বাড়ীর সামনে ফাঁকা চত্বরের ফটকের কাছে এসে লি মাওকে রিক্সাওয়ালা সাহায্য করে নামতে। চাবি দিয়ে দরজা খুলে চুনতাও লি মাওকে ভেতরে নিয়ে যায়, সে হাতের উপর ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে কাটা পা দুটো টেনে টেনে সামনে এগিয়ে চললো। ঠিক যেন সার্কাসের ভাল্লুকের মত।

সে জিয়ানগাও এর এক প্রস্থ পোষাক বার করে নিয়ে এলো। যেভাবে জিয়ানগাও তার জন্যে প্রত্যেকদিন জল বয়ে আনে ঠিক সেইভাবে চুনতাও লি-মাও-এর জন্যে কুয়া থেকে দুবালতি জল তুলে নিয়ে আসে। একটা কাঠের টবে ঐ জল ঢেলে দিয়ে চুনতাও লি মাওকে স্নান সেড়ে নিতে বলে। স্নান শেষ হলে সে আবার অন্য এক গামলায় জল ভরে দেয় যাতে করে লি মুখ ধুতে পারে। সবশেষে সে তাকে উনোনের খাটের উপর বসিয়ে দেয়, তার পর সে নিজে স্নান করতে অন্য ঘরে চলে যায়।

"এ জায়গাটা বেশ চমৎকার ও পরিচ্ছন্ন। তুমি এখানে কি একাই থাকো ?"

দ্বিধাহীন কণ্ঠে সে জবাবে বলে, "আমার সহকর্মীও এখানেই থাকে।"

"ব্যবসায় করছ নাকি ?"

"বললাম না যে আমি কাগজ কুড়োই।"

"বাজে কাগজ কুড়োও। ওতে দিনে কত আয় হয় ?"

"আমায় প্রশ্ন করো না তং ?. আগে তোমার কথা শুনি।"

স্নান করা জল বালতি থেকে ফেলে দিয়ে সে চুল আঁচড়ে এ ঘরে চলে এলো। তারপর লি মাও-এর ঠিক বিপরীত দিকে বসে পড়ে।

লি মাও তার গল্প শুরু করে।

"চুনতাও গল্পটা অনেক বড়। কেবল প্রধান প্রধান ঘটনা গুলো তোমায় আমি বলে যাবো—সে রাতে ডাকাতেরা আমায় গ্রেপ্তার করেছিল। আমি তাদের ঘৃণা করি কেন না ওদের জন্যেই তোমায় আমি হারিয়ে ফেলি। আমিও তক্কে তক্কে ছিলাম; একদিন একটা রাইফেল বাগিয়ে ধরে ওদের দুটোকে খতম করে দি। তারপর প্রাণ বাঁচাতে ছুটলাম। আমি কোন প্রকারে শেনিয়্যাংগ-এ চলে আসি? ঠিক এই সময় সেনাবাহিনীতে লোক নিচ্ছে এবং আমিও সেনাবাহিনীতে যোগদান করি। পরের তিনটি বছর ধরে চেষ্টা করে যাই বাড়ী থেকে কোন খবর পেতে। লোকেরা বলাবলি করত যে আমাদের গাঁটা নাকি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিযেছে ওরা। কেউ বলতে পারলো না যে আমাদের সামান্য একখণ্ড জমির দলিলটার কি হাল হল। আমরা যখন পালাই তখন ওটা সঙ্গে করে নিতে ভুলে গিয়েছিলাম এবং তাই ওটার খোঁজ খবর করতে বাড়ী যাবার জন্য ছুটি চাইনি কখনও। আমার আশংকা ছিল যে আমি যদি ছুটি নিই তাহলে প্রতিমাসে যে সামান্য কয় ডলার বেতন পাচ্ছি তাও হারাবো।"

"অতএব আমি সেনা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলাম—স্রেফ বেতন পাবার দিনের জন্য বেঁচে থাকি। অফিসার হওয়ার ব্যাপারে আমার কোন আশা নেই। তারপর গত বৎসর কোন একটা ঘটনা ঘটলো—আমি জন্মেছি দুর্ভাগ্যের জন্য। আমাদের কর্নেল এই বলে এক আদেশ জারি করলেন যে যদি কোন লোক দশটি গুলির মধ্যে নয়টি গুলি লক্ষস্থলের ঠিক কেন্দ্রে আঘাত করতে পারে তার বেতন দ্বিগুণ হবে এবং তার পদোন্নতি ঘটবে। সারা বাহিনীতে এমন একজনও ছিলো না যে দশটার ভেতরে চারটের বেশী গুলি লক্ষবস্তুতে আঘাত করতে পারে—এবং সেগুলো আবার ঠিক কেন্দ্রে যায় না। আমি কিন্তু একের পর এক করে নয়টা গুলি লক্ষবস্তুর কেন্দ্রে আঘাত করি। তারপর আমি কত ভালো গুলি চালাতে পারি এটা দেখানোর জন্যে লক্ষবস্তুর দিকে পেছন করে মাথা নামিয়ে দুপায়ের মাঝ দিয়ে গুলি চালালাম। গুলিটি লক্ষবস্তুর একেবারে ঠিক কেন্দ্রে আঘাত করে।"

"কর্নেল যখন আমায় ডেকে পাঠালেন তখন আমি ত মহাখুশী।

আমি নিশ্চিত ছিলাম যে উনি আমায় প্রশংসা করবেন। তার পরিবর্তে শুয়োরটা আমার উপর ভীষণ ক্ষেপে গেল। আমায় ডাকাত বলে অনেক গালাগাল করলেন এবং বললেন যে তিনি আমায় গুলি করে হত্যা করতে চান। কেননা তিনি বললেন যে একমাত্র ডাকাতরাই এত ভালো গুলি চালাতে পারে। আমার কোম্পানির সার্জেণ্ট ও লেফটানেণ্ট আমার জন্য অনেক আকুতি মিনতি করলেন এবং সাথে সাথে ওঁরা তাকে এই নিশ্চয়তা দিলেন যে আমি লোকটা খারাপ' নই; যদিও ওঁরা আমায় হত্যা না করার ব্যাপারে তাঁকে সিদ্ধান্ত নেওয়াতে পেরেছিলেন, তাহলেও আমি সাধারণ সেনার তক্‌মা হারালাম। এমনকি আমি দ্বিতীয় স্তরের সৈনিকও আর রইলাম না। কর্নেল বললেন যে কোন কোন সময় তার বাহিনীর লোকজনকে তিনি ক্ষুণ্ণ করতে বাধ্য হন, এবং তাই বাহিনীতে একজন উত্তম সন্ধানী লোক থাকায় যুদ্ধক্ষেত্রে—সামনে বা পেছন থেকে তার কাছ থেকে গুলির আঘাত খাওয়ার ঝুঁকি সবসময় থেকে যায়। এটা ঠিক যে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে মারা পড়তেও পারেন, তাহলেও কারুর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণ দিতে তিনি রাজী নন। এই ব্যাপারে কেউ কোন জবাব দিলো না। লোকেরা বারবার কেবল আমায় অনুরোধ জানায় সেনাবাহিনী ছেড়ে দিয়ে অন্য চাকরী খুঁজে নিতে।

সেনাদল ছাড়ার অল্পদিন পরেই আমি শুনলাম যে জাপানীরা পেনিয়্যাংগ দখল কারছে এবং কর্ণেলের একটা কুকুর তার সব সেনা নিয়ে তাদের কাছে আত্ম সমর্পণ করেছে। আমি তখন এক উত্তপ্ত পাগল। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে বেজন্মাটাকে আমায় খুঁজে পেতেই হবে। আমি সেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করে হাইজেং-এর বাইরে পরের ছ মাস লড়াই চালালাম। আমরা ধীরে ধীরে জায়গা ছাড়তে ছাড়তে সড়ে দক্ষিণে চীনের প্রাচীরের দিকে পেছু হটে এলাম। আজ থেকে দু-মাস আগে আমরা পিনগ্‌গিউ-এর উত্তরতম জায়গায় ছিলাম এবং আমি পাহারাদারের দায়িত্বে ছিলাম। আমি শত্রুসৈন্যের ভেতরে ঢুকে গেলাম এবং দুপায়েই তখন আমার গুলি লাগে। তখনও পর্যন্ত আমি হাঁটাচলা করতে পারছিলাম এবং একটা বড় পাথরের আড়ালে থেকে লড়াই করে ওদের কয়েকজনকে খতম করলাম। আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। রাইফেল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাঠের ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেলাম। সেখানে আমি লুকিয়ে রইলাম--একদিন, দুদিন—কিন্তু কোন স্ট্রেচার বাহকের পাত্তা নেই। পা দুটো তখন আমার বিশ্রীভাবে ফুলেছে। আমি

আর লড়তেই পারছিনা। আমার খাদ্য নেই এমন কি খাবার মত জলই নেই। স্রেফ ওখানে পড়ে পড়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে একজন একটা বড় ঠেলা নিয়ে এসে হাজির। সে আমায় ওখান থেকে তুলে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে এলো এবং তারা এক পলক দেখে নিয়েই আমায় বেজিং-এর সামরিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলে। কিন্তু এরই মধ্যে তিনটে দিন চলে গেছে। পা দুটোর অবস্থা তখন খুবই কাহিল, ডাক্তার পা দুটো আমার কেটে বাদ দিয়ে দিলে।

একমাসের উপর আমি হাসপাতালে ছিলাম। আমার বিপদ কেটে গেল ঠিকই, কিন্তু পাদুটো কেটে বাদ দিতে হলো। নিজের মনেই ভাবলাম যে—এই শহরে আমার একজনও বন্ধু বা আত্মীয় নেই, তাই বাড়ী ফেরা আমার হবে না। আবার বাড়ীও যদি ফিরে যাই তবে চাষ করবো কি করে। পা বাদ দিয়ে হাসপাতালে আবেদন জানালাম যে তারা যেন আমায় ওখানে ছোট খাটো কোন কাজ দিয়ে রেখে দেয়। ডাক্তার বললে যে হাসপাতাল রোগীদের রোগ সারায়। কিন্তু তাদের ভরণ পোষণ করে না এবং তাদের চাকরী খুঁজে দেওয়া তাঁদের দায়িত্ব নয়। সেনাদের জন্যে এ শহরে কোন স্বাস্থ্য নিবাস নেই। অতএব যা আমি করতে পারি তা হলো ভিক্ষে করা। আজকে নিয়ে ঠিক পাক্কা তিনদিন আমি ভিক্ষে করছি। ইদানিং আমি ভাবছিলাম এ ভাবে ত বেশীদিন চালাতে পারবো না, আত্মহত্যা করে ও ল্যাঠা চুকিয়ে দেওয়াই ভালো।

চুনতাও গভীর মনোযোগ সহকারে সব শুনলো; চোখ দুটো তার ভেজা ভেজা, তাহলেও সে কোন কথা বললে না। লি মাও থামলো কপাল থেকে ঘাম মুছতে মুছতে।

"আচ্ছা তোমার কি খবর?" সে জিজ্ঞেস করে। "যদিও গাঁয়ের খোলা মেলার তুলনায় শহরটা ঘিঞ্জি তাহলেও ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে তুমি বেশ ভালই আছ।"

"কে ভালো আছে? ব্যাপার-স্যাপার যতই খারাপ হোক না কেন যে কোন মানুষকে ত বেঁচে থাকতেই হবে। নরকের দরজার সামনেও তুমি হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের দেখা পাবে। আমি গত কয়েক বছর ধরে আমার জীবিকা নির্বাহের জন্য বাজে কাগজ কুড়োচ্ছি। জিয়ানগাও নামে একটা লোক আমার সহকর্মী, আমরা সব কিছু ভাগাভাগি করে চলি—তুমি অবশ্য বলতে পারো যে…।"

"সে আর তুমি এখানে একসঙ্গে থাকো?"

"হ্যাঁ আমরা এক বিছানায় শুই।" একটুও দ্বিধা না করে চুনতাও জবাব দেয়—যেন এ ব্যাপারে অনেক দিন আগে থেকেই তার একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টি ভঙ্গী রয়েছে।

"ও হো! তাহলে তোমরা বিবাহিত?"

"না আমরা কেবল একসঙ্গে থাকি।"

"সে ক্ষেত্রে, তুমি এখনও আমার বৌ-তাই না?"

"না আমি কারুর বৌ নই।"

লি মাও-এর স্বামীত্বের মর্য্যাদায় আঘাত লাগে। কিন্তু সে বলবেটা কি?—ভেবেই পায় না। চোখ দুটি তার নিবদ্ধ মেঝেতে; তার মানে এই নয় যে সে কোন কিছু নির্দিষ্ট ভাবে দেখছে—কিন্তু আসলে তার বৌ-এর মুখোমুখি হতে লজ্জা পাচ্ছে।

শেষ পর্য্যন্ত সে ক্ষীণকণ্ঠে বলে, "নিশ্চয় সকলে আমায় অসতীর স্বামী মনে করে হাসাহাসি করছে?"

"অসতী?" এই কথা শুনে মহিলার মুখ সামান্য একটু শক্ত হয়; কিন্তু সে বিদ্বেষহীন কণ্ঠে বলে, "সেই সব লোক যাদের অর্থও প্রতিষ্টা আছে তারাই কেবল অসতীর স্বামী হতে ভয় পায়, তোমার মত লোক—কে জানতো তুমি বেঁচে আছ কিনা? অসতীর স্বামী হও আর নাই হও—পার্থক্যটা কি? আমি স্বাধীন এখন। আমি যাই করি না কেন তার কোন প্রতিক্রিয়া তোমার উপর বর্তাবে না।"

"যাই হোক্ আমরা এখনও পর্য্যন্ত বিবাহিত।" পুরানো একটা প্রবাদ আছে না যে, বিবাহের একটা রাত একশ দিনের স্বর্গসুখ।

"একশ দিন স্বর্গসুখ সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই।" চুনতাও বাঁধা দিয়ে বলে। "তারপর থেকে অনেকগুলো একশ দিনের স্বর্গসুখ চলে গেছে, একটা কথাও না বলে প্রায় পাঁচটা বছর কেটে গেছে। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে তুমি স্বপ্নেও কখনও ভাবোনি যে আমাদের আবার দেখা হবে। আমি এখানে একাই ছিলাম! আমাকে ত বাঁচতেই হবে। আমার কারুর সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে। এই ক বছর ওর সঙ্গে একসাথে বাস করার পর অবশ্য তোমার প্রতি আমার সেই একই অনুভূতি এখন আর নেই। আজ তোমায় আমি ওখান থেকে তুলে নিয়ে এলাম কেন জানো? আমাদের বাবারা পরস্পারের বন্ধু ছিলেন। দুজনেই আমরা একই গ্রামের। তুমি আমায় তোমার বৌ বলে দাবী জানাতে পারো—আমি তা অস্বীকার করি। এমন কি তুমি যদি কোর্টে যাও আমি নিশ্চিত যে তুমি জিত্‌তে পারবে না।"

লি মাও তার বেল্টের কাছাকাছি থলেটা এমন ভাবে হাতড়াতে থাকে যে মনে হয় সে যেন কিছু খুঁজছে। তারপর সে খোঁজা বন্ধ করে চুনতাও এর দিকে চেয়ে থাকে, তার হাতটা বেল্ট থেকে নেমে এসে উনোন বিশিষ্ট খাটের উপর পাতা মাদুরের উপর পড়ে যায়।

লি মাও নির্বাক। চুনতাও কাঁদে। মেঝের উপরের ছায়াটা ধীরে ধীরে লম্বা হতে থাকে।

"ঠিক আছে। চুনতাও—তুমি যদি চাও তাই হবে। আমি পংগু। তুমি যদি আমার কাছে ফিরেও আস তাহলেও তোমার ভার আমি বহন করতে পারবো না।" লি মাও কথাকটি বিচক্ষণতা সহকারে বলে।

"তুমি পংগু বলে তোমায় আমি ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি না। কিন্তু তাকেও আমি ছাড়তে পারি না। আমরা কেন সবাই এক সঙ্গে থাকি না? কেউই বলতে পারবে না কে কাকে প্রতিপালন করছে। তুমি কি বলছ?" চুনতাও তার মনের কথা সব খুলে বলে দিল।

লি মাও-এর পাকস্থলী গুরগুর শব্দ করতে থাকে।

"দেখেছ! এতক্ষণ ধরে আমরা কথা বলছি, এমন কি তোমায় জিজ্ঞেস পর্য্যন্ত করতে ভুলে গেছি তুমি কি খেতে পছন্দ করো। তোমার নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে?"

"যা হয় খাবো! গতরাত থেকে কিসসু খাই নি। খালি জল খেয়ে আছি।"

"আমি কিছু কিনে আনি গে যাই।" এই বলে সে দ্রুত বাড়ী থেকে বেড়ুতে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জিয়ানগাও উঠোনে এসে উপস্থিত। মনটা তার খুসী খুসী। শশাগাছটার নিচে ধাক্কা লাগে।

সে তাকে জিজ্ঞেস করে, "এত খুসী খুসী যে? কি ব্যাপার? এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলে যে?"

"ব্যবসাটা আজ বেশ ভালো হয়েছে। আজ সকালে গতরাতে তোমার সংগ্রহ করা কাগজের স্তূপ ঘাঁটতে-ঘাঁটতে তার ভেতর থেকে যা পেলাম তা হলো চীনের সম্রাটের কাছে কোরিয়ার রাজার পাঠানো মিংগ রাজত্বকালের কয়েকটা দরখাস্ত—প্রায় দশটি, প্রতিটার মূল্য হবে কমপক্ষে দশ ডলার। খরিদ্দারদের কাছ থেকে ওরা কত দাম পেতে পারে এটা দেখার জন্যে বিনিময় কেন্দ্রে আমি কয়েকটা দরখাস্ত ওদের দিয়ে দিয়েছি পরে আরও কতকগুলো নিয়ে যাব। আমি ডাকটিকিট দেওয়া আরও দুটো কাগজ পেয়েছি, যা দেখে অভিজ্ঞ লোকেরা বলেছেন ওগুলো সব সংগ রাজত্বকালের

কাগজ। ওগুলোর জন্য ওরা আমায় এখনই ষাট ডলার পর্য্যন্ত দাম দেবে বলেছে। কিন্তু আমার বেচতে ভয় হয়। কেন না দরটা অনেক কম হতে পারে। আমি তোমাকে সেগুলো একবার দেখাতে ফেরৎ নিয়ে এসেছি। দেখ……।"

পুঁটিলির উপরে কাপড়ের ঢাকার বাঁধন খুলে দলিল পত্র এবং টিকিট মারা কাগজ বার করে ফেলে। "এটা রাজার শীলমোহর।" টিকিটের ছাপ দেখিয়ে সে বলে।

"ঐ ছাপ ছাড়া ঐ কাগজের কোন বিশেষত্ব আমার চোখে ত পড়ছে না। চমৎকার বিদেশী কাগজ খুব সাদা হয়।" চুনতাও বলে, "ঐ রাজবাড়ীর কর্মচারীরা দেখছি আমারই মত অন্ধ।"

জিয়ানগাও হাসে। "ওরা যদি একটু কানা না হয় তাহলে আমাদের মত লোকেরা সব সময় কয়েক ডলার উপার্জন করবো কেমন করে?"

পুঁটলিটা সে আবার বেঁধে ফেলে। "আমি বলি কি বৌ… ।"

চুনতাও তীক্ষ্ণভাবে তার দিকে তাকায়। "আমি বলে দিয়েছি ও নামে আমায় তুমি ডাকবে না।"

জিয়ানগাও তার গলার স্বরে কোন পাত্তাই দিল না। "তুমিও ত আজ সকাল সকাল ফিরেছো দেখছি। ব্যবসায়টা তোমারও নিশ্চয় খারাপ হয় নি।"

"গতকালের মত আজও একঝুড়ি কাগজ নিয়ে এসেছি।"

"বলছিলে না যে ওখানে আরও কাগজ রয়েছে?"

"ওরা সেগুলো সকালের বাজারে পাঠিয়ে দিয়েছে ছোলা-বাদামের ব্যাগ হিসাবে ব্যবহার করার জন্যে।"

"বাদ দাও। আজ আমাদের ব্যবসায় খুব ভালো হয়েছে। এই সর্ব প্রথম একদিনে তিরিশ ডলারেরও বেশী মূল্যের ব্যবসায় করেছি। আবার দেখ বিকেলে আমরা দুজনে একত্রে প্রায়ই বাড়ী থাকিনা—আজ আছি। আমরা চলোনা কেন দশটি মাঠের হ্রদের মেলাপ্রাঙ্গনে খানিক বেড়িয়ে আসি। জায়গাটা চমৎকার ও ঠাণ্ডা।"

সে বাড়ীর ভিতর ঢুকে টেবিলের উপর পুঁটলিটা রাখে। চুনতাও ওর পেছু পেছু ঘরে ঢোকে। সে বলে, "ওখানে রাখা যাবে না। আজ আমাদের এক অতিথি এসেছে। ভেতরের ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে জিয়ানগাওকে ঘাড়নেড়ে ডাকে ভেতরে যাও।"

জিয়ানগাও ঘরের ভেতরে যায়, তার ঠিক পেছনে চুনতাও।

জিয়ানগাওকে সে বলে, "ইনি আমার পূর্বতন স্বামী।" আর লি মাওকে বলে, "আমার সহকর্মী।"

দুজনের এইবার চাক্ষুস মিলন হলো। যদি ওদের চোখের মণি দুটো সমদূরত্বে রাখা যেত তাহলে দুজনের লাইনটা সমান্তরালে থাকতো। দুজনেই নির্বাক। এমন কি জানলার ধারটায় বসে থাকা মাছিটাও চুপ। কয়েকটা মুহুর্তের জন্য ঘরটা একেবারে নিস্তব্ধ।

বিনম্রভাবে জিযানগাও জিজ্ঞেস করে। মহাশয়ের নাম? "যদিও সে ভাল করে তার নাম জানে।"

তারা গালগল্প সুরু করে দেয়।

চুনতাও বলে, "আমি বাজারে যাচ্ছি। কিছু কিনে আনি গে। তুমিও নিশ্চয় কিছু খাও নি, চাটুতে ভাজা পেঁয়াজের পিঠে চলবে ত?"

"আমার খাওযা হযে গেছে। তুমি এখানে থাকো। আমি বরং কেনাকাটা করে আনি গে।"

চুনতাও তাকে ঠেলে বিছানায় বসিয়ে মুচকি হেসে বলে, "তুমি ঘরে থাকো আর অতিথির দেখাশুনা করো।" সে বাইরে চলে যায়।

দুটি লোক একা বসে থাকে—ঘরে। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে, যদি তারা পরস্পরকে পছন্দ না করতো তাহলে তারা দুজনেই লড়াই করে মারা পড়তো। সৌভাগ্যক্রমে তারা পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরী করে নিল। আমাদের এটা ভাবা ঠিক হবে না যে যেহেতু লি মাও-এর পা নেই তাই সে লড়তে অক্ষম। আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে জিয়ানগাও-এর গত চার পাঁচ বছরে একমাত্র শারিরিক ব্যায়াম ছিল কলম চালাই করা। ওকে হত্যা করার মত যথেস্ট শক্তি লি মাও ধরে। ওর যদি একটা বন্দুক থাকতো তাহলে কাজটা খুব সহজ হত। একবার ঘোড়া টিপলেই জিয়ান-গাও পরপারের সেতু পার হয়ে যাবে।

জিযানগাওকে লি মাও জানায় যে চাষের ব্যস্ততা পূর্ণ সময়ে তার বাবা চুনতাও-এর বাবাকে ক্ষেতে সাহায্য করতো এবং ওরা দুজনে পরস্পরের ঘনিস্ট বন্ধু ছিল। লি মাও-এর ক্ষ্যাপাটে স্বভাবের জন্য চুনতাও এর বাবার আশংকা ছিল সে হয়ত সেনা বাহিনীতে যোগ দেবে। সে এখানে থাকবে এবং স্থানীয় কৃষকদের রক্ষা করবে—এটা সুনিশ্চিত করার জন্য বৃদ্ধ তার মেয়ের সাথে লি মাও-এর সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়। এটা এমন একটা ব্যাপার যা আগে কখনও চুনতাও তাকে উল্লেখ পর্য্যন্ত করে নি। লি মাও তারপর কিছুক্ষণ আগে তার এবং চুনতাও এর মধ্যে যে কথোপকথন হয় তাকে

বলে দেয়। এবং তার যে প্রশ্নকে কেন্দ্র করে কথাবার্তা সুরু হলো তাদের মধ্যে, সেটা উভয়েরই ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

বিষণ্ণ বদনে জিয়ানগাও বলে, "এখন যখন তোমাদের স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে পুনর্মিলন হয়ে গেছে তখন অবশ্যই আমায় চলে যেতে হবে।"

"না। অনেকদিন আমরা বিচ্ছিন্ন ছিলাম। আর এখন ত আমি পংগু। ওকে খাওয়াতে পড়াতে এখন আর আমি পারবো না। কোন কাজেই আর লাগ্‌বো না আমি। তোমরা এতদিন ধরে এক সঙ্গে থেকে আসছ। সেটা আমি ভেঙ্গে দেব কেন? আমি বরং পংগুদের জন্যে যে বাড়ী আছে সেখানে চালে যাব। শুনেছি সে রকম নাকি একটা বাড়ী এখানে রয়েছে। ঠিক ঠিক যোগাযোগ করতে পারলে ওখানে আমার একটা জায়গা মিলে যেতে পারে।"

জিয়ানগাও ত অবাক্! যাকে সে একজন রুঢ় সেনা হিসাবে ধরে নিয়েছিল তার কাছ থেকে এত উদার ব্যবহার সে আশাই করে নি। কিন্তু তার মনের দিক থেকে এ ব্যাপারে সায় থাকলেও মুখে কিন্তু সে অনবরত অস্বীকার করে চলে। এ ধরনের বিনম্র ভণ্ডামি সেই সব লোকদের বেশ ভালো ভাবেই জানা আছে, যাদের কিছু কিছু কেতাবি পড়াশুনা আছে।

জিয়ানগাও জবাব দেয়, "এটা কিন্তু ঠিক না। আমি বৌ-চোর বলে পরিচিত হতে চাই না। এবং তোমার নিজের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে তোমারও উচিত হবে না নিজের বৌকে অন্য লোকের সঙ্গে থাকতে দেওয়া।"

"ওর উপর আমার দাবী পরিত্যাগ করলাম বলে কাগজ লিখে দিতে পারি বা ওকে বিক্রী করে দিলাম বলে রসিদ কেটে দিতে পারি। যে কোন ভাবেই এ কাজ করা যেতে পারে।" মুচকি হেসে লি মাও বলে। তার কথার সুরে আন্তরিকতার আভাস।

"তার উপর তোমার দাবী বর্জন করবে কেমনভাবে? সে-ত কোন অন্যায় করে নি। তার মুখ কলংকিত হোক তা আমি চাই না। তাকে কিনে নেবার ক্ষেত্রে—অত টাকা কোথায় আমার? আমার যা কিছু টাকা আছে সবই ত ওর রোজগারের।"

"আমার টাকার দরকার নেই।"

"কি চাও তাহলে?"

"কিছুই চাই না।"

"তাহলে বিক্রী করার রসিদ দেবে কেমন করে?"

কেন না আমরা যদি মৌখিক ভাবে রাজী হয়ে যাই তাহলে অন্য কোন প্রমাণের দরকার নেই। পরে আমি দুঃখ পেতে পারি বা আমার মত পরিবর্তন হতে পারে। তখন সেটা একটা বিশ্রী দেখাবে। এত স্পষ্টভাবে কথা বলার জন্যে আমায় ক্ষমা করো, কিন্তু এ ব্যাপারে ফয়সলা করতে গেলে এটাই সর্বোতকৃষ্ট পন্থা পরবর্তীকালের জন্য ভালো ভালো গালগল্প তোলা থাক।

চুনতাও মিষ্টি রুটি আর তিলবীজ কিনে ফিরলো। ওরা খোলামনে কথাবার্তা কইছে দেখে সে খুব খুসী।

"সাম্প্রতিক কালে আমাদের সাহায্য করার জন্যে একটা লোকের কথা অনেক ভেবেছি।" সে জিয়ানগগাওকে বলে। "এখন সে ভাগ্যের কি যোগাযোগ দেখ-লি মাও এর। যেহেতু সে হাঁটতে পারে না তাই সে ঘরে থাকবে—কাগজ ঘেঁটে ঘেঁটে বাছাবাছির কাজ করতে পারবে। তুমি হবে আমাদের বাইরের বিক্রেতা। আমি এখনও বাজে কাগজ কুড়িয়েই চলবো। আমরা তিনজনে মিলে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবো।"

লি মাও কোন জবাব দিলনা। একটা মিষ্টি রুটি ও খানিকটা তিলবীজ তুলে সে পেটুকের মত গোগ্রাসে গিলে চলে। তাকে দেখে মনে হয় সে বুঝি অনশনের জগৎ থেকে এই মাত্র বেড়িয়ে এসেছে তাই তার কথা বলার সময়টা পর্য্যন্ত নেই।

"দুটি পুরুষ ও এক নারী—মিলে একটা কোম্পানী। আর তুমি দেবে পুঁজি।" অপ্রয়োজনীয় ভাবে জিয়ানগাও বলে।

"ব্যাপার কি ? তোমার মত নেই ?"

"অবশ্যই ! অবশ্যই। আমার কোন আপত্তি নেই।" সে মনে কি ভাবছে তা প্রকাশ করতে জিয়ানগাও নিজেকে ঠিক তৈরী করতে পারছে না।

"আমি কি করবো ? সারাদিন ঘরে বসে বসে কি কাজটা আমি করবো !" লি মাও কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। সে জিয়ানগাওর কথার অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছে।

"তোমরা দুজনে সহজ হবার চেষ্টা করো ত ? আমি সব ঠিক ঠাক করে দিচ্ছি।"

জিয়ানগাও অস্বস্তিকরভাবে ঠোঁটটা একটু ভিজিয়ে নেয়। লি মাও খেয়ে চললেও চোখ দুটো তার কিন্তু নিবদ্ধ চুনতাও-এর উপর। চুনতাও কি বলতে চায় তা শোনার অপেক্ষায় সে আছে।

বাজে কাগজ সংগ্রহ করা এমন একটা পেশা যেখানে মেয়েরা একটা গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। চুনতাও অনেক আগেই একটা পরিকল্পনা ছকে রেখেছে। লি মাও বাড়ীতে থেকে কাগজ থেকে ব্যবহৃত ডাক টিকিট ও খালি সিগারেট প্যাকেট থেকে ছবির কার্ড সংগ্রহ করে রাখবে। এই কাজের জন্য যা প্রয়োজন তাহলো হাত ও চোখ এবং তা লি মাও-এর আছে। সে হিসেব করে দেখেছে যদি সে প্রত্যেক দিন একশত বা ঐ সংখ্যায় সিগারেট প্যাকেট থেকে ছবি সংগ্রহ করে তাহলে তার নিজের খাওয়ার খরচ উঠে আসবে। যদি প্রত্যেকদিন সে দুটো কি তিনটে তুলনামূলকভাবে দুষ্পাপ্য ডাকটিকিট কাগজ ঘেঁটে বার করতে পারে ত ব্যাপারটা আরও ভালো হয়। বেজিং-এ প্রত্যেকদিন দশ হাজার প্যাকেট বিদেশী সিগারেট বিক্রী হয়। বিদেশী সিগারেট প্যাকেট হচ্ছে সেই রকম প্যাকেট যার ভেতরে পারিতোষিক পাবার ছবি ও কার্ড থাকে। চুনতাও ভাবে খুব কষ্ট স্বীকার না করে ও অন্তত: ১২ প্যাকেট সে সংগ্রহ করতে পারবে। জিয়ানগাও মনোযোগ দিতে পারবে বিখ্যাত লোকদের লেখা চিঠি এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিষ খোঁজার কাজে। বলাই বাহুল্য যে সে এ কাজে বেশ দক্ষ হযে উঠেছে এবং তাকে পরিচালনা করার কোন প্রয়োজন নেই আর। চুনতাও নিজে ভারী কাজ করতে পারবে। বড় রকমের ঝড় জল না হলে সে রোজ কাজে বেরুতে পারবে। সে ঠাণ্ডাই থাকুক আর জোর বাতাসই দিক। আসলে খারাপ আবহাওয়ায় কাজে বেড়ানোর ব্যপারটার বিশেষ সে জোর দেবে—কেন না ঐ সব দিনে ওর অনেক প্রতিযোগী ঘরে থাকে।

"জানালা দিয়ে সূর্য্য দেখে চুনতাও হিসেব করে দেখলে যে এখনও দুটো বাজে নি। উঠোনে নেমে গিয়ে সে ছেঁড়া খড়ের টুপি মাথায় দিয়ে তারপর দরজা দিয়ে জিয়ানগাওকে ডাকে।

"জানতে চাচ্ছি যে রাজপ্রাসাদ থেকে বাজে কাগজ বাইরে ফেলে দিয়েছে কি? ওর দিকে একটু নজর রেখো। আজ রাতে ফিরে আরও কিছু কথাবার্তা কইবো।"

জিয়ানগাও জানে যে ওকে চেষ্টা করে ধরে রাখা নিরর্থক। তাই সে ওকে যেতে দেয়।

চুপচাপভাবে বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। কিন্তু দুই পুরুষ ও এক নারী ইঁটের তৈরী খাটে এক সঙ্গে ঘুমানো কি রকম যেন একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। বহু কর্তৃকা বিবাহের মতবাদে বিশ্বাসী লোকের

সংখ্যা পৃথিবীতে খুব একটা বেশী নেই। অবশ্য তার অনেক কারণের মধ্যে একটা হলো—গড়পরতা পুরুষ মানুষ তার স্বামীত্ব এবং পিতৃত্বের ব্যাপারে তার অধিকার সম্বন্ধে তাদের আদিম ধারনা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। এইসব ধ্যানধারণা থেকে আমাদের সব আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি অভ্যাস তৈরী হয়েছে। আসলে আমাদের সমাজে কেবলমাত্র পরজীবি ও শোসকের দল এইসব তথাকথিত রীতিনীতি মেনে চলে; যে সমস্ত মানুষকে জীবিকার জন্যে পরিশ্রম করতে হয় তাদের হৃদযে এই ধরণের লোকের প্রতি শ্রদ্ধা খুব কমই থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ চুনতাও-এর কথাই ধরা যাক্। সে একজন বধিষ্ণু পরিবারের প্রবীণা রাশভারী মহিলা নন; আবার ফ্যাসন-প্রিয় তরুণীও নন। তাঁকে জমকালো কোন নাচ ঘরে নাচতে যেতে হয়না. আবার কোন বড় সামাজিক অনুষ্ঠানে অভ্যর্থনাকারিনী হিসেবে ভূমিকা পালন করার সুযোগ তার হবে না। কেউই তার চরিত্র নিযে প্রশ্ন তোলেনি বা সমালোচনাও করেনি। এমনকি তারা যদি তা করেও তাহলে তার বয়ে গেছে। কেবল তার আসা যাওয়ার ব্যাপারে পুলিশ মাথা ঘামায়।

দুই পুরুষ। কয়েক বৎসরের স্কুলের শিক্ষায় শিক্ষিত জিয়ানগাও এর প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক দাশনিকদের তত্ত্বের সম্বন্ধে ভাসা ভাসা জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু সে ব্যাপারে একটা বাহ্যিক ঠাটঠমক বজায় রাখার সামান্যতম আগ্রহ দেখানো ছাড়া সেও চুনতাও-এর মতই। সময় সময় সে একটু অন্যভাব দেখালেও, আসলে সে চুনতাও-এর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল তার কাছে মেয়েটার কথাই আদেশ। সে মেয়েটার বাধ্য কেননা তাতে তার উপকারই হয। চুনতাও তাকে ঈর্ষাপরাযণ হতে বারণ করে, তাই সে ঈর্ষার বীজটা পর্যন্ত সড়িয়ে রাখে।

লি মাও-এর দাবী অতি সাধারণ। যদি জিয়ানগাও এবং চুনতাও তাকে একদিনের জন্যেও ওদের সঙ্গে থাকতে দেয তাহলে সে একদিনই থাকবে। ওকে যদি তারা আত্মীয় বলে গ্রহণ করে তাহলে সে কৃতার্থবোধ করবে। এত ঘোরাঘুরির ফলে যে কোন সেনা তার দু একটা বৌ হারাতেই পারে। লি মাও-এর সমস্যা এক ধরণের নিজেকে প্রকাশ হওয়ার সমস্যা।

যাই হোক্, জিয়ানগাও ঈর্ষাপরায়ণ নয় তাহলেও ক্রমে ক্রমে দুজনের মধ্যে অসংখ্য বিরক্তিকর ব্যাপার দেখা দিতে লাগলো।

যদিও তখনও পর্যন্ত গরমকালটা দম বন্ধ করা গরমই বটে তাহলেও চুনতাও এবং জিয়ানগাও ঠিক সে ধরণের লোক নয় যারা কেবলমাত্র দুটি

ভোগ করতে কোথাও চলে যান। তাদের কাজ চালিয়ে যেতেই হবে। বাড়ীতে বসে লি মাও ব্যবসাটা বুঝতে চেষ্টা করে। এরই মধ্যে সে বাজে কাগজের ভেতর পার্থক্য করে বলে দিতে পারে যে কোন কাগজটা বাথরুমে ব্যবহার করার জন্য কাগজ প্রস্তুতকারকের কাছে পাঠাবে, আর কোনটা সে রেখে দেবে জিয়ানগাও-এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য।

একদিন চুনতাও ঘরে ফিরে দেখে যে জিয়ানগাও আগেকার মতই তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। এখনই অনেক দেরী হয়ে গেছে এবং ঘরে ঢুকতেই ধূপের গন্ধ পায়।

"কবে থেকে আমরা আবার মশা তাড়ানোর ধূপ জ্বালাতে শিখলাম" সে একথা বলে গাছতলায় বসে থাকা জিযানগাও কে উদ্দেশ্য করে। এ ব্যাপারে একটু সাবধান না হলে সমস্ত বাড়ীটাই পুড়ে ছাই করে দেবে দেখছি।

জিযানগাও জবাব দিল না কিন্তু লি মাও জবাব দিল, "আমরা মশা তাড়ানোর চেষ্টা করছি না, বাতাসটাকে পরিশোধিত করে নিচ্ছি। জিযানগাওকে ওটা আমিই জ্বালাতে বলেছি। আজ রাতে আমি বাইরে শোবার কথা ভাবছি। ভেতরে ভীষণ গরম : আর একসঙ্গে তিনজনে শোযা বেশ অস্বস্তিকর।"

"টেবিলে রাখা লাল কার্ডটা কার?" টেবিল থেকে কার্ড তুলে সে জিজ্ঞেস করে।

ইঁটের খাট থেকে লি মাও বলে, "আজ আমাদের ও ব্যাপারে পাকা কথাবার্তা হয়ে গেছে। তুমি জিযানগাও-এর কাছে থাকবে। সেটাই আমাদের বিক্রীর সর্ত।"

"ও! তাহলে এ ব্যাপারে তোমরা নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিযেছ, বেশ। তবে শুনে রাখো আমার হাত বদল হওয়াটা শুধু তোমাদের উপর নির্ভর করছে না।" লাল কার্ড হাতে নিয়ে লি মাও-এর কাছে গিযে জিজ্ঞেস করে, "ওটা কি তোমার বুদ্ধি না তারই?"

"আমরা দুজনেই এটা চাইছি। যে ভাবে আমরা বাস করছি তাতে আমি খুসী নই আর সেও নয়।"

"বলে যাও! বলে যাও!! যাই করো না কেন ব্যাপারটা সেই একই থাকছে। কেন তোমরা সব সময় এই স্বামী স্ত্রী ব্যাপারটা নিয়ে এত চিন্তা করো?" প্রচণ্ড রাগে সে লাল কার্ডটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয়। "কত দামে আমায় বেচলে?"

"বিক্রী ব্যাপারটা দেখানোর জন্য আমরা শুধু একটা সংখ্যা বসিয়েছি মাত্র। কোন প্রকৃত মানুষ বিনা পয়সায় তার বৌকে ছেড়ে দেয় না।"

"কিন্তু সে যদি মেয়েটাকে বেচে দেয় তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে ত? নাকি?" সে জিয়ানগাও এর কাছে যায়। তুমি ত এখন টাকা পেয়েছ। তাহলে এতদিনে একটা বৌ কেনার সঙ্গতি তোমার হয়েছে, "বলো, কেন তাহলে একটু বেশী খরচ করে তুমি……?"

"ওভাবে কথা বলোনা। ওভাবে কথা বলো না। "জিয়ানগাও অনুনয় করে বলে।" তুমি বুঝতে পারছনা চুনতাও। গত কয়েকদিন ধরে আমাদের ব্যবসার লোকেরা হাসাহাসি করছেন—?"

"হাসাহাসি করছেন!"

"হ্যাঁ…।" জিয়ানগগাও টেনে টেনে বলে। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে তার মনে এই ব্যাপারে কেমন যেন দৃঢ়তা সে পাচ্ছেনা। দশটি ক্ষেত্রের মধ্যে অন্ততঃ নয়টা ক্ষেত্রে চুনতাও যেমনটি চেয়েছে সে তাই করেছে। সে জানে না তার উপর চুনতাও এর এত প্রভাব কেন? কোন কোন সময় সে আগে থেকে ঠিক করে রাখতো কোন কাজ হয়ত এই ভাবে নয়ত অন্যভাবে করবে; কিন্তু তার সামনা সামনি হতেই—চুনতাও যেন রাণী, তার আদেশ সে মানতে বাধ্য।

"তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তুমি যে একজন শিক্ষিত লোক—যেহেতু কয়েকটা বই তুমি পড়েছো—এ কিছুতেই ভুলতে পারছ না যেহেতু তোমায় কে না কে বকবে বা হাসাহাসি করবে তাই তুমি মরমে মরে যাচ্ছ আর কি?"

সেই আদি কাল থেকে জনসাধারণের উপর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ সাধু সন্ন্যাসীদের উপদেশের মারফৎ প্রয়োগ করা হয় না; প্রয়োগ করা হয় চাবুকের ঘায়ে এবং গালাগালির সাহায্যে। গালিগালাজ আর মারধোর —এ দুটির সাহায্যে আমাদের চালু রীতিনীতি বজায় রাখা হয়। কিন্তু চুনতাও-এর মানসিকতায় সে সব সময় এ সবের প্রত্যুত্তর দিতে প্রস্তুত। "একটা গালাগালের বদলে আর একটা গালাগাল; একটা ঘুঁসির বদলে আরেকটা ঘুঁসি।" কোন দুর্বলতা প্রদর্শন নয়। কারুকে সে যেমন খোঁটা দেবে না, সেও কারুর কাছ থেকে অপমান সহ্য করতে চায় না। একবার শোনো সে কি ভাবে জিয়ানগাওকে নির্দেশ দিয়েছিল, তাহলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে ঃ—

"কেউ যদি তোমায় দেখে হাসাহাসি করে তবে তাকে তুমি মারলে

না কেন? তোমার আবার ভয়টা কিসের? আমরা কি করবো আর কি করবো না তা দেখার দায়িত্ব অন্য লোকের না।"

জিয়ানগাও নিরব।

"এ নিয়ে আর আমাদের কথা না বলাই ভালো। আমরা তিনজনে মিলে একত্রে থাকি না কেন—যেমন এখন আছি।"

ঘরটা একেবারে নিশ্চুপ। রাতে খাওয়ার পরে আজও অন্যদিনের মত গাছতলায় বসে—কিন্তু আজ দুজনাই অস্বাভাবিক ভাবে চুপচাপ। সারাদিনের ব্যবসায় থেকে পাওয়া কোন লেখা থেকে আজ কোন আবৃত্তি করলো না তারা।

লি মাও চুনতাওকে ঘরে ডেকে নেয়। সে তাকে অনুরোধ করে যাতে করে সে সরকারী ভাবে জিয়ানগাও-এর বউ হয়। সে বলে যে চুনতাও পুরুষ মানুষের মনস্তত্ব বোঝে না। কেউই চায় না অসতীর স্বামী হতে, আবার কেউ বৌ চোর নামে পরিচিত হতে চায় না। সে লাল কার্ডটা—যা ইতিমধ্যেই বাদামী রংএ পরিণত হতে চলেছে—তুলে চুনতাও এর হাতে দেয়।

"এটা আমাদের বিয়ের সার্টিফিকেট। যে রাতে আমরা পালালাম সে রাতে আমি বাড়ীতে-সে ঘরে পূর্বপুরুষদের ব্যবহৃত পোষাক রাখা থাকে—সেখান থেকে ওটা নিয়ে শার্টের ভেতরে রেখে দিয়েছিলাম। এটা এখন তোমায় ফেরৎ দিলাম। অতএব এখন থেকে আর আমরা বিবাহিত বলে গণ্য হব না।"

চুনতাও কোন কথা না বলে কার্ডটা তার হাত থেকে গ্রহণ করলো। তার দুটো চোখ নিবদ্ধ ইঁটের খাটের উপর পাতা মাদুরটার উপর। সে তার অথর্ব স্বামীর পাশে বসে পড়ে।

"এটা ফিরিয়ে নাও। এটা আমি চাই না, প্রিয়তম মাও। আমি এখনও তোমার বৌ, এক রাতের বিয়ে একশ দিনের পরম সুখ। আমি কি ধরণের মানুষ হিসেবে গণ্য হব যদি তোমায় আমি অথর্ব, চলতে পারবে না, কাজ করতে পারবে না বলে—ঠেলে ফেলে দি।"

ইঁটের খাটের উপর সে লাল কার্ডটা নামিয়ে রাখে।

লি মাও ভীষণ বিচলিত। চাপাস্বরে সে বলে, "দেখতে পাচ্ছি যে তুমি ওকে বেশ পছন্দ করো। তুমি বরং ওর সাথে থাকো। আমরা যখন কিছু অর্থ সঞ্চয় করতে পারবো তখন তুমি আমায় গাঁয়ে পাঠিয়ে দিও। বা কোন পঙ্গুদের আশ্রমে পাঠিয়ে দিতে পারো।"

"এ কথা সত্য যে গত কয়েক বছর ধরে আমরা এক সাথে থেকেছি এবং আমরা একত্রে বেশ ভালোই ছিলাম।" চুনতাও নরম সুরে বলে, "ওকে যদি চলে যেতে হয় ত আমার ভীষণ মনে লাগবে। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখি ও কি ভাবছে।"

জানালা থেকে চুনতাও ওকে ডাকলো 'জিয়ানগাও। জিয়ানগাও।' কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। সে বাইরে বেরিয়ে গেল। জিয়ানগাও সেখানেও নেই। এই সর্ব প্রথম সে একাকী রাতে ঘরের বাইরে গেল। চুনতাও ভীষণভাবে আশ্চর্যান্বিত। ও বাড়ীর দিকে মুখ করে চীৎকার করে বললে, "যাই ওকে খুঁজে আসি গে।"

চুনতাও নিশ্চিত যে জিয়ানগাও গলির মোড়ে রয়েছে। কিন্তু বৃদ্ধ উও-এর সঙ্গে দেখা হতে সে জানায় যে সে ওকে বড় রাস্তার দিকে যেতে দেখেছে। সে তার প্রতিটা পরিচিত আড্ডায় খোজ করে, কিন্তু কোথাও জিয়নগাও-এর দেখা মিললো না। একটা লোককে হারিয়ে ফেলা খুব সোজা। যদি একবার সে দৃষ্টির বাইরে চলে যায় ত সে মিলিয়ে যাবে—তার কোন চিহ্ন না রেখে।

রাত প্রায় একটায় সে বিষণ্ণ মনে ফিরে আসে। ঘরে তেলের আলো অনেক আগেই নিভে গেছে।

"ঘুমিযে পড়লে নাকি? জিয়ানগাও কি এতক্ষণে ফিরেছে?" সে জানতে চায়। দেশলাই কাঠি জ্বেলে তেলের আলো জ্বালিয়ে ঘরে তাকিয়েই তার দেহের ভেতর দিয়ে আতঙ্কজনিত শীতল কিছু একটা বয়ে গেল। জানালার জাফরিতে বেল্ট বেঁধে লি মাও ঝুলে পড়েছে। সে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়ে উপরে উঠে সে বিছানায় তাকে নামিয়ে আনে। সৌভাগ্যবশতঃ ও খুব অল্পক্ষণই ঝুলেছে। তাই সাহায্য প্রার্থনার জন্য হাঁকডাক পাড়ার প্রয়োজন হল না। তার বুকে ঘন ঘন মালিশ করতেই সে ক্রমে বেঁচে ওঠে।

অন্য কোন লোকের জন্য আত্মোৎসর্গ করা হচ্ছে দুঃসাহসিক বীরের কাজ। মাও যদি দুটো পা না হারাতো তাহলে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করার তার কোন প্রয়োজন দেখা দিত না; কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে সে ভেবেছে যে তার জন্য অল্প পরিমাণই আশা রয়ে গেছে। তাই সবচেয়ে ভালো কাজ হচ্ছে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া তাহলে চুনতাও শান্তিতে বাস করতে পারবে।

যদিও চুনতাও তাকে ভালোবাসেনি কিন্তু তার জন্যে একটা কর্তব্য-বোধ রয়ে গেছে। সে তাকে সান্ত্বনা দেয়, ভরসা জোগায় এবং তার সঙ্গে

কথা বলেই চলে সকালের আকাশে আলো ফোটার সময় পর্যন্ত। সবশেষে সে ঘুমিয়ে পড়লে চুনতাও বিছানা থেকে নেমে পড়ে। মেঝেতে পড়ে থাকা পোড়া লাল কার্ডের অবশেষ তার চোখে পড়ে। তাদের বিবাহের সার্টিফিকেটটার দিকে সে আবেগভরে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে।

সেদিন সারাটা দিন সে বাইরে গেল না। বিকালে সে ইঁটের খাটের উপর লি মাও-এর পাশে এসে বসে।

সে তাকে জিজ্ঞেস করে, "কাঁদছ কেন?" দুগাল বেয়ে তার চোখে জলের ধারা নামে।

"তোমার প্রতি আমি অন্যায় আচরণ করেছি। আমি এখানে কি জন্য এসেছি?"

"তোমায় ত কেউ দায়ী করছে না।"

"সে এখন চলে গেল, আর আমার একটা পা-ও নেই।"

"ওভাবে চিন্তা করা তোমার ঠিক না। ও ঠিক ফিরে আসবে।"

"আমিও তাই আশা করি।"

আরেকটা দিন পার হয়ে গেল। পরদিন সকালে বিছানা ছেড়ে উঠে বাগান থেকে কয়েকটা শশা তুলে এনে তার ছাল ছাড়িয়ে ফালি ফালি করে কেটে রাখে। অসাবধানে সে কতক জিনিষ এলোমেলোভাবে মিশিয়ে চাটুতে ভেজে একটা বড় পিঠে বানালে। তার সঙ্গে কিছু শশা রেখে সেটা ইটের পাশে ছোট টুলটার উপর রাখে। তারপর সে আর লি বসে বসে খাবারটা শেষ করলো।

তারপর চুনতাও ভাঙ্গা খড়ের টুপি মাথায় চড়িয়ে পিঠে ঝুড়িটা বেঁধে নেয়।

"মন মেজাজ আজ তোমার ভালো নেই। বাইরে আজ নাই বা গেলে।" লি মাও কথাকটি তাকে জানালা দিয়ে বলে।

"বাড়ীতে বসে থাকলে আরও খারাপ লাগবে।"

ধীর পদক্ষেপে সে ফটক পার হয়ে বাইরে চলে গেল। কাজ করাটা তার দেহের একটা অংশ বিশেষ। যদিও সে হতাশাগ্রস্ত এবং অখুশী তাহলেও তাকে কাজে যেতেই হবে। চীনা মেয়েরা একমাত্র যা বোঝে তা হলো কাজ করা। দেখে মনে হয় ওরা প্রেম বোঝে না। জীবনের ধরা বাঁধা রুটিনের সমস্যার মধ্যেই তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখে। প্রেমের প্রস্ফুটন হচ্ছে কেবল তাদের অন্ধ দম বন্ধ করা এক আবেগ বিশেষ।

অবশ্যই প্রেম হচ্ছে অবিমিশ্র একটা আবেগ। আর জীবনটা হচ্ছে

প্রকৃত বাস্তব সত্য। সিল্কের পর্দার আড়ালে আয়েস করে বসে বা গভীর অরণ্যের অভ্যন্তরে ফাঁকা নির্জন জায়গায় বসে প্রেম সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করার শিল্প হচ্ছে সমুদ্রগামী স্টিমার, "সাম্রাজ্ঞী" বা "প্রেসিডেন্ট" কর্তৃক বাইরে থেকে আমদানীকৃত। চুনতাও কখনও বিদেশে যায় নি; আবার বিদেশী অভিজাত বংশীয়দের দ্বারা পরিচালিত কোন স্কুলে লেখা-পড়াও সে করেনি। কেতাদুরস্ত প্রেম সে বোঝে না। সে যা কেবল বোঝে তাহলো যে. প্রেম হচ্ছে একটা অবর্ণনীয় নিস্তেজ যন্ত্রণা বিশেষ।

এ গলি সে গলি করে সে অনেক ঘুরে বেড়ালো। অসীম ধূলো আর সীমাহীন পথ তাকে গ্রাস করে। মাঝে মাঝে সে হাঁক দেয়, "বাজে কাগজ বদলে দেশলাই বাক্স নেবেন।" কোন কোন সময় সে একগাদা ফেলে দেওয়া বাজে কাগজের স্তূপ পেরিয়ে চলে যায়—সে দিকে ফিরেও তাকায় না। দু একবার হলো কি যে দু বাক্স দেশলাই দেবার বদলে সে দিয়ে ফেলে পাঁচটি দেশলাই বাক্স। সারাটা দিন ধরে পাগলের মত ঘুরে মেয়েটা বাড়ী ফেরে যেন এক কালো জামা পরা দাঁড়কাকটি হয়ে—পাখিটা কোন কর্মের নয়, কেবল কর্কশস্বরে চেঁচায় আর খাদ্য চুরি করতে পারে। চত্বরের ফটকটায় পুলিশের সেঁটে দেওয়া বাড়ীর নোতুন বসবাসকারীর পরিচয় পত্র। তাতে লেখা আছে ঐ বাড়ীর বসবাসকারীদের দায়িত্বে রয়েছেন জিয়ানগাও ও তার স্ত্রী চুনতাও।

উঠোনে পা দিতেই ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো জিয়ানগাও।

চুনতাও-এর চোখ ত ছানাবড়া, 'তুমি ফিরে এসেছ……।' সে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে এবং চোখের জলে গলা বুজে যাওয়ায় তার কথাও বন্ধ হয়ে যায়।

"তোমায় ছেড়ে কিছুতেই আমি চলে যেতে পারি না। আমার সমস্ত কিছুর জন্যে তোমার কাছে আমি ঋণী। আমি জানি তোমার কাজের সাহায্যকারি হিসাবে তুমি আমায় পেতে চাও। ভাই আমি অত বোকা…।"

উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সেও ঘুরে বেড়ায় দুদিন। তার মনে হয় সে যেন তার লোহার বেড়ী দিয়ে বাঁধা পা দুটো টেনে নিয়ে কষ্ট করে চলছে, লোহার বেড়ীর একটা প্রান্ত চুনতাও-এর কব্জীর সঙ্গে বাঁধা। ব্যাপারটা আরও খারাপের দিকে গেল, যখনই সে মেয়েটার ছবি দেওয়া সিগারেটের বিজ্ঞাপন দেখে তার মনে হয় ছবিটা চুনতাও-এর। তার দুঃখ এত যে সে ভুলে যায় যে তার ক্ষিধে পেয়েছে।

"জিয়ান গাও এর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেছে।" লি মাও বলে,

"সে এখন থেকে এ বাড়ীর বসবাসকারীদের দায়িত্বে থাকবে, আর আমি হব তার ভাড়াটে।"

সেই পুরানো দিনের মতই সে চুনতাও এর পিঠের থেকে ঝুড়ি নামাতে তাকে সাহায্য করে এবং সাথে সাথে হাত দিযে তার চোখের জল মুছে দেয়, বলে, "সবাই যদি আমরা গাঁযে ফিরে যাই ত লি মাও হবে বাড়ীর কর্তা, আমি হব তার ভাড়াটে আর তুমি হবে আমার বৌ।"

সে কোন উত্তর না দিয়া ঘরে ফিরে গেল এবং দরজায় টুপিটা ঝুলিয়ে দিয়ে অন্যান্য দিনের মত স্নান করতে চলে গেল।

আরেকবার চুনতাও আর জিযানগাও আগেকার মতই গাছতলায় বসে সারা দিনের ব্যবসায থেকে লেখা বর্ণনা করে চলে। তারা এ ব্যাপারে একমত হযেছে যে প্রাসাদ থেকে কাগজ বিক্রি করে কিছু অর্থ সঞ্চয় করে জনতার বাজারে একটা দোকান ঘর বানিয়ে নেবে জিযানগাও-এর জন্যে, হয়ত থাকার জন্য বড় ঘরও তারা তৈরী করিযে নিতে পারে।

একটা দেয়ালি পোকা গাছ থেকে নেমে এসে আলোর শীর্ণ শিখাকে নিভিয়ে দিয়ে গেল। লি মাও অকাতরে ঘুমুচ্ছে। আকাশের ঘন ছায়াপথ অনেক নিচে নেমে এসেছে।

"আমাদের এখন ঘুমানো উচিত। মেয়েটি বলে।

"বিছানায় গিয়ে তুমি শুয়ে পড়ো, আমি এক মিনিটের মধ্যেই আসছি মালিশ করে দেব।"

"প্রয়োজন নেই তার। কেন না আজ আমি বেশীদূর পর্যন্ত যাই নি। তাছাড়া কাল আমার খুব ভোরে উঠতে হবে। ব্যবসাটায যত্ন নিতে ভুলে যেও না যেন। গত কয়েকদিন ধরে আমরা ত লাভের মুখই দেখি নি।"

"দেখেছো! তোমায় সেটা দিতে ভুলে গেছি। আজ বাড়ী ফেরার পথে পুরানো জিনিস বিক্রির বাজারে যাই সেখানে তোমার জন্যে একটা টুপি কিনলাম মোটামুটি সেটাকে নোতুনই বলা চলে। এ ব্যাপারে কি ভাবছ? অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে টুপিটা পেয়ে জিয়ানগাও সেটা চুনতাও এর হাতে তুলে দেয়।

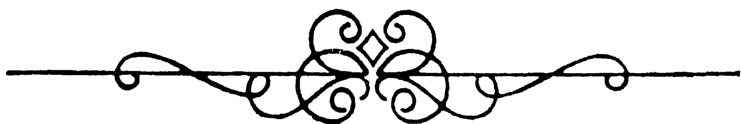
"অন্ধকারে কি করে দেখব? যাহোক কাল সকালে টুপিটা মাথায় দেব।

খোলা চত্বরে একটা গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এল। সুগন্ধি সাদা ফুলের সুবাস রাতের শান্ত বাতাসে হালকা ভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে। ঘরের ভেতরে নরম সুরে কথা ক্ষীণভাবে শোনা যায়

"বৌ.........।"

"ঐ কথাটা আমি শুনতে চাই না। আমি তোমার বৌ নই......।"

লেখক—জু দিশাণ



"ভাড়াটে বৌ"

লোকটা একজন চর্ম ব্যবসায়ী। গাঁয়ের পশু শিকারীদের কাছ থেকে চামড়া কিনে বাজারে বিক্রী করত। অনেক সময় তাকে আবার ক্ষেত-মজুরের কাজও করতে হত। গ্রীষ্মকালের প্রথম দিকে সে মজুর হিসেবে অন্য লোকের জমিতে ধানের চারা লাগাতো। সে এত চমৎকার ভাবে সোজা সারিবদ্ধ ধানের চারা জমিতে লাগাতে জানতো যে সব জমির মালিকরাই ওকে মজুর হিসেবে পেতে চাইত। কিন্তু এত পরিশ্রম করেও সংসার প্রতিপালনের মত যথেষ্ট অর্থ আয় করতে পারত না। তাই প্রতিবছর তার দেনা বাড়তেই থাকতো। তাই এই শোচনীয় ও হতাশা জর্জরিত পরিস্থিতি থেকে সাময়িক মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে সে মদ খাওয়া, জুয়ো খেলা শুরু করে। ক্রমে ক্রমে সে পরিণত হয় এক বদমেজাজী অসৎ লোকে। যত তার আর্থিক অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে ততই লোকজনে তাকে টাকা পয়সা—এমনকি কম পড়িমাণেও ধার দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

রোগ আসে দারিদ্রের সাথে হাত ধরাধরি করে। পেতলের ঢাকের মতই তার মুখে অসুস্থতার লক্ষণ স্বরূপ হলদে রংএর ছোপ লাগে। চোখের সাদা রং পরিণত হল হলদে রং-এ। গাঁয়ের লোকে বলতো ওর ন্যাবা হয়েছে। ছোট ছেলের দল মজা করে ওকে ডাকতো "হলদে লোক" বলে। একদিন সে তার স্ত্রীকে বললেঃ

"এ পরিস্থিতি থেকে বাঁচার ত কোন রাস্তাই দেখতে পাচ্ছি না। এবার বোধহয় হাঁড়ি কড়াই বেচতে হতে পারে। আমার আশঙ্কা হয়ত আমাদের দুজনকে পৃথক হয়ে যেতে হতে পারে। কেননা একসঙ্গে দুজনের অনাহারে মরার কোন মানেই হয় না।"

"আমাদের পৃথক হতেই হবে?" বিড়বিড় করে বলে তার স্ত্রীও উনুনের পাশে তিন বছরের শিশুকে নিয়ে বসে পড়ে।

ক্ষীণকণ্ঠে স্বামী উত্তর দেয়, "হ্যাঁ আমাদের পৃথক হতেই হবে। তোমায় এক ভদ্রলোক অস্থায়ী বৌ হিসেবে ভাড়া করতে চায়।"

"কি বললে?" মেয়েটির জ্ঞান লোপ পাবার মত অবস্থা।

কয়েক মুহূর্তের জন্য এই জায়গায় সম্পূর্ণ নিরবতা বিরাজ করে। আম্‌তা আম্‌তা করে লোকটা বলে চলে:

"দিন তিনেক আগে ওয়াংগ এখানে এসে অনেক সময় কাটিয়ে যায়। তার কাছে আমাদের দেনা শোধ কর্‌বার ব্যাপারে অনেক কিছু বলে গেল। সে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমিও বেরিয়ে পড়ি। ঐ জিম্মু লেকের ধারে ঐ গাছতলায় অনেকক্ষণ বসে রইলাম এবং শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিই। গাছ থেকে জলে ঝাঁপ দেব একথা বারবার চিন্তা করতে করতে আর আত্মহত্যা করা গেল না—এমন সময় একটা পেঁচাও ডেকে ওঠে। তাই ভয়টা হঠাৎ বেড়ে গেল। বাড়ী ফেরার পথে ঘটকী শ্রীমতি শ্যেন-এর সঙ্গে দেখা। তিনি জিজ্ঞেস করেন এত রাতে আমি কোথায় চলেছি। সেদিন যা যা ঘটেছিল সব ঘটনাই তাঁকে বললাম। শেষকালে বললাম যে উনি যদি ঐ পরিমাণ টাকা আমায় ধার দেন বা কোন মহিলার গহনা বা পোষাক এনে দেন যা আমি বন্ধক রেখে সেই টাকা দিয়ে ওয়াংগ-এর সব দেনা শোধ করে দি। তাহলে সে আমায় পাগ্‌লা নেকড়ের মত আর তাড়া করে বেড়াবে না।" সব শুনে শ্রীমতী শ্যেন বলেন:

"বৌটাকে ফালতু বাড়ীতে বেঁধে রেখেছ কেন? আর তাছাড়া তুমি ত ভীষণ অসুস্থ এবং দেহটা তোমার হল্‌দে হয়ে গেছে।"

মাথা নীচু করে বসে রইলাম। ওঁর কথার কোন জবাব দিই নি। তিনি বলে চলেন:

"যেহেতু তোমার একটিমাত্র সন্তান তাই তাকে ছেড়ে থাকতে তোমার অসুবিধে হবে। কিন্তু তোমার স্ত্রীর ক্ষেত্রে···।"

"আমার মনে হলো ঘটকী তোমায় বোধহয় বেচে দেবার কথা বলছেন। কিন্তু তা ত নয়।" তিনি বলে চলেন:

"অবশ্য এটা ঠিক যে ও তোমার আইন সঙ্গত স্ত্রী। ওদিকে তুমি আবার ভীষণ গরীব; মেয়েটাকে উপোস করিয়ে মেরে ফেলতে চাও নাকি?"

"তারপরই তিনি সরাসরি প্রস্তাব দেন, শোন, একজন শিক্ষিত পণ্ডিত লোক আছেন। বয়স প্রায় ৫০। ওর বৌটা বাঁজা। তাই তিনি সন্তান কামনায় এক উপপত্নী রাখতে ইচ্ছুক। কিন্তু এতে তাঁর বৌ-এর ভীষণ

আপত্তি। তিনি বলেছেন ঐ উদ্দেশ্যে তিনি কেবল তিন বছরের মেয়াদে কোন বিবাহিতা মেয়েকে ভাড়া হিসেবে রাখতে অনুমতি দিতে পারেন। আমাকেও সেই ধরণের মেয়ের সন্ধান চালাতে ওঁরা বলেছেন। বলেছেন মেয়েটীর বয়স ৩০ এর মধ্যে হতে হবে এবং দু-তিনটে সন্তানের জননী হলে ভালো হয়। বৌকে সৎ ও কর্মঠ হতে হবে এবং তাকে পণ্ডিতের স্ত্রীর বাধ্য থাকতে হবে। পণ্ডিতের বৌ বলেছেন যে মেয়েটা যদি তাঁদের মনোমত হয় তাহলে আশি থেকে একশ ডলার পর্যন্ত অর্থ দিতে তাঁরা রাজী। আমিও দিন কয়েক খোঁজ-খবর নিলাম। কিন্তু কপালটাই আমার মন্দ। যাই হোক্ তোমার বৌ হচ্ছে সেই বৌ যেরকমটা ওঁরা চাইছেন।"

"পরে উনি আমায় জিজ্ঞেস করেন এ ব্যাপারে আমি কি ভাবছি। চোখ ফেটে আমার কান্না আসে। উনি আমায় সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে এত সব কাণ্ড উনি আমার ভালর জন্য করছেন।"

এই পযন্ত বলে স্বামীটি চুপ করে যায়। মাথা হেঁট করে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকেন। ওঁর বৌও নিশ্চুপ বসে থাকেন। তারপর আবার বলে, "গতকাল শ্রীমতি শ্যেন আবার পণ্ডিতের বাড়ী গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে আমায় বলে গেলেন যে তোমার কথা শুনে ওঁরা তোমায় গ্রহণ করতে ভীষণ আগ্রহী। আরও বলেছেন এক্ষেত্রে ওঁরা আমাদের একশ ডলার পযন্ত দেবেন। আবার এও বলেছেন তুমি যদি ওঁদের একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম দাও তাহলে ওঁরা তোমাকে তিন থেকে পাঁচ বৎসর ওঁদের কাছে রেখে দেবেন। শ্রীমতি শ্যেন ওখানে যাবার দিন পর্যন্ত ঠিক করে এসেছেন। এ মাসের আঠারো তারিখে তোমার ওখানে যেতে হবে। তার মানে আজ থেকে ঠিক পাঁচ দিন পরে। চুক্তির ব্যাপারটা ওঁরা কিন্তু আজই সেরে ফেলতে চান।"

কাঁপা কাঁপা গলায় মেয়েটা বলে :

"এত সব কথা আমায় আগে বলো'নি কেন ?"

"এ ব্যাপারে তোমার সাথে আলোচনা করার জন্য তিন তিন বার চেষ্টা করি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সাহস পেলাম না। তারপর অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলাম যে তোমায় ভাড়া দেওয়া ছাড়া গতি নেই।"

দাঁতে দাঁত চেপে মেয়েটী বলে : "এসব কি পাকাপাকি ভাবে ঠিক হয়ে গেছে ?"

"খালি চুক্তি পত্রে সই হওয়াটা বাকি আছে।"

"মাগো ! এ ছাড়া অন্য কিছু কি আমরা করতে পারি না ?"

"স্বীকার করছি কাজটা খারাপ। ভেবে দেখো—একে আমরা গরীব, আবার সহজে মরতেও রাজী নই। এছাড়া কি করার আছে আমাদের? মনে হয় এবার চারা লাগানোর কাজে কেউ আমায় ডাকবে না।"

"চুন বাও—ওর কি হবে? ওর বয়স তো মাত্র তিন বৎসর, ওকে কে দেখবে! আমি না থাকলে?"

"আমিই ওর দেখাশুনা করবো; তোমার দুধ আর খায় না। অসুবিধে কিছু হবে না।"

লোকটার নিজের উপর রাগ এতো বেড়ে যায় যে সে ঘর থেকে বাইরে চলে আসে।

অশ্রুহীন চোখে ক্ষীণ স্বরে বৌ বলে! "কি বিভৎস জীবন আমাদের?" একদৃষ্টে মায়ের দিকে চেয়ে থেকে চুনবাও "মা, মা" বলে কেঁদে ফেলে।

এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার প্রাক্কালে মেয়েটা বাড়ীর সবচেয়ে অন্ধকার কোন বেছে নিয়ে বসে থাকে। উনুনের ঠিক সামনে খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে বাতিদান, প্রদীপের শিখা জোনাকির মত মিট্ মিট্ করে জ্বলছে। চুন বাও-এর চুলে নিজের চিবুকটা চেপে ধরে মেয়েটা নিজের চিন্তায় এত মগ্ন থাকে যে পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা তার কাছে মৃত বলে মনে হয়। অনেক পরে তার সম্বিত ফিরে এলে সে দেখে যে সে নিজেই সন্তান ও বর্তমানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"চুন বাও! চুন বাও!"

"কি মা?" শিশু উত্তর দেয়।

"কাল তোমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছি বাবা।"

"কি বললে?" মায়ের কথা শিশু ঠিক উপলব্ধি করতে পারে না; কিন্তু সহজাত প্রক্রিয়ায় সে মায়ের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে।

"তিন বছর-এর আগে আর ফিরছি না।"

মেয়েটা হাত দিয়ে চোখের জল মোছে। শিশুর কৌতূহল জাগে।

"মা তুমি কোথায় যাবে? মন্দিরে!"

"না বাবা। যাচ্ছি ৩০ 'লি' দূরে। সেখানে লি-দের পরিবারের সঙ্গে থাকবো।

"আমি তোমার সঙ্গে যাবো মা।"

"সোনা রে! তা ত হয় না।"

"কেন হয় না?" শিশু প্রতিবাদ করে।

"বাড়ীতে তুমি বাবার সঙ্গে থাকবে? বাবা তোমায় কত আদর

করবে। তোমার সঙ্গে খেলা করবে; তুমি বাবার কথা শুনবে—কেমন? তিন বছর পরে · ।"

"বাবা আমায় মারবে।"

"বাবা আর কখনও তোমায় মারবে না।" মেয়েটি বাচ্চার কপালের ডানদিকে এক কাটা জায়গায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দেয়। তার স্বামী কাস্তে দিয়ে আঘাত করে ঐ দাগটা করে দিয়েছিল।

তার ছেলের সঙ্গে আবার মেয়েটা কথা স্বুরু করতে যাবে ঠিক সেই সময় তার স্বামী ঘরে প্রবেশ করে। পকেট হাতরাতে হাতরাতে মেয়েটার কাছে এসে বলে ঃ

"ওদের কাছ থেকে সত্তর ডলার পেয়েছি। তুমি ওখানে পৌঁছানোর ঠিক দশ দিন পরে বাকি তিরিশ ডলার দিয়ে দেবে—ওরা বলেছে।"

খানিক নিরবতার পর স্বামী বলে, "ওরা পাল্কিতে করে তোমায় নিয়ে যাবে। কাল খুব ভোরে প্রাতরাশ সেরে তোমায় নিতে পাল্কি বাহকেরা আসবে।"

লোকটি আবার বাইরে চলে যায়।

সেই রাতে স্বামী স্ত্রী উভয়েই রাতের খাবার খায় নি।

* * *

পরদিন সকালেই বসন্তকালের ঝির্ঝিরে বৃষ্টি নাম্লো।

মেয়েটিকে নিয়ে যেতে অনেক ভোর থাকতেই পাল্কি বাহকেরা এখানে এসে হাজির। মেয়েটা সারারাত এক মুহুর্তের জন্যেও চোখের দুটো পাতা এক করে নি। সমস্ত রাতটাই তার কেটে গেল চুন বাও-এর পোষক সেলাই করতে। যদিও এখন বসন্তের শেষ ও গ্রীষ্মের শুরু, তা সত্ত্বেও সে মনস্থ করেছে যে এখনই সুতোর প্যাড দিয়ে তৈরী ছেলের শীতকালিন নোংরা পোষাক সেলাই করে স্বামীর কাছে দিয়ে যাবে। এ সব শেষ করে সে খানিক স্বামীর সাথে গালগল্পের আশায় তার পাশটিতে বসে। সে তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাই কি আর করা। নিদ্রিত স্বামীর পাশে বসে বসেই তার সারা রাত কেটে যায়। অনেক সাহস সঞ্চয় করে স্বামীর কানে কি যেন বিড়বিড় করে বলে—তাতে কিন্তু স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেনি। অতএব বৌ ও স্বামীর পাশে শুয়ে পড়ে।

মেয়েটার চোখে সবে ঘুম লেগেছে এমন সময় চুন বাও জেগে ওঠে। তার এখন বসার ইচ্ছে তাই সে মাকে জোরে জোরে ঠেলা মারে। উঠে বসে মা তাকে সাজিয়ে দেয়, বলে ঃ

"সোনা, আমি চলে গেলে কেঁদো না যেন! তাহলে কিন্তু বাবা মারবে। মিষ্টি কিনে দেবো। কিন্তু কান্না একদম বন্ধ। কেমন?"

চুন বাও এত ছোট যে তার দুঃখ সম্বন্ধে কোন উপলব্ধি জাগে নি। তাই কিছুক্ষণ পরেই সে তারস্বরে গান জুড়ে দেয়। ওর গালে চুমো খেয়ে মা বলে:

"গান থামা—বাবা জেগে যাবে যে।"

বাড়ীর ফটকের বাইরে বেহারারা এসে বেশ জমিয়ে পাইপ টানছে এবং নিজেদের মধ্যে গালগল্প করছে। কাছের গাঁ থেকেই শ্রীমতি শ্যেন ভোরেই এসে উপস্থিত। মহিলা একজন পাক্কা ঘটকি। পোষাক থেকে বৃষ্টির জল ঝারতে ঝারতে ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে স্বামী স্ত্রী দুজনের উদ্দেশ্যেই বলেন:

"যাত্রার সময় যখন বৃষ্টি হচ্ছে তখন বুঝতে হবে শুভ লক্ষণ। কাল থেকে তোমার কপাল খুলো যাবে—দেখে নিও।"

হৈ হৈ করে সারা ঘরটা ঘুরে বেডাতে বেড়াতে মাঝে মাঝে তিনি চর্মকারকে ফিসফিস করে বলেন যে এরূপ একটা দুরূহ কাজ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করার জন্যে তাঁকে অন্ততঃ পুরস্কৃত করা উচিত।

তিনি বলেন যে আর মাত্র পঞ্চাশ ডলার বেশী খরচ করলে একটা ভালো উপপত্নি তিনি খরিদ করতে পারতেন।

যেখানটিতে কোলে শিশু নিয়ে মেয়েটা বসে সেদিকপানে চেয়ে তিনি চীৎকার করে ওঠেন:

"বেহারাদের তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার; কেন না ওখানে গিয়ে ওরা দুপুরের খাবার খাবে। তাই আর ত দেরী করা চলে না—যাও তৈরী হও গে।"

মেয়েটি ঘটকীর দিকে এমন ভাবে চেয়ে থাকেন যার অর্থ; আমি ত ওখানে যেতে চাই না। উপোস করে মরতে হয় ত এখানে মরবো।

ব্যাপারটা সম্যক উপলব্ধি করে হেঁসে ঘটকি বলেন:

"বোকা মেয়ের কাণ্ড দেখ! ঐ হলদে লোকটার তোমায় দেবার মত কি আছে? যেখানে যাচ্ছ সেখানেই পণ্ডিতের নিজস্ব এক বিশাল প্রাসাদ রয়েছে। ২০০ 'ম্যুর' বেশী জমি রয়েছে। আর রয়েছে প্রচুর গবাদি পশু। পণ্ডিতের বৌ-এরও মেজাজ বেশ ঠাণ্ডা। ও বেশ দয়ালু। তাঁর দুয়ার থেকে আজ পর্যন্ত কেউ শুধু হাতে ফেরেনি। আর লোকটা মোটেই বুড়ো নয়। ফর্সা মুখ, সে মুখে একগোছা দাড়ি পর্য্যন্ত নেই। অন্য সব শিক্ষিত

লোকদের মতই তিনি একটু কুঁজো হয়ে হাঁটেন। স্বভাব তাঁর বেশ নম্র। তাঁর সম্বন্ধে বেশী কিছু বলার দরকার নেই। পাল্কি থেকে নেমে তুমি স্বচক্ষে সব দেখে নিও। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে ঘটকি হিসেবে আমার মিছে কথা বলার অভ্যেস নেই।”

চোখের জল মুছে মেয়েটি ধরা গলায় বলে ঃ

“চুন বাওকে ছেড়ে থাকবো কি করে ?”

“চুন বাও ঠিকই থাকবে।” মেয়েটার কাঁধে ছোট্ট এক চাপড় মেরে শিশুর মুখের উপর ঝুকে ঘটকি বলেন, “ওর ত তিন বছর বয়স হলো। কথায় আছে না—তিন বছরের ছা যেথা ইচ্ছে যা। ওকে এখন একা ছেড়ে দেওয়া যায়। আসলে সব কিছু নির্ভর করছে তোমার ওপর। ওখানে দুতিনটে বাচ্চার যদি জন্ম দিতে পারো ত দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।”

এদিকে বাইরে পাল্কি বেহারারা খাবার জন্যে তাড়া লাগিয়ে দিয়েছে। নিজেদের মধ্যে চাপাস্বরে তারা বলছে। “অত কান্নাকাটির কি আছে ? তোমায় ত ওখানে বিয়ে করতে যেতে হচ্ছে না।”

মায়ের কোল থেকে চুন বাওকে ছিনিয়ে নেন ঘটকি।

ছোট্ট ছেলেটা তারস্বরে কাঁদতে থাকে। সে জোরে জোরে পা ছোঁড়ে। শ্রীমতি শ্যেন তাকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে যান। পাল্কীর ভেতর থেকে মা তাঁকে বলে ঃ

“বাইরে বৃষ্টি পড়ছে—ওকে ঘরের ভেতর নিয়ে যান।”

ওদিকে ঘরের ভেতর গালে হাত রেখে বসে আছে বাপ—নির্বাক, নিষ্পন্দ।

* * *

দুটো গাঁয়ের মধ্যে দুরত্ব ৩০ ‘লি’। কিন্তু পাল্কি বাহকেরা অতটা রাস্তা একবারও বিশ্রাম না নিয়ে একনাগাড়ে হেঁটে চলে এল। পাল্কির পরদার ফাঁক দিয়ে শেষ বসন্তের ঝিরঝিরে বৃষ্টি মেয়েটার পোষাক ভিজিয়ে দিয়াছে। তাকে স্বাগত জানাতে বাড়ীর ভেতর থেকে এক পঞ্চান্ন বছরের প্রৌঢ়া বাইরে এলেন। প্রৌঢ়ার মুখ বেশ গোল, কুটীল চোখ, ইনিই সেই পণ্ডিত লোকটির বৌ আন্দাজ করে মেয়েটা সলজ্জ ভঙ্গীতে তাঁর দিকে নীরবে চেয়ে থাকে। বেশ আদর যত্ন করে সেই মহিলা মেয়েটিকে বাড়ীর ভেতরে খাবার দরজা পর্য্যন্ত নিয়ে এলেন। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক। উনি বেশ লম্বা, গাল দুটী মসৃণ। তিনি মেয়েটির আপাদ-মস্তক একঝলক দেখে নিয়ে সামান্য হেঁসে বলেন ঃ

"খুব সকাল সকাল এসে গেছ ত! বৃষ্টিতে ভিজে গেছ না কি?"

সে কথায় কোন পাত্তা না দিয়ে পণ্ডিতের বৌ মেয়েটাকে প্রশ্ন করেন:

"পাল্কীতে ফেলে আসনি ত কিছু?"

"না কিছুই ফেলে আসিনি।" মেয়েটি জবাবে বলে।

অল্প সময়েই সকলে বাড়ীর মধ্যে চলে আসেন। নিজের চোখে বাড়ীর ভেতরের কাণ্ড দেখতে একদল প্রতিবেশী মহিলা ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে বাড়ীর ভেতর উঁকি দিতে থাকে।

যে কোন কারণেই হোক ভাড়াটে বৌটা তার মন থেকে তার পুরাতন বাড়ী ও ছেলে চুন বাও সম্বন্ধে চিন্তা পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারছে না। সে যাই হোক আগামী তিন বছর ধরে এখানে কাটানোর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করে বারবার এই কারণে সে নিজেকে অভিনন্দন জানায় যে এই নোতুন বাড়ী ও তার অস্থায়ী স্বামীকে ভালো লেগেছে। পণ্ডিত লোকটি দয়ালু ও মৃদুভাষী। বেশী কথা বললেও তার বৌও অতিথিবৎসল। তিনি পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর তিরিশ বছরের সুখী বিবাহিত জীবনের অনেক কথাই তাকে বললেন। এ কথাও মেয়েটাকে জানিয়ে দেন যে বছর পনের পূর্বে তাঁর একটি বাচ্চা হয়েছিল। কিন্তু সে বাচ্চার দশ মাস বয়সে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে সে মারা যায়। তারপর তাঁর আর কোন সন্তান জন্মায়নি। হাবে ভাবে বৌটি তাকে জানায় যে তিনি তাঁর স্বামীকে উপপত্নী গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন; কিন্তু পণ্ডিত সে প্রস্তাব বারবার প্রত্যাখ্যান করেন। হতে পারে তার উপপত্নী হওয়ার মত যথাযথ মহিলা পাননি বা তাঁর বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ বেশী থাকার কারণে তিনি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বৌ-এর সঙ্গে এই ধরণের গালগল্প করতে করতে ভাড়াটে বৌ মুহূর্তের জন্য দুঃখও পান আবার মুহূর্তেই খুসীও হন। সর্বশেষে তাঁকে জানানো হল যে পণ্ডিতের বৌ সহ পণ্ডিত তাঁর কাছ থেকে কি আশা করেন। ভাড়াটে বৌটি সলজ্জ ভঙ্গীতে মাথা নত করে।

"তুমি নিজে তিন চারটে সন্তানের মা। কি করতে হবে না হবে তা ত তোমার বেশ ভালো করেই জানা আছে। এই ব্যাপারে তুমি আমার থেকেও অভিজ্ঞ।"

এই সব আলাপ আলোচনার পর পণ্ডিতের বৌ ঘর থেকে চলে যান।

তিনি চলে গেলে পণ্ডিত ভাড়াটে বৌ এর কাছে নিজেকে অনুগ্রহ ভাজন করে তোলার উদ্দেশ্যে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই বললেন। ভাড়াটে বৌটা বসে ছিল লাল বার্ণিশ করা আলমারির ঠিক পাশটিতে।

এ রকম আলমারী তার বাড়ীতে কোন কালেই ছিল না। তাই চোখ দুটি তার নিবদ্ধ সেইটাতে। পণ্ডিত তাঁর সামনের আসনটিতে বসে পড়েন। প্রশ্ন করেন ঃ

"কি নাম তোমার ?"

ভাড়াটে বৌটি চুপ করে থাকেন। পরে সেখান থেকে উঠে সোজা বিছানায় চলে যান। হাস্যোজ্জ্বল মুখে পণ্ডিতও তার পেছু পেছু যান।

"লজ্জার কি আছে ? তোমায় স্বামীর কথা ভাবছো নাকি ? হাঃ হাঃ হাঃ ! এখন ত আমি তোমার স্বামী।" ভাড়াটে বৌ-এর হাত ধরে চাপা গলায় বলেন ; "চিন্তা করো না। বাচ্চার কথা ভাব্‌ছো ?"

পণ্ডিত সশব্দে হেঁসে উঠে, পরনের লম্বা গাউনটা খুলে ফেলেন।

ঘরের বাইরে ঠিক সেই সময় পণ্ডিতের বৌ কাকে যেন খুব ধমকাচ্ছেন। ঘরের ভেতর থেকে ভাড়াটে বৌ সব কথা শুনতে পেলেও ঠিক আন্দাজ করতে পারছেন না। কাকে ধমকানো হচ্ছে তাকে না রাঁধুনিকে। শোকার্ত হৃদয়ে তিনি ধরেই নেন যে ব্যাপারটা তাঁকেই কেন্দ্র করে। বিছানা থেকেই চীৎকার করেন পণ্ডিত ঃ

"ওনিয়ে ভেবো না ত। ও সব সময় ঐ রকম চেঁচায়। আমার বৌ আমাদের ক্ষেত মজুরকে পছন্দ করে ; তাই তার সঙ্গে রাঁধুনিকে কথা বলতে দেখলেই রাঁধুনিকে ধমকায়।"

* * *

দ্রুত সময় বয়ে চলে। দিন যত যায় ভাড়াটে বৌ তত বেশী বেশী করে এ বাড়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। পুরানো বাড়ীকে নিয়ে তার ভালো ভালো চিন্তা সব ফিকে হতে থাকে। কোন কোন সময় তার মনে হয় এই বুঝি চুন বাও-এর চাপা কান্না তার কানে এল ; এমন কি সেই ছেলেকে সে স্বপ্নে অনেকবার দেখেছে। কিন্তু নতুন জীবন যাত্রায় যত বেশী বেশী করে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে সে তত এই স্বপ্নটাই ক্রমশঃ তার কাছে অস্পষ্ট হতে থাকে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় পণ্ডিতের বৌ বোধহয় ভাড়াটে বৌ এর প্রতি সদয় ; কিন্তু মোটেই তা নয়। তিনি বরং তার প্রতি বেশী সন্দেহ প্রবণ ও ঈর্ষান্বিত। এমন কি ভাড়াটে বৌ ও পণ্ডিতের মধ্যে কোন কিছু ঘনিষ্ঠতা ঘটছে কি না তা জানার জন্য তিনি গোয়েন্দাগিরি পর্য্যন্ত করেন। যদি কোনদিন দেখেন যে বাড়ী ফিরেই পণ্ডিত তার সঙ্গে গালগল্প করতে লেগে গেছেন তখনই তিনি সন্দেহ করে বসেন যে নিশ্চয় তাঁর স্বামী ঐ মেয়েটার জন্য বিশেষ কিছু একটা এনেছেন। সত্য সত্যই

যদি তা কখনও ঘটতো তো সেদিন তাঁর শোবার ঘরে স্বামিকে ডেকে এনে একেবারে আচ্ছা করে ধমকে দিতেন। বলতেন, "তাহলে ডাইনিটা সত্য সত্যই তোমার চরিত্র নষ্ট করে দিয়েছে। যাইহোক তোমার এই পুরানো লাশট'কেও মাঝে মাঝে যত্ন করো।" ভাড়াটে বৌ হঠাৎই এই রকম অপমানজনক মন্তব্য শুনে ফেলেছিলো। তারপর থেকে পণ্ডিতের বৌ এর অনুপস্থিতিতে পণ্ডিত বাড়ী ফিরে এলে সে সর্বদা তাঁকে এড়াবার চেষ্টা করতো। এমন কি বৌ বাড়ী থাকলেও সে মনস্থির করে ফেলে যে তার নেপথ্যে থাকাই উচিত। সে এইভাবে চলতো বলে বাইরের লোকের কাছে এসব নজরে পড়তো না। এভাবে না করে যদি ভাড়াটে বৌ অন্য কোন রকমের আচরণ করতো তাহলে পণ্ডিতের বৌ এই বলে তাকে দোষী সাব্যস্ত করতেন যে বাইরের লোকের কাছে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এই সব ব্যবহার করছে। দিন যত যেতে থাকে পণ্ডিতের বৌ ক্রমে ক্রমে তাকে ঝি-এর কাজ করতে বাধ্য করে। একবার ভাড়াটে বৌ মনস্থ করে যে সে পণ্ডিতের বৌ-এর কাপড় চোপড় কেচে সাফ করে দেবে।

এই শুনে পণ্ডিতের বৌ তাকে বলেন, "আমার কাপড কাচার জন্যে তোমায় রাখা হয়নি। তুমি বরং রাঁধুনিকে দিয়ে তোমার কাপড় চোপড় কেচে নাও।" ঠিক পরমুহূর্তেই আবার বলতেন ঃ

"প্রিয় বোনটি আমার! শূয়োরের খোঁয়াডটা একবার দেখে এসো না ভাই। সব সময় দেখছি বাচ্চা শূয়ার দুটো চ্যাঁচাচ্ছেই। মনে হয় ওদের ক্ষিদে পেয়েছে। আমি ঠিক জানি যে রাঁধুনি নিশ্চয় ওদের পেট ভরে খেতে দেয় না।"

দেখতে দেখতে ভাড়াটে বৌ-এর এ বাড়ীতে আটমাস থাকা হয়ে গেল। তারপর হঠাৎই তার খাওয়া সম্বন্ধে সে বেশী বেশী ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। দৈনন্দিন আহারে তার ভীষণ অরুচি। তবে ভিন্ন স্বাদের খাদ্যের প্রতি— যেমন ডিম দিয়ে তৈরী রাবড়ি ও আলুর খাদ্যের প্রতি তার ভীষণ আগ্রহ। কিছুদিন পরে এই খাদ্যের প্রতিও তার অনীহা দেখা যায়। এখন তার বাসনা মাংসের পুডিং-এর উপর। আবার কোন কোন দিন সে যদি এসব খাদ্য একটু বেশী খেয়ে ফেলতো ত সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়তো সে। আবার কিছুদিন বাদে তার বাসনা জাগতো কিস্‌মিস্‌ ও কুমড়োর প্রতি। ওটা আবার গরমকালে পাওয়া যায় না। মহিলাদের এই সবের অর্থ পণ্ডিত বেশ ভালো ভাবেই জানতেন। তাঁর হৃদয়ে খুশীর জোয়ার বয়ে

যায়। সারাদিন ধরে তিনি প্রফুল্ল মনে সারা বাড়ী ঘুরে বেড়ান এবং বাজারে খাদ্য যা পাওয়া যায় তা সম্ভব মত সব আনিয়ে দেন। নিজে শহরে গিয়ে ভাড়াটে বৌ-এর জন্য কমলালেবু, ছোট মিষ্টি লেবু কিনে আনতেন। তা যদি সব সময় সম্ভব নাও হতো তাহলে কাউকে বাজারে পাঠিয়ে আনিয়ে নিতেন। সারাদিন ধরে আপন মনে বিড়বিড় করতেন ও সারা বাড়ী পায়চারী করতেন তিনি। একদিন পণ্ডিত দেখলেন যে ভাড়াটে বৌ রাঁধুনির সঙ্গে একসাথে গম ভাঙছে—নববর্ষের উৎসবের জন্য। সবেমাত্র তারা কাজ সুরু করেছে ঠিক সেইমুহুর্তে পণ্ডিত বলেন:

"তোমায় আর কষ্ট করে গম ভাঙতে হবে না। তুমি বরং একটু বিশ্রাম নাওগে। নববর্ষের ঐ খাদ্য ত সকলেই খাবে—তাই ওটা খেত-মজুরটাই করতে পারবে।"

আবার দেখা যেত হয়ত বাড়ীর সকলে গালগল্পে মেতে আছে যখন সে সময় তিনি একা একা কেরোসিন বাতি জ্বেলে গানের বই পড়ছেন।

একবার পণ্ডিতকে তাঁর এক মজুর প্রশ্ন করেছিল; "শুধু শুধু এত বই পড়ছেন কেন? আপনাকে ত উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার হবার জন্যে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে হবে না?"

মসৃন চিবুকে আঙুলের টোকা মেরে পণ্ডিত বলেন:

"আচ্ছা জীবনের সব আনন্দ ত তোমার জানা আছে—তাই না? প্রবাদ আছে যে জীবনের সবচেয়ে বেশী আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে হয় বাসর ঘরে প্রথম রাত কাটানো বা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। ও দুটো অভিজ্ঞতাই আমার হয়ে গেছে। কিন্তু এখন আমার কপালে নাচছে এসবের চেয়ে আরও বড় এক আশীর্বাদ।"

পণ্ডিতের এই মন্তব্যে বাড়ীর সকলেই সেদিন হেসেছিল। হাসেনি কেবল ওর বৌ।

এত সব কিছুই পণ্ডিতের বৌ-এর কাছে বিরক্তিকর বলেই মনে হয়। প্রথম যেদিন তাঁর কানে ভাড়াটে বৌ-এর অন্তঃসত্বার খবরটা আসে সেদিন তিনি কি খুসী না হয়েছিলেন। কিন্তু পরে যখন দেখলেন যে পণ্ডিত তার নিজের বৌ-এর চেয়ে বেশী মনোযোগ দিচ্ছেন ঐ ভাড়াটে বৌকে তখন তিনি প্রথমেই এ সবের জন্য দায়ী করেন তাঁর নিজের বন্ধ্যাত্বকে। বসন্ত কালে একদিন ভাড়াটে বৌ-এর এমন অসুখ করে যে তাকে তিন দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। ফলে পণ্ডিতের চিন্তা বেড়ে যায়। মেয়েটাকে বিশ্রাম নিতে বলে তার প্রয়োজনের কথা প্রায়ই জানতে চান তিনি।

এই ঘটনায় বৌ ত রেগে লাল। তিন দিন ধরে তাঁর কি গজগজানি! বৌ বলে ভাড়াটে বৌ অসুখের ভান করে মট্‌কা মেরে পড়ে আছে।

"এই বাড়ীতে এসে মেয়েটা খারাপ হয়ে গেল। ও এখানে খাঁটি এক বেশ্যার মত চিটিয়ে আছে।" অবজ্ঞা ভরেই তিনি বলেন: সব সময় দেখছি ওর হয় সর্বাঙ্গে ব্যথা আর না হয় মাথা ধরা। আগে নিশ্চয়ই মেয়েটা অন্যরকম ছিল।—ঠিক যেমন কোন কুত্তি পেটে অনেকগুলো ছানা নিয়ে খাদ্যের সন্ধ্যানে ঘুরে বেড়ায় এও নিশ্চয় তাই ছিল। আবার যখন দেখছে যে একজন ঘাটের মড়া বুড়ো হাবড়া তোকে খোসামোদ করছে তখন ত তার মাটিতে পা পড়ে না।

একদিন রাতে পণ্ডিতের বৌ রাঁধুনিকে বলেন: "বাচ্চা প্রসব করা নিয়ে এত আদিখ্যেতা কেনরে বাবা? একবার আমিও একটা বাচ্চার সঙ্গে দশ মাস ছিলেম। নিশ্চয়ই ওর শরীর আমার চেয়ে বেশী খারাপ হয়নি। কে জানে ও কি বিয়োবে? এমনও ত হতে পারে যে সে একটা ব্যাঙ প্রসব করলো, তখন? আমাকে সে যেন অসত্য কথা না বলে। প্রসব হওয়ার আগেই নিজের চারদিকে তার প্রভাব বাড়াবার চেষ্টা না করাই ভালো। এখন ত সেটা একটা রক্তের ডেলা বইতো কিছু নয়। তার জন্যে এত আদিখ্যেতা করাটা খুব সকাল সকাল হয়ে যাচ্ছে না?"

রাতের খাবার না খেয়ে ভাড়াটে বৌ সেদিন শুয়ে পড়েছিলো। ঈর্ষায় ভরা ওই সব কথায় তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সব শুনে সে ডুকরে কেঁদে ফেলে। পণ্ডিতেরও মনে এত আঘাত লাগে যে তার মনে হয় যেন বরফের মত ঠাণ্ডা ঘাম যেন তার গা দিয়ে নেমে গেল। তার সর্বাঙ্গ রাগে রি রি করতে থাকে। তাঁর ইচ্ছা করে যে এখনই শোবার ঘর থেকে তার বৌকে চুলের মুঠি ধরে তুলে ঘা কতক দিতে। তাহলে যদি তাঁর রাগ কিছু পড়ে। তবে যে কোন কারণেই হোক নিজেকে তাঁর অক্ষম বলেই মনে হয়। পণ্ডিতের হাত দুটো ক্লান্তিতে কাঁপছে। গভীর এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলেন: "বরাবর আমি ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে এসেছি। গায়ে হাত দেওয়া ত দূরের কথা গায়ে আঁচড় পর্যন্ত কাটতে দিই নি। তাই তাঁর এত মেজাজ।"

তারপর শুয়ে শুয়ে বিছানার অন্যপ্রান্তে শুয়ে থাকা ভাড়াটে বৌকে ফিসফিস করে বলেন: "কাঁদে না, ওকে বক্‌বক্ করতে দাও। বাঁজা মুরগী হিংসুটে হয়। তোমার যদি ছেলে হয় তাহলে তোমায় আমি দুটো জিনিস দেবো—একটা সাদা আর অন্যটা সবুজ মনির আংটি

একটা…।" কথাটা শেষ না করেই তিনি কান পেতে ঘরের বাইরে তার বৌ-এর শ্লেষভরা গালি গালাজ শোনেন। তারপর পোষাক ছেড়ে মাথা পর্যন্ত লেপে ঢেকে ভাড়াটে বৌ-এর আরও ঘনিষ্ট হয়ে বলেন :

"আমার না একটা সাদা মণি ‥।"

* * *

ভাড়াটে বৌ-এর কোমর সংলগ্ন এলাকাটা দিনকে দিন বেড়েই চলে। পণ্ডিতের বৌ পূর্বেই এক ধাই-এর ব্যবস্থা করে রেখে ছিলেন এবং চারদিকে যখন লোক গিজগিজ করতে থাকে তখন ফুল তোলা ছাপা ছিট্ থেকে বাচ্চার পোষাক তৈরী করতে হঠাৎই ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

গ্রীষ্মকাল শেষ। গাঁয়ের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে শরতের হিমেল বাতাস, অবশেষে সেই চরম দিনটা এল যে দিনটার জন্য বাড়ীর সকলের উত্তেজনা ও প্রত্যাশা একেবারে চরমে গিয়ে উঠেছিল। পণ্ডিতের হৃদস্পন্দন খুব বেড়ে গেছে। একহাতে হরস্কোপ ও অন্যহাতে পাঁজি খুলে বাড়ীর পুরো উঠোনটায় পায়চারী করতে করতে এখন তন্ময়তার সঙ্গে বই দুটো পড়ছেন, যেন দেখে মনে হয় পুরো পাঁজিটাই হয়ত কণ্ঠস্থ করে ফেলবেন পণ্ডিত। এক এক সময় তিনি আবার বই বন্ধ রেখে, যে ঘর থেকে আসন্ন প্রসবা মহিলার গোঙানি ভেসে আসছে, সেখানে উঁকি দিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করেন। আবার অন্য সময় হঠাৎই মেঘলা আকাশ দেখে রুদ্ধ ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রাঁধুনিকে জিজ্ঞেস করেন ঃ

"কেমন বুঝছ ?"

অল্পক্ষণ নিরবতার পর সে জবাব দেয়, "আর বেশী দেরী নেই ?"

আবার পাঁজি পড়তে পড়তে পণ্ডিত উঠোনে পায়চারী করতে থাকেন।

এই রকম উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা চললো সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তারপর সন্ধ্যা নামলে গাঁয়ের সব বাড়ীর ছাদে রান্না ঘরের উনোনের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে যখন উপরে উঠ্তে থাকে এবং যখন গাঁযের সব বাড়ী থেকে কেরোসিনের আলো বনফুলের মত জ্বলজ্বল করতে থাকে ঠিক সেই মুহূর্তে পণ্ডিতের একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হয়। ঐ বিশাল বাড়ীর সব দিক যখন সদ্যজাত শিশুর তারস্বরে চীৎকারে ভরে উঠ্লো তখন দেখা গেল এক কোণে বসে পণ্ডিত আনন্দাশ্রুতে ভাসছেন।

* * *

সেদিন থেকে ঠিক একমাস বাদে সেই সজীব কোমল গাল বিশিষ্ট

বাচ্চাটা সর্ব প্রথম ঘরের বাইরে আত্মপ্রকাশ করে। বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর সময় ভাড়াটে বৌটিকে ঘিরে বসে প্রতিবেশী মহিলারা বেশ আগ্রহ সহকারে বাচ্চাকে দেখতেন। ওঁদের মধ্যে কেউ কেউ পছন্দ করতেন বাচ্চার মুখ, কেউ বা তার কান ; কেউ কেউ আবার তার মায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন। বলতেন ; তাঁর স্বাস্থ্য নাকি ভালো হয়েছে। আবার ঠাকুমাদের মত ভাবভঙ্গী করে পণ্ডিতের বৌ বলতেন ঃ

"অনেক হয়েছে। এখন বাড়ী যাও ত সব। ছেলে জেগে যাবে।"

ছেলেটার নাম করণের ব্যাপারে পণ্ডিত প্রচুর মাথা ঘামাচ্ছেন। কিন্তু লাগসই একটা নাম খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। ওঁর বৌ বলেছেন যে বাচ্চাটার নামের সাথে সেট কথাটা যেন যুক্ত থাকে। কারন সেট কথাটার অর্থ দীর্ঘায়ু। এই নামটা কিন্তু পণ্ডিতের বেশ মনঃপুত হল না। উনি বললেন এটা ত অতি সাধারণ একটা নাম। ছেলেটার একটা উপযুক্ত নাম খুঁজে বার করতে তিনি চীনের প্রাচীন দুটি বই, যথাক্রমে ইতিহাসের বই ও "পরিবর্তনের বই" বেশ তন্ন তন্ন করে ঘাঁটলেন—কিন্তু সবই বৃথা ! অবশ্য এটা ঠিক যে মনের মত নাম খুঁজে বার করাও একটা সমস্যা। কেন না এমন একটা শব্দ উনি খুঁজছেন যার মানে হতে হবে দুটো। প্রথম অর্থ হতে হবে শুভলক্ষণ ও দ্বিতীয়টি হতে হবে যে, যে তাঁর বৃদ্ধ বয়সের সন্তান তাও বোঝাতে হবে। এক সন্ধ্যায় বাচ্চাকে কোলে নিয়ে চোখে চশমা পড়ে চেয়ারে বসে ছেলেটার উপযুক্ত নামের আশায় প্রচুর বই ঘাঁটছেন। ভাড়াটে বৌ সেই সময় ঐ ঘরেরই এক কোণে বসে ছিল। অকস্ম্যাৎ সে বলে ওঠে।

"আমার মনে হয় বাচ্চাটাকে কিউ বাও বলে ডাকা যেতে পারে।" ঐ ঘরের উপস্থিত সব কজন ঘাড় ঘুরিয়ে মন দিয়ে কথাটা শোনেন। "কিউ মানে শরৎকাল, আর বাও মানে অমূল্য সম্পদ। তাই মনে হয় কিউ বাও বলে ডাকাই যুক্তি সঙ্গত।"

"চমৎকার ! ছেলেটার একটা লাগসই নামের জন্যে আমি হন্যে হয়ে খুঁজছি ! ঠিকই ত ! আমার এখন বয়স ৫০ এর উপর। তাই আমি এখন জীবন সায়াহ্নে মানে শরৎকালে পৌঁছে গেছি। আবার শরৎকালটা সব জিনিষেরই পরিপক্কতার সময়। এ সময় আবার ফসল কাটা হয়। এ সব ইতিহাসে লেখা রয়েছে। কিউ বাও নামটা খুব ভালো।"

তারপর থেকে সেই পণ্ডিত লোকটি ভাড়াটে বৌ এর প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। উনি বলেন মেয়েটি বেশ চালাক চতুর। আরও

বলেন এটা খুব সৌভাগ্যের কথা যে পণ্ডিতের মত যে বই এর পোকা হয়ে জন্ম গ্রহন করে নি। এসব কথায় তার খুব অস্বস্তি বোধ হয়। মাথা নীচু করে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে সে ভাবে : কিউ বাও নামের প্রস্তাব আমি এই কারণে দিয়েছি যে আমি তখন আমার বড় ছেলে চুন বাও-এর কথা চিন্তা করছিলাম। চুন বাও-এর অর্থ বসন্তকালের মূল্যবান সম্পদ।

* * *

কিউ বাও দিনে দিনে বেড়ে ওঠে; আবার দিনকে দিন সে আরও সুন্দর দেখতে হয। ছেলেটা মায়ের খুব ন্যাওটা। তার অস্বাভাবিক রকমের বড় বড় চোখ মেলে সে নিরলস ভাবে অপরিচিত মানুষদের দেখে সেই চোখই আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে যায় যখন সে তার মাকে দেখতে পায়—এমন কি অনেক দূর থেকে হলেও। সকল সময় সে তার মাকে আঁকড়ে ধরে থাকে; যদিও ভাড়াটে বৌ-এর চেযে পণ্ডিত বেশী ছেলেটাকে ভালোবাসে তাহলেও ছেলেটা মায়ের প্রতি বেশ আসক্ত। আবার পণ্ডিতের বৌ-এর ক্ষেত্রে, যদিও, তিনি আপাতভাবে দেখান যে ছেলেটাকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করেন; কিন্তু কিউ বাও অপরিচিত মানুষদের যে চোখে দেখেন ঠিক সেই দৃষ্টিতে তাকেও দেখে। ছেলেটা দিনকে দিন মায়ের যতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে ততই তাদের বিচ্ছেদের সময ঘনিয়ে আসে। আবার গরমকাল এসে গেল। এই ঋতুর আবির্ভাব বাড়ীর বাসিন্দাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ভাড়াটে বৌ-এর এ বাড়ীতে থাকার তিন বৎসরের মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। এবার তার যাবার পালা।

কিউ বাও-এর প্রতি অগাধ স্নেহবশতঃ পণ্ডিত তাঁর বৌকে প্রস্তাব দেন যে তাঁর বাসনা যে আরও একশ ডলার দিয়ে তিনি কিউ বাও-এর মাকে কিনে নিতে চান। তাহলে ঐ মেয়েটি স্থায়ীভাবে এখানে থাকতে পারবে। এই প্রস্তাবের জবাবে বৌ এক ছোট্ট কাটাকাটা উত্তর দেন।

"তার আগে বিষ দিয়ে আমায় মেরে ফেলো।"

জবাব শুনে পণ্ডিতের রাগ চড়ে যায়। অনেক পরে কেঠো হাসি হেসে বলেন।

"এটা খুবই বেদনাদায়ক হবে যে বাচ্চাটা মা-হারা হবে।"

"তোমার কি ধারণা আমি মা হতে পারি না!"

ভাড়াটে বৌ এর মনে তখন দুটো পরস্পর বিরোধী দ্বন্দ্বের সংঘাত চলেছে। একদিকে সে ধরে রেখে দিয়েছে যে তিন বছর সম্পূর্ণ হলেই

এ বাড়ীর পাঠ চুকিয়ে তাকে চলে যেতে হবে। তিন বছর সময়টা যেন দেখতে দেখতে কেটে গেল। এবং দিন যতই চলে যাচ্ছে ততই ভাড়াটে বৌ পরিণত হতে চলেছে পরিচারিকায়। কিউবাও নামটাও চুন বাও-এর মতই মিষ্টি—অন্ততঃ তাঁর কাছে। এখন কারুকে ছেড়ে তাঁর থাকাটাই অসম্ভব। অপর দিকে সে পণ্ডিতের বাড়ীতে স্থায়ীভাবে থাকতে ইচ্ছুক। তার নিজ ধারণা যে তার স্বামী আর বেশী দিন বাঁচছে না। সে দু চা'র মাসের মধ্যেই মারা যাবে। তাই তার বাসনা যে পণ্ডিত যেন চুন বা'ও কেও এ বাড়ীতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে। তাহলে সে তার বড়ছেলেকেও নিয়ে এখানে স্থায়ীভাবে থাকতে পারবে।

একদিন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ভাড়াটে বৌ বুকের উপর ঘুমন্ত কিউ বাওকে নিয়ে ঘুমাচ্ছে গ্রীষ্মকালীন সকালের সূর্য্যের সম্মোহনকারী কিরণে সে দিবাস্বপ্ন দেখছে ঠিক যেন তার পাশটিতে চুনবাও দাঁড়িয়ে। কিন্তু তাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে গিযে দেখে যে না সেখানে কেউ নেই।

বারান্দার অন্য প্রান্তে মুখে একটা সদযতার ভাব এনে হিংস্র কুটিল দৃষ্টিতে ভাড়াটে বৌ-এর দিকে তাকিযে থাকে। ভাড়াটে বৌ আপন মনে বলে ঃ

"যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এখান থেকে আমার চলে যাওয়া ভালো। বৌটা আমার উপর সর্বদাই গোয়েন্দাগিরি করছে।"

পরে পণ্ডিত তাঁর পূর্ব পরিকল্পনার খানিক রদবদল করেন। শ্রীমতি শ্যেন মারফৎ ভাড়াটে বৌ-এর স্বামির কাছে তিনি অন্য এক প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। প্রস্তাবটি হলো আরও তিরিশ বা পঞ্চাশ ডলার দিলে আরও তিন বছরের জন্য তার বৌকে সে এখানে রাখতে আগ্রহী কিনা ?

বৌকে বলেন ঃ

"কিউ বাও-এর পাঁচ বৎসর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত ওর মাকে এ বাড়ীতে রাখার কথা ভাবছি।"

"ভগবান বুদ্ধ আমায় রক্ষা করুন।" জপমালা হাতে বৌ সুর করে এই কথাটি বলেন।

"বাড়ীতে ওর বড় ছেলে রয়েছে, তাছাড়া আমাদের উচিত নয় কি ওকে তার আইন সঙ্গত স্বামির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া ?"

পণ্ডিত মাথা নত করে, বলেন ঃ

"ভেবে দেখ—ছেলেটা দুবছর বয়সেই মা-হারা হবে কিন্তু।"

জপমালা রেখে তিক্ত কণ্ঠে পণ্ডিতের বৌ বলেন।

"আমি নিজেই ছেলেটার দায়িত্ব নিতে পারি। ওকে আমি ঠিক সামলে রাখবো? তোমার কি ধারনা আমি ওকে খুন করবো।"

বৌ-এর শেষ কথাটি শোনার পর পণ্ডিত অতি দ্রুত সে স্থান ছেড়ে চলে যান। ওদিকে বৌ গজগজ করতেই থাকেন।

"আমার জন্যেই কিউ বাও এর জন্ম, ও এখন আমার। তোমার পারিবারিক পুরুষ ধারা যদি খতম হয়ে যায় তাহলে সেটা আমাকেও আঘাত করবে। মেয়েটা নির্ঘাৎ তোমায় যাদু করে বশ করেছে। তুমি বুড়ো, আর মাথাটা তোমার শূয়োরের মত। কিসে যে কি হয় তা তুমি জানো না। ভেবে দেখ তো আর কত বছর তুমি বাঁচবে? তা জানা সত্ত্বেও তুমি ওকে তোমার কাছে রাখার জন্যে কত কী না করছ। এ কথা তোমায় আমি নিশ্চিত করে বলে দিচ্ছি যে পারিবারিক স্মৃতি চিহ্নাগারে আমার স্মৃতিফলকের পাশে ওর স্মৃতিফলক থাকুক এটা আমি চাই না।"

তাঁর হাবভাব দেখে মনে হয় যে এই রকম কটূক্তির বন্যা বোধহয় তাঁর কোন দিনই থামবে না। তবে যার শোনার জন্যে বলা সেই পণ্ডিত তখন চলে গেছে অনেক দূরে।

কিউ বাও-এর যতবারই অসুখ করেছে—সে মাথায় ছোট্ট ফুসকুরি হোক বা সামান্য জ্বর হোক্-দেখা গেছে পণ্ডিতের বৌ ছেলের রোগ-যাতে সারে সে জন্যে বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানাতে গেছেন, এবং সেখান থেকে ধূপের ছাই-এর আকারে বুদ্ধের আশীর্বাদ নিয়ে ফিরেছেন। সেটা হয় ছেলের মাথায় বুলিয়ে দিতেন না হয় জলের সঙ্গে গুলে ছেলেটাকে সেটা খাইয়ে দিতেন। ছেলেটা হয়ত এই সব খেয়ে কাঁদত এবং তার দেহ থেকে প্রচুর ঘাম বেরুত। ছেলের সামান্য জ্বর জ্বালায় পণ্ডিতের বৌ এর এত ব্যস্ততা মোটেই তার মায়ের পছন্দ হত না এবং যদি তিনি কাছাকাছি না থাকতেন তাহলে কিউ বাও-এর মা ছাই সব বাইরে ফেলে দিতো।

তাই একদিন আক্ষেপ করে বৌ পণ্ডিতকে বলেন:

"দেখ খোকার জন্যে ভাড়াটে বৌ-এর কোন মাথাব্যথা নেই। দিনকে দিন যে ছেলেটা রোগা হয়ে যাচ্ছে তার জন্যে সে মোটেই চিন্তিত নয়। প্রচার করলেই সত্যকার ভালোবাসা বোঝা যায় না। ও আমাদের ছেলেকে ভালবাসার ভান করে।"

ভাড়াটে বৌ একা থাকলে কাঁদে। পণ্ডিত নিরবে বসে থাকেন।

*

কিউ সাও-এর প্রথম জন্মদিন পালিত হয় বেশ হৈ চৈ করে প্রচুর ঘটা করে। অতিথি এসেছিলেন প্রায় চল্লিশ। জন্মদিনের উপহার হিসাবে যা এসেছিল তার মধ্যে ছিল বাচ্চাদের পোষাক, লাল রং-এর রাবড়ি, সিংহের মাথার আকারে লকেটসহ রূপোর হার একটা সেটাও ঝুলবে বাচ্চার গলায়, টুপিতে সেলাই করা থাকবে দীর্ঘায়ু দেবতার মূর্তি—সোনার পাত দিয়ে তৈরী। সকলেই ছেলের দীর্ঘায়ু ও সৌভাগ্য কামনা করেন। খুশীর আমেজে গৃহকর্তার মুখ টকটকে লাল।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ভোজসভা স্থুরুর ঠিক পূর্বক্ষণে গোধুলির আলো থেকে বাড়ীর উঠোনে এসে হাজির হয় এক রবাহুত অতিথি—সে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে একজন রোগাটে কৃষক, তাপ্পিমারা পোষাক, অবিন্যাস্ত চুল, বগলে একটা কাগজের প্যাকেট। এই বরাহুত অতিথি কোথা থেকে এসেছেন তা জানতে বিহ্বল, বিস্মিত গৃহকর্তা তাঁর কাছে গেলেন। সে আমতা আমতা করলেও গৃহকর্তার এটা বুঝতে অসুবিধে হল না যে লোকটি সেই চর্মব্যবসায়ী। এবং ভাড়াটে বৌ-এর স্বামী। নিম্নস্বরে গৃহকর্তা তাকে জানান যে তার উপহার না আনলেও চলতো।

চতুর্দিকে একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে বলে, "আমায়—আবার—আসতে হলো! খোকার দীর্ঘায়ু কামনা করতে।"

কথা কইতে কইতে সে প্যাকেটটাও খুলতে থাকে; কাঁপা কাঁপা আঙ্গুলে তিন প্রস্থ কাগজের ঢাকা খুলে তার ভেতর থেকে বার করলেন এক বর্গ ইঞ্চি মাপের ব্রোঞ্জ ও রূপার পাতের তৈরী কতকগুলি অক্ষর। এই অক্ষরের অর্থ হলো যতদিন দক্ষিণের পাহাড় থাকবে পৃথিবীতে ততদিন ছেলেও বেঁচে থাকবে।

এই সময় ওখানে এসে উপস্থিত হলেন পণ্ডিতের বৌ, চর্ম ব্যবসায়ীকে দেখে ত তিনি রেগে লাল। পণ্ডিত তার হাত ধরে তাকে খাবার টেবিলে বসিয়ে দেন। অন্যান্য অতিথিরা ফিস্‌ফিস্ করে এর সম্বন্ধে আলোচনা করতে থাকেন।

পাক্কা দুটি ঘণ্টা ধরে প্রচুর মদ্যপান করে সকলে ভীষণ খুসী ও উত্তেজিত। বেশ হৈ হৈ করে তারা মদ্যপান করে। একজন আবার অন্যজনকে মদ বাড়িয়ে দেয়। দুকাপ মদ্যপান করার পর লোকটি চুপচাপ একটা কোণ বেছে নিয়ে বসে থাকে। এখন অবশ্য তাকে কেউ লক্ষ্যই করছে না। প্রচুর মদ্যপান করে এক দু ভাগ ভাত গোগ্রাসে গিলে, হাতে

লণ্ঠন নিয়ে দুই তিন জনের এক একটা করে দলে ভাগ ভাগ হয়ে অতিথিরা সকলে নিজ নিজ বাড়ী ফিরে যান।

অনেক রাতে চাকরটা টেবিল সাফ করতে আসে যখন তখনও কিন্তু সেই লোকটা বসে। তারপর বারান্দার অন্ধকার কোণে এসে দেখে সেখানে তার বৌ বসে।

বিষণ্ণ কণ্ঠে সে বলে, "কেন এসেছ ?"

"আমি আসতেই চাই নি। তা সত্ত্বেও আসতেই হল।"

"এলে যদি ত এত দেরীতে কেন ?"

"কিউ বাও-এর জন্য উপহার কেনার টাকা ছিল না। তাই জোগাড় করতে সারা সকালটা লেগে গেল। তারপর উপহার কিনতে যেতে হল শহরে। আর তাছাডা ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত ছিলাম দেরী হল মূলতঃ ঐ কারণেই।

মেযেটি জিজ্ঞেস করে, "চুন বাও কেমন আছে।"

কযেক মুহূর্ত নীরবতার পর লোকটা উত্তর দেয :

"চুন বাও-এর জন্যেই আমায আসতে হলো।"

মেযেটা একই কথার প্রতিধ্বনি করে : "চুন বাও-এর জন্যে !"

মৃদুস্বরে স্বামী বলে চলে :

"গ্রীষ্মকালের গোডা থেকেই চুন বাও রোগা হতে সুরু করে ভীষণ ভাবে। তবে হাতে টাকা না থাকায ওর জন্যে কিছু করা সম্ভব হয নি, তাই রোগটা ওর বেডেই চলে। আমরা যদি ওকে বাঁচানোর চেষ্টা না করি ত ও বোধহয মরেই যাবে। "তারপর মৃদু হেসে বলে তোমার কাছে টাকা ধার করতে এসেছি।"

মেযেটার মনে হয কোন এক বনবিডাল যেন তার অন্তরের অন্তঃস্থলে আঁচডাচ্ছে, কামডাচ্ছে ভীষণ যন্ত্রনায সে কাতর হযে পড়ে। কিন্তু আজ যে কিউ বাও এর জন্মদিন। যেখানে সকলে স্ফুর্তি করছে সেখানে কান্না কাটি করা ঠিক হবে না মনে করে সে অতিকষ্টে কান্না চেপে রাখে। চোখের জল মুছে মৃদুস্বরে স্বামীকে বলে :

"টাকা ত আমার কাছে নেই। আমার নিজের খরচের জন্য ওঁরা আমায় তিরিশ সেণ্ট দেন। তা সে ত ছেলের জন্যে সব খরচ হয়ে যায়। এখন আমি কি করি ?"

কিছুক্ষণ নিরবতার পর বৌ বলে :

"তুমি ত এখানে ! চুন বাওকে দেখছে কে ?"

"এক প্রতিবেশী। আজ রাতেই আমায় ফিরে যেতে হবে। আসলে এখনই ফিরতে হবে।" স্বামী চোখের জল মোছে।

অশ্রুজড়িত কণ্ঠে স্ত্রী বলে, "একটু দাঁড়াও! ওঁর কাছে টাকা ধার পাওয়া যায় কিনা দেখি?"

*　　*　　*

এই ঘটনার ঠিক তিন দিন পরে পণ্ডিত মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ

"তোমায় যে নীল মনির একটা আংটি দিলাম সেটা কৈ?"

"সেটা আমি আমার স্বামীকে দিয়েছিলাম। উনি সেটা বন্ধক রেখে টাকা ধার করেছেন।"

বিরক্তি সহকারে পণ্ডিত বলে, "সেদিনই ত তোমায় পাঁচ ডলার ধার দিলাম।"

দুহাতে মাথা চেপে মেয়েটা জবাব দেয়, "প্রয়োজনের তুলনায় পাঁচ ডলার যথেষ্ট ছিল না।"

জবাব পেয়ে পণ্ডিত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, "তোমার সঙ্গে আমি যতই ভালো ব্যবহার করি না কেন তুমি এখনও তোমার বড় ছেলে ও স্বামীকে ভালোবাসো। মনে করেছিলাম আরও কয়েক বছর তোমায় এখানে রেখে দেব। কিন্তু এখন দেখছি যে আগামী বসন্তকালেই তোমার চলে যাওয়া ভালো।"

মেয়েটি স্তম্ভিতঃ নির্বাক, অশ্রুহীন।

কয়েকদিন পরে পণ্ডিত আবার বলেন, "নীল মনিটা একটা মূল্যবান সম্পদ। ওটা তোমায় দিয়েছিলাম এই জন্যে যে উত্তরাধিকার সূত্রে তোমার কাছ হতে কিউ বাও ওটা পাবে। সেটা যে তুমি বন্ধক দিয়ে দিতে পারো তা আমি চিন্তাও করিনি। তোমার কপাল ভালো যে আমার বৌ এখনও এ খবরটা পায় নি। তা যদি সে পেত ত আগামী তিন মাস ধরে এ বাড়ীতে ধারাবাহিক ভাবে তুলকালাম কাণ্ড ঘটত।"

*　　*　　*

সেদিন থেকেই ভাড়াটে বৌ আরও শীর্ণ, পাণ্ডুর হতে থাকে। তার চোখে আর সে ঔজ্জ্বল্য নেই; এখন সে প্রায়ই পণ্ডিতের বৌ এর বিদ্বেষ পূর্ণ কটূক্তির শীকার হচ্ছে। আবার চুন বাও-এর অসুস্থতার খবরে সে বেশ চিন্তিত। এখান থেকে সে গ্রামে কেউ যাচ্ছে কিনা বা ঐ গ্রাম থেকে এখানে কেউ আসছে কিনা সে সন্ধান মেয়েটা বারবারই

রাখে ; তার ধারাণা তাদের মারফৎ চুন বাও-এর সুস্থতার খবর সে পাবে। সবই বৃথা! কয়েক ডলারের মিষ্টি কিনে তাকে পাঠানোর বাসনাও তার হয়েছিল ; কিন্তু গাঁয়ে যাচ্ছে এমন লোকের সন্ধানই সে পেলো না। প্রায়ই দেখা যায় যে সে কিউ বাওকে কোলে করে তাদের বাড়ীর ফটকের বাইরে শূন্যদৃষ্টিতে মেঠো রাস্তাটার দিকে চেয়ে আছে। এসব দেখে বিরক্ত হয়ে পণ্ডিতের বৌ একদিন পণ্ডিতকে বলেন, "ওর আর এখানে মন টিকছে না। যত তাড়াতাড়ি পারো ওকে বিদায় করো।"

কোন কোন সময় আবার মেয়েটা রাতে কিউ বাওকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে কোন খারাপ স্বপ্ন দেখে আঁৎকে জেগে উঠতো! মায়ের কান্নায় ছেলের ঘুম যেত ভেঙ্গে।—সেও মায়ের সঙ্গে কান্নায় যোগ দিত। একবার এরকম পরিস্থিতিতে পণ্ডিত তাকে বলেছিলেন, "কি হলো ? হয়েছে বা কি ?"

কোন জবাব না দিয়ে মেয়েটি কিউ বাও এর পিঠ চাপড়াতে থাকে। পণ্ডিত বলে, "তুমি কি স্বপ্নে দেখলে যে তোমার বড় ছেলে মারা গেছে ? কি চীৎকাররে বাবা। ঘুম ভেঙ্গে গেল।"

মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, "মনে হল যেন আমার সামনে কবর দেখলাম।"

পণ্ডিত একেবারে চুপসে যান। ভাড়াটে বৌ বেশ বুঝতে পারে যে তার সামনে একটা অসুস্থ কল্পনা যেন সদা সর্বদা ঝুলে রয়েছে। পরিস্কার সে দেখতে পাচ্ছে যে সে ক্রমশঃ কবরের দিকে চলেছে।

শীত শেষ হতে চললো। পাখীরা সব মেয়েটার জানলায় বসে তাদের কিচির-মিচির ডাক স্নুরু করে দিয়েছে। ওদের ডাক শুনে মনে হয় যে এখান থেকে মেয়েটি যাতে চলে যায় তারাও যেন সে ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী। কিউ বাও এখন আর মায়ের দুধ খায় না। স্নুতরাং তার সাথে তার মায়ের বিচ্ছেদ—স্থায়ী বিচ্ছেদ—এখন একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার।

যেদিন মেয়েটি চলে যাবে সেদিন সকালে পণ্ডিতের বৌকে রাঁধুনি জিজ্ঞেস করে :

"মা ওকে একটা পাল্কি ভাড়া করে দিলে হয় না ?"

জপমালা জপতে জপতে পণ্ডিতের বৌ জবাব দেন :

"পায়ে হেঁটেই ওর যাওয়া ভালো। এখন ভাড়াটা ওকেই দিতে হবে। এত টাকাই বা ও পাবে কোথায় ? আমিও জানি দিনে তিনবার খাওয়ার মত অর্থ ই ওর স্বামী দৈনিক জোগাড় করতে পারে না। তাই এত জাঁক না দেখানোই ভালো। এখান থেকে ওর বাড়ীটার দূরত্ব ত বেশী নয়।

একাই আমি অনেক দিন চল্লিশ লি রাস্তা হাঁটি। আর ওত হাঁটায় আমার থেকে বেশী অভ্যস্ত। ঠিক বারো ঘন্টায় ওর বাড়ী পৌঁছান উচিত।"

সেদিন সকালে মেয়েটা কিউ বাওকে জামা পরাচ্ছে। দুগাল বেয়ে তার চোখে জলের ধারা নেমেছে। ছেলে তাই দেখে ডাকে, "পিসি, পিসি" বলে। [পণ্ডিতের বৌ ছেলেকে শিখিয়েছেন নিজের মাকে পিসি বলে ডাকতে আর নিজেকে মা বলে ডাকতে।] কান্নায় মেয়েটার গলা বুজে আসে। কোন উত্তর তাঁর মুখে জোগালো না। সে বলতে চেয়েছিলো :

"সোনা মানিক আমার! তোমার মা তোমায় ভালোবাসেন। ভবিষ্যতে তাঁর সাথে ভালো ব্যবহার করো। আর চিরকালের মত আমায় ভুলে যেও।" কিন্তু এত সব কথা তার মুখে থেকে বেরুলোই না। কেন না ছেলেটার বয়স এখন মাত্র দেড় বৎসর। যদি সে কোন কথা বলেও তার অর্থ কিন্তু কিউ বাও বুঝতেই পারবে না।"

এক সময় পণ্ডিত চুপিসারে মেয়েটার পেছনে এসে দাঁড়ান। তার হাতে দশটি রৌপমুদ্রা দিয়ে বলেন :

"ডলার দুটো তোমার কাছে রেখে দাও।"

বাচ্চার জামার বোতাম এঁটে দিয়ে মেয়েটি ডলার দুটো নিজের পকেটে রাখে।

এই সময় আবার পণ্ডিতের বৌ এঘরে এসে উপস্থিত। এঘরে থেকে দ্রুত চলে যাওয়া পণ্ডিতের পেছনে একদৃস্টে চেয়ে থেকে বলেন :

"কিউ বাওকে এখন আমার কাছে দাও। নয়ত যাবার সময় ও ভীষণ কান্নাকাটি করবে।"

মেয়েটী নিরবে দাঁড়িয়ে থাকে। মাকে আঁকড়ে ধরে থাকে বাচ্চাটি। তার ছোট ছোট হাতে পণ্ডিতের বৌ-কে কিলোতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে পণ্ডিতের বৌ বলেন :

"ঠিক আছে প্রাতরাশ পর্যন্ত ছেলেকে তোমার কাছে রাখতে পারো।"

খাবার সময় রাঁধুনি মেয়েটাকে বেশী করে খেয়ে যেতে বারবার অনুরোধ জানায়।

"গত পনেরো দিন ধরে লক্ষ্য করছি যে তুমি খুব কম খাচ্ছ। আয়নায় একবার নিজের চেহারাটা দেখনা। প্রথম যেদিন এখানে তুমি আস। সেদিনের চেহারার সাথে আজকের চেহারার মধ্যে কত তফাৎ। বেশ রোগা হয়ে গেছ। তোমায় এখন তিরিশ লি রাস্তা যেতে হবে। রাস্তাটা ত কম না। তাই যত পারো খেয়ে নাও। ঐ ভাত কটা অন্ততঃ খাও।"

উদাসীনভাবে মেয়েটি বলে, "তুমি কত ভাল।"

দিনটা সেদিন বড়ই সুন্দর। আকাশে সূর্য্য জ্বলজ্বল করছে। কিউ বাও মাকে আঁকড়ে ধরে আছে। পণ্ডিতের বৌ ছেলেটাকে তার মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিতেই সে তারস্বরে কেঁদে ওঠে। ছোট ছোট হাত দুটো দিয়ে বাচ্চাটা পণ্ডিতের বৌ-এর চুল ধরে টানে। তার পেটে জোরে জোরে লাথি মারে। পণ্ডিতের বৌ-এর পেছন থেকে মেয়েটা অনুরোধ করে ঃ

"দয়া করে আমায় দুপুরের খাওয়া পর্য্যন্ত থাকতে দিন।"

ঘাড় ঘুরিয়ে হিংস্রভাবে পণ্ডিতের বৌ জবাব দেন, "তোমার মালপত্র নিয়ে তৈরী থেকো। আগেই হোক আর পরেই হোক্ তোমাকে ত যেতেই হবে।"

মালপত্র গোছগাছের সময় মায়ের কানে কিউ বাও-এর কান্না ভেসে আসে। রাঁধুনি একপাশে দাঁড়িয়ে তাকে সান্ত্বনা দেয়। আবার সাথে সাথে মেয়েটি কি কি জিনিষ ব্যাগে পুরছে তাও লক্ষ্য রাখে। যে ব্যাগ নিয়ে প্রথম এ বাড়ীতে মেয়েটি প্রবেশ করে আজ সেই একই ব্যাগ নিয়ে বিদায় নিচ্ছে সে এ বাড়ী থেকে।

বাড়ীর ফটকের বাইরে চলে গেলেও তার কানে কিউ বাও-এর কান্না ভেসে আসে তখনও। এমন কি তিন লি রাস্তা পার হয়ে গেলেও সে পরিষ্কার ভাবে কিউবাও-এর গলা শুনতে পায়।

এখন তার সামনে পড়ে রয়েছে আকাশের মতই অসীম রোদ্রস্নাত লম্বা বড় মেঠো রাস্তা। স্বচ্ছ পরিষ্কার জলের নদীর ধার দিয়ে যেতে যেতে তার একবার বাসনা হলো জলে ডুবে আত্মহত্যা করার। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পর আবার সে চলতে থাকে।

বিকেল হয়ে গেছে। বয়স্ক এক গাঁয়ের লোককে জিজ্ঞেস করায় তিনি জানালেন যে তাকে এখনও পনেরো 'লি' রাস্তা যেতে হবে।

মেয়েটা বৃদ্ধকে অনুরোধ করে ;

"দাদু আমায় একটা ডুলি ভাড়া করে দেবেন। আর চলতে পারি না যে।"

বৃদ্ধ প্রশ্ন করেন ঃ "মা তুমি কি অসুস্থ।"

"হ্যাঁ দাদু।" এই কথাকটি বলে সেই মেয়েটি গাঁয়ের শেষে মাঠের ধারে ধপ করে বসে পড়ে।

"কোত্থেকে আসছ মা ?"

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ততার পর সে জবাব দেয়, "আজ আমি বাড়ী ফিরছি। সকালে মনে হয়েছিল সারাদিন আমি হাঁটতে পারবো।"

বৃদ্ধ নীরবে তাকে সহানুভূতি প্রদর্শন করে শেষে তাকে একটা ডুলি ভাড়া করে দেন।

ঠিক বিকেল চারটের সময় ডুলি এসে ঢুকলো এক সরু নোংরা গলির ভেতর। মেয়েটির শরীরের চামড়া কুচকে গেছে। গায়ের রংও এখন তার হলদে, মুখ ফ্যাকাশে। ডুলির ভেতর চোখ বুঁজে পড়ে আছে। শ্বাস প্রশ্বাস ক্ষীণভাবে বইছে। গাঁয়ের সকলে তাকে সহানুভূতিও বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করে। ছোট ছোট একদল বাচ্চা হৈ হৈ করতে করতে ডুলির পেছন পেছন ছুটছে। গাঁয়ের মধ্যে এই ছোট্ট একটা ডুলির আবির্ভাব ছোট খাটো একটা আলোড়নের সৃষ্টি করে।

ডুলির পেছন পেছন যে বাচ্চার দল ছুটছিল তাদের মধ্যে চুন বাও ছিল। ছেলের দল চেঁচাচ্ছে, গোলমাল করছে ঠিক শূয়োরদের মত। ডুলি বাহকেরা হঠাৎ করে একটা গলিতে বাঁক নেয়। এই গলিতেই চুন বাও-এর বাড়ী। চুনবাও চোখবন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার বাড়ীর সামনে সেটা থামতেই একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দূর থেকে সেটাকে লক্ষ্য করে। যে সব বাচ্চার দল ডুলিটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল মাঝে মাঝে তারা উঁকি দিয়ে ডুলির ভেতর দেখার চেষ্টা করে। ডুলি থেকে নামতেই মেয়েটার মাথাটা হঠাৎ ঘুরে যায়। ঐ নোংরা পোষাক পড়ে তার ঠিক সামনেই যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে রয়েছে সে যে চুন বাও এটা সে প্রথমে ধরতেই পারে নি। তিন বছর আগে এখান থেকে যাবার সময় থেকে এখন অবধি চুন বাও এক ইঞ্চিও লম্বায় বাড়ে নি। আগের মতই সে রোগা রয়েছে। মা ডাকে ঃ

"চুন বাও !"

"ডাক শুনে বাচ্চার দল যে যেদিকে পারলো পালালো। চুন বাও ভীষণ ভয় পেয়ে বাড়ীর ভেতরে চলে গেল।

নোংরা ঘরে মেয়েটা অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। স্বামী স্ত্রী উভয়েই নির্বাক। রাত হলে স্বামী মাথা তুলে বলে ঃ

"যাও তুমি বরং রাতের খাবার রান্না করো।"

বিরক্তি সহকারে মেয়েটি উঠে ঘরের এদিক সেদিক খানিক খোঁজা খুঁজির পর ক্ষীণকণ্ঠে বলে ঃ

"বড় বোয়েমে চাল ত এক কণাও নেই, দেখলাম।"

"বড় লোকের বাড়ীতে থেকে অভ্যস্ত হয়ে গেছ ত! এখন আমাদের চাল বোয়েমে থাকে না। থাকে পিচবোর্ডের বাক্সে।"

শোবার সময় বাবা চুন বাওকে বললে :

"চুন বাও যাও আজ মায়ের কাছে শোবে।"

উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে চুন বাও কেঁদে ফেলে, কান্না শুনে মা ছুটে আসে। বলে : "কি হল চুন বাও?" মা গাল ধরে তাকে আদর করতে যেতেই চুন বাও গাল সরিয়ে নেয়।

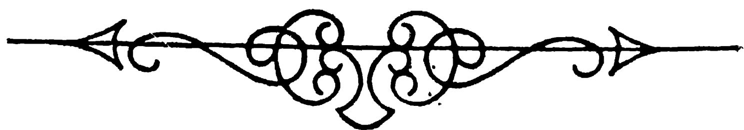
বাবা হিস্ হিস্ করে ওঠে।

"নিজের মাকে পর্যান্ত ভুলে গেছিস্? পিঠে ঘা কতক দেওয়া দরকার দেখছি।"

সরু নোংরা তক্তার উপর মা শুয়ে আছে জেগে। অপরিচিতের মত পাশে শুয়ে আছে চুনবাও। মায়ের মনটা এখন উদ্বেলিত। তার মনে হল সে যেন দেখতে পাচ্ছে তার ছোট ছেলে-মোটাসোটা ফরসা ও সুন্দর—তাঁর পাশে কুঁকড়ে শুয়ে রয়েছে। কিন্তু যেই তাকে জড়িয়ে ধরতে যায় তখন দেখে এত কিউ বাও নয়, ও তো চুন বাও এখ্‌খনি মাত্র সে ঘুমিয়ে পড়লো। ছেলেটার শ্বাস প্রশ্বাস ক্ষীণভাবে বইছে। মায়ের বুকে গভীরভাবে তার মুখটা চাপা। মা তাকে জোড়ে আঁকড়ে ধরে।

নিস্তব্ধ হিমশীতল রাত যেন চলেছে অনন্তকাল ধরে··চলেছে···ধুঁকে ধুঁকে···।

লেখক—রৌ শী



শ্রীযুক্ত হুয়া ওয়েই

ঠিকুজি কুলুজি যদি ঠিক মত দেখা হয় ত দেখা যাবে লোকটা আমারই কোন এক জ্ঞাতি কুটুম। আমি ওঁকে বরাবরই শ্রীযুক্ত হুয়া ওয়েই বলে ডাকতাম। উনি মনে করতেন এই ধরণের সম্বোধন মোটেই খুব ভালো নয়।

বলতেন, "শোন শোন তিয়ান্যি ভাইটি আমার। আমার নামের প্রথমের ঐ শ্রীযুক্ত কথাটা বাদ দিয়ে দাও না। আমায় শুধু ওয়েই ভাই বা আহ্ ওয়েই বলে ডেকো—কেমন ?"

এই সব মন্তব্য করার পর তিনি টুপি মাথায় দিয়ে বলতেন ঃ

"তিয়ান্যি ভাই চলো না একদিন আমরা গল্পগুজব করি। বরাবর তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে চেয়েছি কিন্তু কখনও আমার সময় হয়ে ওঠে নি। এই দেখনা জেলা শাসকদের অবসর সময়ের জন্য কাজের পরিকল্পনার একটা খসড়া করেছেন সভাপতি লিউ। উনি এ বিষয়ে আজই আমার একটা মতামত চান এবং খসড়াতে কিছু সংশোধনী ও চেয়েছেন। বিকেল তিনটের সময় আবার আর একটা মিটিং আছে।"

এইবারে উনি মাথা ঝাঁকিয়ে একটু কাষ্ঠ্যহাসি হাসেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন যে কৃচ্ছসাধন করতে তিনি মোটেই ভীত নন ঃ কেন না জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে সকলকেই কিছু না কিছু কষ্ট স্বীকার করতেই হবে। আসলে তিনি এসব কথা বলে যা বোঝাতে চান তা হলো তাঁর হাতে যথেষ্ট সময় থাকা দরকার।

"ওদিকে আবার হ্যাংকৌ যাবার অনুরোধ জানিয়ে কমিশনার ওয়াংগ তিন তিনটে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। ঈশ্বরই জানেন এত সব করার সময় কেমন করে পেরে উঠবো।"

এইসব কথা বলে আমার সঙ্গে চট করে করমর্দন সেরে নিজের রিক্সায় চড়ে বসতেন।

তিনি সব সময় রাস্তায় বার হতেন বগলে একটা ব্যাগ, আর হাতে একটা কালো চকচকে হাতলওয়ালা বেড়াতে যাবার লাঠি নিয়ে। বাঁ হাতের অনামিকায় থাকতো বিবাহের আংটি। যখন তিনি চুরুট টানতেন তখন এই আংটির আঙ্গুলটা অল্প বেঁকাতেন এবং তার সাথে করে আঙ্গুলটা এমনভাবে উপরে ধরে রাখতেন যাতে তা বিশেষ ধরণের একটা ফুল বলে মনে হয়।

শহরের সাধারণ রিক্সাওযালারা দ্রুত ছোটে না। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এমনভাবে চলে যা দেখলে মনে হয ওরা, বোধহয রাতের ভোজ সেরে পায়চারী করতে বেরিয়েছে। তবে নিজস্ব রিক্সাওযালা এ ব্যাপারে ব্যাতিক্রম বিশেষ। ডিঙ্গ-ডিঙ্গ, ডিঙ্গ-ডিঙ্গ করে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে তারা জোর করে এগিয়ে যায। ঘন্টার শব্দে অন্যান্য রিক্সাওযালারা সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার বাঁ ধারে সরে যায। কাঁঠের বাঁক্ দ্রুত রাস্তার ধারে ফেলে দেওযা হয়। পথচারীরা তাড়াতাড়ি রাস্তার দুধারে দোকানে আশ্রয নেয।

অবিরাম বেজে চলতো ব্যক্তিগত রিক্সার ঘণ্টা; তাদের ইস্পাতের তার রোদে চক্ চক্ করতো। ওদেরকে পরিষ্কার ভাবে কোন সময়ই দেখা যেত না।—এক মুহুর্তে তারা চলে যেত অনেক দূরে—অনেক অনেক দূরে—বিদ্যুতের মত দ্রুত গতিতে।

এবং জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের সময অনেক উচ্চপদস্থ শ্রমিকদের সংগৃহীত তথ্যানুযাযী সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী রিক্সা ছিল শ্রীযুক্ত হুযা ওযেই-এর।

সময ব্যাপারটা তার কাছে ছিল সর্বাপেক্ষা প্রযোজনীয ব্যাপার। একবার তিনি বলেছিলেন ঃ

"যদি কেবল রাতে ঘুমানোর রেওয়াজটা বাতিল করা যেত তাহলে কত কিছুই না করা যেত। আমার ইচ্ছা যে একদিনের সমযসীমা ২৪ ঘণ্টারও বেশী থাকা দরকার। কেন না জাতিয় মুক্তি সংগ্রামের বহু কাজ এখনও করার আছে।"

তিনি ঘড়িটা বার করে তা একবার দেখেন। তার মোটা মুখের পেশী-গুলো সব টান টান হয়ে ওঠে। ভ্রূদুটো তাঁর কুঁচকে যায় এবং খুব কষ্ট করে ঠোঁটটা বেঁকিয়ে দেন—দেখে মনে হয তিনি যেন তাঁর মুখে সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলে যান ঃ তাঁকে এখনই উদ্বাস্তু ত্রাণ কমিটিতে একটা সভায় যেতে হবে।

যথারীতি দেখা গেল সভাকক্ষে অনেক আগে থেকেই লোকজনেরা

জড়ো হয়ে সেখানে বসে তাঁর অপেক্ষায় রয়েছেন। সভাকক্ষের প্রবেশ দ্বারে তিনি রিক্সা থেকে নেমে আসেন। নামবার সময় হঠাৎ তাঁর পাটা পায়ের কাছে ঘণ্টার উপর পড়ায় আওয়াজ হয়—ডিংগ।

কমরেডরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বলাবলি করেন, "ঐ, শ্রীযুক্ত হুয়া এসে গেছেন।" তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দীর্ঘশ্বাস নেন, কেউ কেউ মুখটা লম্বা করে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকেন। একজন আবার এমন কি হাতটা মুঠো করে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন—দেখে মনে হয় তিনি যেন লড়াই-এর জন্য তৈরী!

অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তির মতই শ্রীযুক্ত হুয়া শ্লথ গতিতে হেঁটে চলেন। এবং তাঁর এই গাম্ভীর্য্যের পরিবেশ সভাকক্ষের দুমিনিট আগেকার সেই কোলাহলকে কোথায় যেন উবে দিয়েছে। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য তিনি সভাকক্ষের দরজায় দাঁড়ান—যাতে করে সকলে তাঁকে ভালো করে দেখার সুযোগ পান এবং যাতে করে কমরেডদের মনে উৎসাহিত হবার জন্য আস্থা জাগে এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করে যে, যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন তাঁরা হচ্ছেন তার মোকাবিলা করতে যেন কোন অসুবিধে না বোধ করেন তাঁরা। তিনিও মাথা নাড়েন। বিশেষ কারুর উপর দৃষ্টিপাত না করে তিনি কড়ি কাঠের দিকে চেয়ে থাকেন। এটা হচ্ছে সমগ্র জনতাকে অভিবাদন করার এক ধরণের তাঁর পদ্ধতি।

সভাকক্ষ একেবারে চুপ। সভা সুরু হয়ে গেল। কেউ কেউ পাতা ওল্টাচ্ছেন—কাগজের খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে।

সভাকক্ষের সবচেয়ে উপেক্ষিত কোনটিতে—সভাপতির চেয়ার থেকে অনেক দূরে তিনি বিনম্রভাবে বসে পড়েন। সভার সভাপতি হওয়ার প্রস্তাবে তিনি তাঁর অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

"আমি সভাপতি হয়ে কাজ চালাতে পারবো না," চুরুট হাতে তিনি এক ভংগী করে বলেন ঃ

"আজকে শ্রমিকশ্রেণীর জাতীয় মুক্তি সংস্থার পরিচালক বর্গের কমিটির স্থায়ী কমিটি একটা মিটিং ডেকেছে। আবার জনপ্রিয় শিল্প ও সাহিত্যের উপর গবেষক সংস্থার মিটিং ঐ আজকেই। আহত সৈনিকদের ত্রাণ লীগের ডাকা একটা মিটিং এ উপস্থিত থাকতে হবে আমায় অল্পক্ষণ বাদেই। তোমাদের জানা আছে নিশ্চয়ই আমার হাতে যথেষ্ট সময় নেই। এখানে কেবল দশ মিনিট থাকার অনুমতি পেয়েছি। আমি বরং সভাপতি হিসেবে কমরেড লিউ-এর নাম প্রস্তাব করছি।"

এই কথা বলে তিনি আস্তে আস্তে হাততালি দেন ; মুখের কোণে তাঁর লেগে থাকে এক টুকরো হাসি। তাঁর চুরুট ধরাতে দেশলাইতে কাঠি ঘসতেই থাকেন। তাঁর সামনে ঘড়িটা রেখে অনবরত তা এমনভাবে তিনি দেখতে থাকেন যা দেখে মনে হয় তিনি কোন কিছু অঙ্ক কষছেন।

বেশ জোড়ে তিনি বলেন ; "আমার একটা প্রস্তাব রাখছি। আমাদের সময় অত্যন্ত মূল্যবান। আশা রাখি যে সভাপতি যতটা সম্ভব তাঁর রিপোর্টকে সংক্ষিপ্ত করবেন। এটাও আমি আশা করবো যে তিনি পরের দুমিনিটের মধ্যেই তাঁর বক্তব্য শেষ করবেন।"

আবার দু মিনিট ধরে দেশলাই জ্বালার চেষ্টা করার পর তিনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন। হাতের ঈশারা করেন তিনি সভাপতিকে ; তিনি তখনও বক্‌বক্‌ করে চলেছেন।

"ঠিক আছে! ঠিক আছে! যদিও সভাপতি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন নি তাহলেও তিনি যা বলতে চায তা আমি সব বুঝেছি। যেহেতু আমায় আর একটা মিটিং এ উপস্থিত থাকতে হবে তাই প্রথমে আমায় কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করতে দিন।"

তিনি এক মুহূর্ত থেমে সিগারে দুটো টান মেরে দর্শকদের চতুর্দিকে একবার দেখে নেন।

"দুটি সাধারণ প্রস্তার পেশ করছি।" ঠোঁটটা তিনি একটু ভিজিয়ে নেন।

"প্রথমতঃ সবাইকে সমস্ত রকমের শিথিলতা এড়াতে হবে। বিপরীতে আপনাদের প্রচেষ্টাকে দ্বিগুণ বাড়াতে হবে। এটার উপর জোর দেবার দরকার নেই, কারণ আপনারা সকলেই প্রচণ্ড পরিশ্রমী যুবক যাঁরা নিজেদের কাজে প্রবল আগ্রহী। আমি আপনাদের কাছে ভীষণ ভাবে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আরেকটি বিষয় রয়েছে যা আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে—আর এটাই হচ্ছে আমার দ্বিতীয় পয়েণ্ট।"

তিনি আরও দুবার চুরুট টানেন ; তবে কিন্তু মুখ এবার কেবল গরম বাতাস বেরিয়ে আসে। আর একটা কাঠি জ্বালালেন তিনি।

"দ্বিতীয় পয়েণ্ট হচ্ছে যে যুব সমাজ কেবল একটি মাত্র কেন্দ্রকেই যেন স্বীকৃতি দেন। এবং কেবল একটি মাত্র নেতৃস্থানীয় কেন্দ্রের নেতৃত্বে আপনারা সকল স্তরের কর্মীদের সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করতে পারবেন। এবং কেবল মাত্র একটি নেতৃস্থানীয় কেন্দ্রের নেতৃত্বেই জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের বিকাশ ঘটাই সম্ভব। যুব-সমাজ উৎসাহী এবং কঠোর পরিশ্রমী কিন্তু

তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে ; ভুল করা তাঁদের পক্ষে সহজ। তাঁদের মাথার উপরে যদি কোন নেতৃস্থানীয় কেন্দ্র না থাকে তাহলে তাঁরা সংশোধনাতীত ভুল করে বসবেন।"

তাঁর চতুর্দিকে বসে থাকা মানুষগুলোর মুখের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করতে করতে তাঁর মুখের পেশীগুলো সব সংকুচিত হয়ে মুচকি হাসিতে পরিণত হয়। তিনি বলে চলেন, "আপনারা হচ্ছেন আমাদের তরুণ কমরেড তাই আমি আপনাদের কাছে খুব খোলাখুলি সব কথা বলবো। আপনারা সকলে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে চান তাই আপনাদের ঠনকো প্রশংসা করার দরকার নেই। আমি ধরে নিচ্ছি যে আমাদের প্রতিটি তরুণ কমরেড আমার প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমায় চলে যেত হচ্ছে বলে ক্ষমা করবেন।

তিনি মাথায-টুপি দিয়ে, ছোট্ট ব্যাগটা বগলদাবা করে। কড়িকাঠের দিকে মাথা আলত করে, বাইরের দিকে ভুঁড়ি বার করে বেরিয়ে যান।

প্রবেশ দ্বারের কাছে পৌঁছে কিছু একটা ব্যাপার তার মনেপড়ায় আবার ফিরে এসে সভাপতিকে এক ধারে টেনে নিয়ে চাপাস্বরে তাঁকে বলেন ঃ

"আপনাদের কাজ .....আপনাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে না ত?" তিনি জানতে চান।

"এইমাত্র যে রিপের্ট আমি রাখলাম তাতে আমি একটা জিনিষের কথা উল্লেখ করেছি ··

শ্রীযুক্ত হুয়া সভাপতির বুকে আঙুলের টোকা সেরে বলেন ঃ

"আহা, হা, হা,... ..আমি জানি, জানি, কিন্তু ও ব্যাপারে আলোচনা করার মত যথেষ্ট সময় আমার হাতে নেই।" পরে—আপনার মনে যদি কোন পরিকল্পনা থাকে ত তা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে আমার বাড়ী আসতে পারেন।"

সভাপতির পাশে বসা লম্বা চুল বিশিষ্ট যুবকটি তাঁদের গভীর মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করছিলেন, তিনি এখন অধৈর্য্য হয়ে বলে ফেলেন ঃ

"গত বুধবার আপনার সাথে দেখা করতে তিনবার আপনার বাড়ী গিয়েছিলাম কিন্তু আপনি বাড়ী ছিলেন না।"

শ্রীযুক্ত হুয়া চুপচাপ একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থেকে তারপর নাকি সুরে বলেন ঃ

"ওহো! হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু হাতে তখন আমার অন্য একটা কাজ ছিল।" এবং তারপর সভাপতির সঙ্গে কথাবার্তা চাপাস্বরে চালিয়ে যান ঃ

"আমায় যদি বাড়ীতে না পান ত কুমারী হুহাংগ-এর সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। তিনি আমার দৃষ্টি ভঙ্গীর সাথে পরিচিত এবং তিনি আপনাকে পরামর্শ দিতে পারবেন।"

কুমারী হুয়াংগ হচ্ছেন ওঁর স্ত্রী। একজন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে তিনি সর্বদা তাঁকে ঐ নামে সম্বোধন করেন।

এইসব কথাবার্তার পর তিনি দ্রুত ঐ জায়গা ছেড়ে চলে যান। অল্পক্ষণ পরেই এসে হাজির হন জনপ্রিয় শিল্প সাহিত্য গবেষণা সংস্থার মিটিং-এ। তিনি দেখলেন যে মিটিং সরু হয়ে গেছে এবং মাইকে কেউ একজন তাঁর মতামত বলে চলেছেন। তিনি চেয়ারে বসে মৃদু হাততালি দেন কিছুটা মনমরা ভাবে।

তিনি বলেন। "সভাপতি মশাই, যেহেতু আমায় আজই অন্য আরেকটা মিটিং এ উপস্থিত থাকতে হবে তাই এই সভা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আমি ত অপেক্ষা করতে পারবো না। আমার কিছু প্রস্তাব এখন এখানে আমি পেশ করতে চাই।"

অতএব তিনি দুটি প্রস্তাব উল্লেখ করেনঃ প্রথমত, তিনি তাঁদের বলেন যে উপস্থিত সকলেই যেহেতু স্থানীয় সাংস্কৃতিক চক্র থেকে এসেছেন তাই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং তা কার্য্যকরী করতে হবে আরও বেশী উদ্যমের সাথে। দ্বিতীয়ত, সাংস্কৃতিক কর্মীদের উচিত একটি মাত্র নেতৃস্থানীয় কেন্দ্রকে স্বীকৃতি দেওয়া, এবং একটি স্থানীয় নেতৃত্বদানকারী কেন্দ্রের নেতৃত্বাধীনেই সর্বস্তরের কর্মীদের সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করতেই হবে।

পৌনে ছটার সময় এসে হাজির হন শ্রমিকদের জাতীয় মুক্তি সংস্থার পরিচালকমণ্ডলীর সম্মেলন কক্ষে।

এখানেই কেবল তাঁর মুখে হাসি হাসি ভাব দেখা যায় এবং তিনি সকলকে অভিভাদন করেন।

"আমি ভীষণ দুঃখিত। ঠিক ৪৫ মিনিট দেরিতে এসেছি।"

সভাপতি তাঁর দিকে চেয়ে মুচকি হাসেন এবং হাসতে হাসতেই তিনি জিভ কাটেন? যা দেখে মনে হয় তিনি যেন কোন অপরাধ করেছেন এবং তার জন্য তিনি প্রাপ্য তিরস্কারের ভয়ে ভীত। চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে শ্রীযুক্ত হুয়া একটি ভদ্রলোকের পাশে চেয়ারে বসে পড়েন, ভদ্রলোকের ছোট গোঁফ আছে একটা।

অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয় কিছু একটা বলছেন এই অভিব্যক্তি

মুখে এনে মৃদুস্বরে তিনি বলেন তাঁকে, "গতরাতে মাতাল হয়ে পড়েছিলে নাকি ?"

"আমি ঠিক ছিলাম। কেবল মাথাটা সামান্য ঘুরে যায়। তোমার কি ব্যাপার ?"

তিনি গম্ভীর স্বরে বলেন, "আমার ? তিন গ্লাস অত কড়া মদ খাওয়া আমার উচিত হয় নি। বিশেষ করে সানশি প্রদেশের মদ আমি বেশী খেতে পারি না। পরিচালক লিউ ওটা শেষ করে ফেলতে ভীষণ জেদ করেন। বাড়ী পেঁছাতেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার স্ত্রী বললেন সে এ ব্যাপারে পরিচালক লিউ-এর সাথে কথা বলে খোঁজ নেবে যে সে আমায় মাতাল করলো কেন ? দেখুনত আমায় তিনি কত বিপদে ফেললেন।"

এই সব কথাবার্তার পর তিনি ছোট্ট ব্যাগ দ্রুত খুলে তার ভেতর থেকে এক টুকরো কাগজ বার করেন। তাতে কয়েকটি কথা খস্‌খস করে লিখে সভাপতিকে সেটা বাড়িয়ে দিলেন।

যিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন বাঁধা দিয়ে তাঁকে থামিয়ে সভাপতি বলেন, "এক মিনিট চুপ করুন। শ্রীযুক্ত হুয়া ওয়েইকে অন্য একটা কাজে বেড়িয়ে যেতে হবে। তাঁর কতকগুলো প্রস্তাব রয়েছে তিনি সেগুলি এখনই পেশ করতে চান।"

তিনি অভিভাদন জানিয়ে শুরু করেন, "সভাপতি মশাই! ভদ্রমহোদয়গণ।" এই বলে তিনি আবার মাথা নত করেন। "প্রথমেই আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি দেরী করে এই সভায় আসার এবং শীঘ্রই এই সভা থেকে চলে যাওয়ার জন্যে।"

তারপর তিনি তাঁর প্রস্তাবগুলি সব রাখেন। তিনি ঘোষণা করেন যে পরিচালক মণ্ডলী হচ্ছে নেতৃস্থানীয় সংস্থা এবং এটি সকল সময় নেতৃত্বদানকারী কেন্দ্র হিসেবেই কাজ করবে।

"জনগণ অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। এটা ভীষণ ভীষণ রকমের বিপজ্জনক হয়ে উঠবে যদি আমরা এটাকে আমাদের নেতৃস্থানীয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করাতে না পারি। আসলে এখানে সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব-দানকারী সংস্থার প্রয়োজন। আমাদের খুব বেশী পরিমাণ দায়িত্ব বহন করতে হবে ; সে যত অসুবিধাই হোক না কেন আমাদের এই দায়িত্ব বহন করা উচিত।"

নেতৃত্বদানকারী কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তার উপর বারবার গুরুত্ব

আরোপ করে তিনি টুপিটা মাথায় চড়িয়ে সোজা চলে আসেন নৈশভোজে। এভাবেই তিনি প্রতিদিন ব্যস্ত থাকেন। প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয়ের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পরিচালক লিউ-এর দপ্তরে যেতে হয়। বিভিন্ন সংগঠনের সভায় উপস্থিত থাকতে হয় তাঁকে এবং প্রতিদিনই হয় তিনি কোন নৈশ ভোজে নিমন্ত্রিত হন বা নিজ বাড়ীতে নিজেই অন্যান্যদের নিমন্ত্রণ করেন।

ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে যতবারই আমার দেখা হয়েছে ততবারই তিনি আমায় শ্রীযুক্ত হুয়ার পরিশ্রমের কথা তুলে অভিযোগ করেছেন।

"ওহোঃ! তাঁকে কি যে পরিশ্রম করতে হয় না তা কি বলবো। এত কাজ তাঁকে করতে হয় যে এমন কি তাঁর খাবারের সময় পর্য্যন্ত মেলে না।"

"উনি অল্প দায়িত্ব নিয়ে একটা কাজেই কেবল মনোনিবেশ করছেন না কেন?"

"সেটা কেমন করে উনি করবেন, সব গায়গায় ওঁকেই নেতৃত্ব দিতে হবে না?"

কিন্তু একবার শ্রীযুক্ত হুয়া বেশ আতংক গ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। মহিলাদের একটি সংস্থার কয়েকজন লোক ওঁকে না জানিয়ে যুদ্ধকালীন শিশু পালনাগার একটা গড়ে তোলেন।

তিনি এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে এবং তদন্ত করতে শুরু করে দেন। এই ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিকে খুজে বার করতে বহু ভাবেই চেষ্টা চালান শ্রীযুক্ত হুয়া।

"আমি জানি যে আপনাদের নির্বাচন করা কমিটি গঠিত হয়ে গেছে। আমি মনে করি আপনারা আরও বেশী সদস্য কমিটিতে গ্রহণ করতে পারেন।"

যখন তিনি দেখলেন যে ওরা এই কথায় আম্‌তা আম্‌তা করছে তখন তিনি চুপসে গেলেন।

"কথা হচ্ছে যে তোমাদের এই কমিটির পক্ষে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব কি? এই গ্যারান্টি কি তোমরা আমায় দিতে পারো যে তোমাদের কমিটিতে ক্ষতিকারক লোক নেই? তোমরা কি আমায় এই গ্যারান্টি দিতে পারো যে ভবিষ্যত কাজে কোন ভুল-চুক হবে না। কোন শিথিলতা থাকবে না? গ্যারান্টি কি দিতে পারো? পারো কি? যদি তা পারো আমাকে অনুগ্রহ করে সেটা লিখিতভাবে দিও এবং পরে যদি কোন অসুবিধেয় পড়ো ত তার দায়িত্ব তোমাদের।"

তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, "এটা তাঁর নিজের ধারণা নয়। একে কার্য্যকারী হওয়াটা দেখা তাঁর কাজ।" এই কথা বলে অপর জনের বুকে আঙ্গুল দিয়ে টোকা মারেন।

"যে যে জিনিষগুলোও উল্লেখ করলাম তার গ্যারান্টি যদি আমায় না দিতে পারো তাহলে বলা যাবে না কি যে তোমাদের সংগঠনটা বে-আইনী সংগঠন হতে চলেছে?"

এই ধরণের দুদফা কথাবার্তা আলোচনার পর সেই যুদ্ধকালিন শিশু পালনাগারের কমিটির সদস্য তাঁকে করে নেওয়া হয়। তারপর থেকে যতবারই কমিটির সভা ডাকা হয়েছে ততবারই ছোটব্যাগ বগলে নিয়ে তিনি পাঁচ মিনিটের জন্য সভায় উপস্থিত থেকে একটি বা দুটি প্রস্তাব পেশ করে তাঁর ব্যক্তিগত রিক্সার চড়ে বসেন।

একদিন তিনি আমায় তাঁর বাড়ীতে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি বলেন যে তাঁর নিজের দেশ থেকে কেউ একজন লবণজারিত মাংস তাঁকে দিয়ে গেছেন। তাঁর বাড়ীতে এসে দেখি যে ছাত্রের মত দেখতে দুজন ছেলের সাথে কথা বলতে বলতে তিনি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলছেন।

তিনি গর্জন করে বলেন, "তোমরা গতকাল যাও নি কেন? তোমাদের আমি বলেছিলাম বেশকিছু লোকজন নিয়ে যেতে। আমি যখন বক্তৃতা করতে মঞ্চে উঠলাম এমন কি তোমরা পর্য্যন্ত যে নেই! আমি সত্যই বুঝতে পারছিনা আসলে তোমরা কি চাও?"

"গতকাল আমি সদ্য সংগঠিত উদ্বাস্তুদের পাঠ চক্রে গিয়েছিলাম।"

"কি বললে, কি বললে?" "সদ্য সংগঠিত উদ্বাস্তুদের পাঠচক্র, এটা আমি কেন জানি না?" "আগে তোমরা আমায় এ বিষয়ে বলো নি কেন?"

"এ ব্যাপারে এই ত সেদিন আমরা সিদ্ধান্ত নি। অনেকবার এ ব্যাপারে আপনার খোঁজ করি। আপনি কিন্তু কোন সময় বাড়ী ছিলেন না......।"

ক্রুদ্ধভাবে ওদের মধ্যে একজনের দিকে চেয়ে গর্জন করে ওঠেন, "তাহলে তোমরা গোপন কাজকর্ম চালাচ্ছ? তোমরা সত্য করে বলবে কি এই পাঠচক্রের পেক্ষাপটটা কি? সত্যিকথা বলো।"

অন্যজনা ত ক্ষেপে লাল।

"কিসের প্রেক্ষাপট? কোন গোপন কাজকর্ম নেই......। আমরা সবাই চীনা জাতি। এটা মন্ত্রিদের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত। আপনি আমাদের মিটিং-এ উপস্থিত থাকেন নি সেদিন, বা যদিও থাকেন ত সভা শেষ হওয়া

পর্যন্ত থাকেন না। আবার যখন আপনার খোঁজ করি তখন দেখি আপনি বাড়িতেও নেই।—আমরা ত কাজকর্ম বন্ধ করে রাখতে পারিনা।"

চুরুটটা সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শ্রীযুক্ত হুয়া প্রচণ্ড রাগে টেবিলে সজোরে একটা ঘুঁসি মারেন—ডং!

দাঁত কড়মড় করে ঠোঁট কাঁপিয়ে তিনি বলেন, "বোকা, গাধা! সাবধানে কথা বলো! তোমার······তোমার······।" ধপ্ করে বসে পড়েন; যন্ত্রণায় তাঁর মুখটা সংকুচিত।

"সকলে চুলোয় যাক্!······বাচ্চা বোকার দল সব...।"

পাঁচ মিনিট পরে, মাথা তুলে চতুর্দিকটা একবার দেখে নেন। তাঁর দুজন অতিথি চলে গেছে। তিনি সজোরে একটা গভীর শ্বাস নেন।

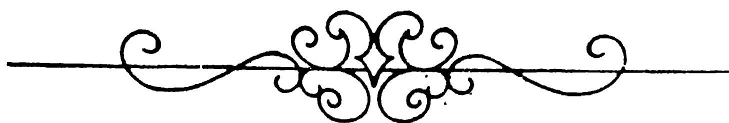
"দেখলে? দেখলে ত? তিয়ান্যি ভাইটি আমার। আজকাল কার ছেলেদের সাথে কথা বলাই দায়।"

সব রকমের বাধা কাটিয়ে ছেলে দুটোকে গালি গালাজ করতে করতে সেদিন বিকেলে তিনি আকণ্ঠ মদ্যপান করেন। একটি চায়ের কাপ ভেঙ্গে ফেলেন। যখন তাঁর স্ত্রী বিছানায় শুতে সাহায্য করতে থাকেন ঠিক সেই সময় থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন তিনি:

"কাল সকাল দশটায় আবার একটা মিটিং আছে।"

———

লেখক—ঝাংগ তিয়ান্যি



শ্রীমতী শী কুইংগ

অন্যান্য দিনের মত আজও প্রভাতি সূর্য্যকিরণছটা ছড়িয়ে পড়েছে বৃক্ষরাজিপূর্ণ ঐ উপত্যকায়, শিশির ভেজা ঘাসে ও পাতায় সেই ছটা পড়ায় তাদের আরও চকচকে দেখাচ্ছে। দিনটা যতই সুন্দর হোক না কেন, শ্রীমতী শী কুইংগ কিন্তু আজ ভীষণভাবে বিমর্ষ। বেদনার্ত মুখটা তাঁর মেঘে ঢাকা আকাশের মত কালো ও ভারি।—যে কোন মুহুর্তে তাতে ঝড় ওঠার সম্ভাবনা।

বাড়ীর সবকিছুই আজ যেন কেমন অগোছালো। ঘরের ভেতর কাঠের টুলটা উল্টে পড়ে আছে, তেলের কুপিটা ভাঙ্গা। দরজার সামনের মাটিটা পায়ের ছাপের অসংখ্য কাটাকাটি দাগে ভরা। সব্‌জি ক্ষেতের শাক দোমড়ানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বিশেষ যে কারণে মহিলা সবচেয়ে বিমর্ষ তাহলো তাঁর ক্ষেতের টোমাটো সব পদদলিত হয়ে সেখানকার সব মাটিকে লাল রসে চুবিয়ে দিয়েছে। সেই লাল রসকে দেখাচ্ছে ঠিক সেই লাল রক্তের মত যা ঝড়েছিল গতরাতে তার স্বামীর শরীর থেকে বাওঝাংগ (১) এর সঙ্গে লড়াই এর সময়।

সারাদিনে একটি মাত্র যাত্রীবাহী বাস চলে গেলে পাহাড়ের পাশে এই বড় শহরটায় নেমে আসে এক অশুভ নীরবতা। সূর্য্যের আলো পাহাড়ের খাঁজকাটা পাথরে পড়ায় সেগুলোকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন খোস প্যাঁচড়ায় ভরা একটা কুৎসিত টেকো মাথা। দূর থেকে দেখলে মনে হয় পাহাড়ের মধ্যে রাস্তাটা যেন হারিয়ে গেছে। এ চত্বরে সব সময় একটা আদিম বর্বরতার পরিবেশ বিরাজ করে।

শ্রীমতী শী হচ্ছেন এই এলাকার একটিমাত্র পরিবার যিনি বাস করেন এ চত্বরে এক মাত্র কুঁড়ে ঘরে। তার স্বামী যতক্ষণ এখানে ছিলেন ততক্ষণ তিনি কখনও এমন ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা বোধ করেন নি। তিনি সব সময় ব্যস্ত থাকতেন পাহাড়ের ঢাল ও ছোট্ট ঐ নদীটার মাঝের ঢালু

অংশে। দিনে রাতে সব সময় এখানে তাঁকে দেখা যেত। মাথায় নীল রংএর রুমাল জড়িয়ে প্রতিদিন সেখানে যেতেন—হয়, শাক-সব্‌জি তুলতে, আগাছা তুলতে আর না হয় খানিক মাটি খুঁড়তে। এমন কি আকাশে তারা দেখা গেলেও, হালকা বৈকালিক কুয়াশা সমস্ত বনটাকে এবং একমাত্র কুঁড়ে ঘরটাকে গিলে নিলেও, ঘরের দোরে ফেলে আসা শিশুর কান্না স্থুর হয়ে গেলেও দেখা যেত তিনি কাজ করছেন—হয়ত তিনি সেখানে তরমুজ, লঙ্কা বা সীম তুলছেন। পরদিন দেখা যেত এই সব তরিতরকারি নিয়ে তিনি পাঁচ লি দূরে বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে গিয়েছেন, এ সব বেচে তাঁর যা আয় হতো তা দিয়ে চাল কিনে ঘরে ফিরছেন।

এখন গৃহকর্তা শ্রীযুক্ত শী কুইংগ চলে গেছেন—হয়ত চিরকালের মত। গতরাতে তাঁর বিদায়কালে বুক চাপড়ে মাথার চুল ছিঁড়ে মহিলা কি কান্নাটাই না কেঁদেছেন। কিন্তু আজ সকালে দেখা গেল তিনি ঐ ছোট্ট নদীর পারে দাঁড়িয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে আছেন দূরে। মরীয়া হয়ে একগোছা দড়ির দিকে হাতও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন—আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তারপরই তাঁর মনে ভেসে ওঠে পাঁচ পাঁচটি সন্তানের মুখ, কানে সর্বদা অনুরণিত হতে থাকে তাঁদের কচকচানি। ফলে তিনি তাঁর মনকে দৃঢ় করে বাঁধেন আবার।

শ্রীমতী শী জানতেন যে তাঁকে বাঁচতে হবে তাঁর পাঁচটি সন্তানের জন্য—শুধু নিজের জন্য নয়, গতরাতে তিনি তাঁর স্বামীকে রক্ষা করতে গেলে তাঁর হাতে বাওঝাংগ যে আঘাত করেছিল তা বনের গাছ-গাছালির রস দিলে সেড়ে যাবে। তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে তাঁর হাত দুটো যতদিন পর্য্যন্ত অকেজো না হয়ে যাচ্ছে ততদিন তিনি পাহাড়ের ঢালে চাষ বাস করতে পারবেন এবং পাঁচটি সন্তানকে প্রতি পালন করতেও পারবেন। গত নয় বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে শ্রীযুক্ত শী, স্কুলের পরিচারক হিসেবে কোন দিন এমন যথেষ্ট আয় করেন নি যা দিয়ে সমগ্র পরিবারকে খাওয়ান চলে; তাই এই সব্‌জি ক্ষেতকে অজস্র ধন্যবাদ! কেন না এই ক্ষেতে এত ভাল চাষবাস করেন শ্রীমতি শী যাতে করে সমস্ত সংসারটাই সুখে স্বচ্ছন্দে বেশ ভালোভাবেই কেটে যায়।

অতএব শ্রীমতি শী মনস্থির করে ফেলেন যে তাঁকে বাঁচতেই হবে এবং তাই বহু পতিত জমিকে চাষযোগ্য জমিতে রূপান্তরিত করতে হবে! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে তিনি বলেন, "ভগবান, তুমি আমার

মরদকে আশীর্ব্বাদ করো এবং তাকে সুস্থ ও নিরাপদে আমার কাছে ফিরিয়ে দিও।”

আশা আর পরিশ্রমকে সঙ্গী করে তাঁর দিন কাটে। যতই সময় বয়ে যায় ততই তাঁর রোদে পোড়া মুখটা আরও শীর্ণ হয়, চোখ হয় আরও শোকাহত ও পাণ্ডুর। তাঁকে কখনও হাসতে দেখে নি কেউ। আর যেদিন তিনি তরিতরকারি নিয়ে বাজারে যেতেন সেদিন দেখা যেত তিনি সামান্য কারণে লোকদের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে বসতেন।

নয় বছর আগে তাঁদের পুরো পরিবার যেদিন প্রথম এই উপত্যকায় আসেন, সে সময় এখানকার সব জমি ছিল অনুর্বর। জায়গাটা ভরা ছিল কাঁটা ঝোপে, গুল্মজাতিয় ঘাসে, আর আগাছায়। কদাচিৎ এখানে গোরু বা ভেঁড়া চড়তে আসতো, কালে ভদ্রে কাঠুরে ও রাখালের দেখা মিলতো এই সুদুর উপত্যকায় সারা বছর ধরে জীবের অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ ছিল বনের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া পাখী। এটা সত্য যে একবার কি দুবার শিকারীরা এখানে এসেছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাদের আগ্রহ চলে গেল শিকারের অপর্য্যাপ্ততার ও কাপড় চোপড় ছিড়ে যাওয়ার জন্য।

সে যাই হোক্ জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় অন্য এক প্রদেশের রাষ্ট্রীয় কলেজ বোমার আঘাত এড়াতে সে জায়গা ফাঁকা করে দিয়ে এই উপত্যকার বিপরীতে ফাঁকা জায়গায় উঠে আসেন; এবং কলেজের পরিচারক হিসেবে শি কুইংগও ওদের সাথে চলে এসে উপত্যকার এ দিকটায় নিজের বৌ ও শ্বাশুড়ির জন্য একটা কুঁড়ে ঘর বানিয়ে নেন। যেখানে ওদের কুটির সেই জমি সহ স্কুলের মাঠ সরকার অধিগ্রহণ করে কলেজকে দিয়ে দেয়। বিকালে ছাত্রের দল এ পারে এসে পায়চারী করতো, ছোট্ট নদীর ধারে বসে গান গাইতো-সেই গান সমগ্র উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতো। সারা গরমকাল জুড়ে ওরা নৌকা বাইচ করতো—সবুজ বেনুবনের মাঝে তাদের সাদা পোষাক ঝিলিক দিত। সেই সময় কেউই উপত্যকাকে নিঃসঙ্গ বলতে পারতো না।

যে শী পরিবার এই কলেজের সঙ্গে এখানে উঠে এসেছিলো তাঁরা কিন্তু অন্য প্রদেশ থেকে উৎখাত হওয়া উদ্বাস্তু ছিলেন না। তাঁদের বাড়ী —যেখানে তিনি ছিলেন পরের জমিতে ভাড়া খাটা কৃষক—ছিল এই উপত্যকা থেকে মাত্র কয়েক দিনের পথ। কিন্তু তিনি যদি কোন রাষ্ট্রীয় সংগঠনে কাজ করেন তাহলে বাও ঝাংগ তাঁকে আর বিরক্ত করতে আসবে না এই কথা চিন্তা করে শী কুইংগ কাস্তে ফেলে দিয়ে কলেজের চাকুরী

গ্রহণ করেন। সেই দিন থেকে গোরুর শিংএর মত তাঁর শক্ত হাত যা কচি কচি গম, চালকে পরিচর্যা করায় অভ্যস্থ ছিল এতদিন, সেই হাত এখন ছাত্র ও শিক্ষকদের সেবা করতে শিখলো।

যেহেতু চাষ তাঁর মজ্জায় মজ্জায়, তাই পাহাড়ের উর্বর ঢাল তাঁর চোখে পড়ার সাথে সাথেই চাষ করার জন্য তাঁর হাত নিশ পিশ্ করতে থাকে। তাছাড়া, যে হারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে তাতে তাঁর সামান্য বেতনে ও ভরতুকি চালের সাহায্যে সংসার পতিপালনের আশা তিনি করেন না। তাই তিনি বিকেলের ও রোববারের ফাকা সময়টা ব্যয় করতে থাকেন ঐ পাহাড়ের ঢাল থেকে কাঁটাগাছ, গুল্মজাতীয় ঘাস অপসারণে।

এই ফাকে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন তাঁর স্ত্রী আরও বেশী উদ্যম নিয়ে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুবেলার খাবার তৈরী শেষ হলেই দেখা যেত ফ্যাকাশে রংএর পোশাক পড়ে তিনি ক্ষেতের কাজ করছেন, পরণের তাপ্পিমারা কামিজটা হাতের কনুই পর্য্যন্ত গোটানো। প্রায়ই তাঁর হাত কেটে যেত, কাদামাখামাখি হয়ে যেত পরণের পোষাক কিন্তু এই কাজে তাঁর কখনও কামাই দেখা যেত না এমনকি তাঁর অন্তসত্বার সময়েও। আসলে ক্ষেতের কাজটা তিনিই বেশী করতেন। এবং তাঁর এই কর্মদক্ষতার প্রশংসা পেতেন সেই সব অধ্যাপকদের স্ত্রীদের কাছে যাঁরা এদিকে বেড়াতে আসতেন।

এ অঞ্চলের মাটি কিন্তু তাঁদের হতাশ করে নি। বসন্ত ও শীতকালে এই মাটিতে ফলতো শাকসব্জি ; গ্রীষ্মকালে ধান ও রেপসিড হত ; শরতে সীম ও লাউ পাওয়া যেত এ মাটি থেকে। এই সব কিছুই চালের সঙ্গে বিনিময় করা চলতো। শূয়োর, মুরগীও তাঁরা পালতেন এবং তারপর প্রতি বছর অন্তর তাঁদের সংসারে একটি করে শিশু আসা সুরু হয়ে যায় ; শিশুদের কলরবে ছোট্ট কুঁড়েটা জীবন্ত হয়ে ওঠে।

শী কুইংগের মা অসুস্থ হয়ে মারা গেলে পাহাড়ের ঢালু এলাকার শেষে তাঁকে কবর দেওযা হয় যেখান থেকে আত্মা সংসারের উপর নজর রেখে কোন অশুভ শক্তির হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করতে পারবে। এবং প্রতি বছর শীত ও বসন্তকালে যথাযথ গাম্ভীর্য্যের সাথে পুরো সংসারটাকে নিয়ে সেখানে যেতেন তাঁরা, কবরস্থানটা পরিমার্জনা করতে ও পূজো দিতে।

এই উপত্যাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করার দিন থেকে আজ অবধি কেউ তাঁদের বিরক্ত করেনি। আজ পর্য্যন্ত কেউ তাদের খোঁজ

খবর নেননি, জমির ভাড়া বা কর আদায় করতে আসেনি। এবং তাই এঁরা ছিলেন এই উপত্যাকার একমাত্র অবিতর্কিত অধিকারী। অবশ্য "বাও ঝাংগ" একবার এসেছিল এখানে। কিন্তু তিনিও যখন দেখলেন যে শ্রীযুক্ত শী কুইংগ ঐ কলেজের সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে একজন এখন তিনিও কোন উৎপাত করতে সাহস পেলেন না।

কম পুঁজি হাতে নিয়ে তাঁরা ছোট্ট কুঁড়েটা বাড়াতে, তাকে উন্নত করতে সুরু করে দিলেন যাতে করে এটা তাঁদের একটা স্থায়ী পাকাপোক্ত বাড়ী হয়। সেই বাড়ীর চতুর্দিকে কমলালেবুর ও ছোট্ট মিষ্টি লেবুর চারা পোঁতা হল। আর ছোট্ট নদীর ধারে লাগানো হল কিসমিশ্ ও লাউ-এর চারা। শরৎকালে গাছের ডাল ভরা থাকতো সোনালী রংএর ফলে, বসন্তকালে ভরা থাকতো ফুলে,—বছরের প্রায় সব ঋতুতেই এমন সব কোন না কোন আকর্ষণীয় বস্তুতে গাছভরা থাক্‌তো যা উপত্যকার বিপরীত দিকে চলন্ত বাসযাত্রীদের কোন না কোন ভাবে আনন্দ বর্ধন করতই।

সেই সব সময় শ্রীমতি শীর হৃদয় তৃপ্তিতে ভরে থাক্‌তো। কোন কোন সময় যখন কোন বাস ঘড়ঘড় করে সমস্ত এলাকাটাকে কাঁপিয়ে চলে যেত তখন মহিলাটি তাঁর মাথাটা অল্প তুলে এক ঝলক দেখে নিতেন বাসের ছাদ ও ভেতর যথাক্রমে মালপত্র ও যাত্রিতে ঠাসা বাসটাকে। নিজের মনে বিড়বিড় করতেন তিনি, "মানুষগুলো সবসময় এত ছুটে বেড়ায় কেন? আমাদের মত ভিতু হয়ে ঘরে থাকে না কেন?"

জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে যেদিন চীনাদের স্বপক্ষে জয় ঘোষিত হয় তার পর দিনই কলেজটা তার পুরানো জায়গায় ফিরে গেল। সি চুয়ান এর একজন দেশজ লোক হিসেবে এবং একজন বৃহৎ পরিবারের কর্তা হিসেবে ওদের সঙ্গে অতদুরে চলে যাওয়া তার সঙ্গতিতে কুলালো না। প্রায় এক যুগ ধরে যে জমি তিনি নিজহাতে চাষ করেছেন তা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার ব্যাপারেও তার মন সায় দেয় না। অতএব তিনি ও তার পুরো পরিবারবর্গ এই উপত্যকায় রয়ে গেলেন একা।

কলেজের জন্যে সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত জমিটা এখন ফেরৎ দেওয়া হল জমির প্রকৃত মালিক জমিদার উওকে এবং তার জমির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কলেজ বাড়ীটাও ওঁকে দেওয়া হল। ঐ পাথরের তৈরী বাড়িটায় সংসার নিয়ে চলে এলো উও। অধ্যক্ষের ঘরের সামনে ঝোলানো হলো পাখীর খাঁচা। কলেজ অফিস ঘরের দরজা দিয়ে আনাগোনা করতে লেগে গেল মুরগীর দল। দেওয়াল থেকে পলেস্তরা খসে পড়ে যাওয়ায় ছাত্রদের

শোবার ঘর ও ক্লাস ঘরগুলো উত্ত নিজে ব্যবহার না করে ফেলে রেখে দিলেন, সে ঘরগুলো মাকড়সার জালে ভরে গেল।

শী কুইংগ তাঁর চাকরী ত খোয়ালেনই এবং সাথে সাথে কলেজ তাঁকে যে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন তাঁও হারালেন। তাঁদের অস্বস্থি বোধ করানোর জন্যে প্রথম এলেন "বাও ঝাংগ" তারপর কয়েকদিন বাদে তিনি এলেন গুণ্ডা নিয়ে তাঁকে জোর করে কুওমিনটাং সেনা বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করাতে। তারা ওঁকে ভয় দেখালেন ও মুখের সামনে ঘুঁসি দেখিয়ে দেখিয়ে ধমকালেন। তারপর ব্যর্থ সংগ্রামের পর শী কুইংগকে শেষ পর্য্যন্ত এখান থেকে নিয়ে গেল তারা।

উপত্যকাটা একেবারে জনশূন্য হয়ে গেল। বনের ভেতর আর কোন গানই আর প্রতিধ্বনিত হয় না। বিকেলে নদীর এপারে কেউ আর পায়চারী পর্য্যন্ত করতে আসেন না। সমগ্র এলাকা জুড়ে নেমে আসে এক নিরানন্দ নিস্তব্ধতা। কেবল মাঝে মাঝে এদিকে বাস চলে যাওয়ার শব্দ এই নিস্তব্ধতাকে চুরমার করে দেয় দৃঢ়ভাবে ঠোঁট দুটো চেপে ধরে এই নিস্তব্ধতার বিরুদ্ধে তিনি একাই সংগ্রাম করে চলেন, তাঁর এখন বন্ধু বলতে রয়ে গেছে ঐ শীর্ণ নদীটা ও খাঁজকাটা পাথরগুলো সব, আর রয়ে গেছে মৃদু বাতাসে আন্দোলিত গাছগুলো। এমনকি ঘাসে ঢাকা তাঁর মায়ের কবরটাও তাঁর কাছে এখন আনন্দের উৎসবিশেষ। সর্বপোরি তাঁর রয়েছে পাঁচটি সন্তান ওদের মধ্যে দু-একজন মাত্র বড় হয়েছে। ওরা চীৎকার করে হেসেখেলে এলাকাটাকে জমাট করে রেখেছে। ক্রমশ তিনি এই নিসঙ্গতার সঙ্গে নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিলেন। যদিও কোন কোন সময় চলন্ত বাস লক্ষ্য করে তিনি আপন মনে বিড়বিড় করে বলতেন, "আসবে কবে?"

শী কুইংগ চলে যাবার চার মাস বাদে একদিন চারটে লোক মাস্তানির ঢংএ ওদের সব্জি ক্ষেতে এসে হাজির হয়। ওদের মধ্যে দুজনের পরণে খাটো জামা, ওরা ফিতে মাটিতে ফেলে কি সব মাপজোক সুরু করে দেয়। নিজের কোল থেকে বাচ্চা নামিয়ে শী কুইংগ তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "বীজবোনা ক্ষেতের উপর দিয়ে হাঁটবেন না। ওটা আমি এই মাত্র লাগালাম যে।"

কিন্তু তারা মাপজোপ করার যন্ত্রপাতি নিয়ে জমিটা পদদলিত করে তাদের কাজ করেই চলে মহিলার কথায় কর্ণপাত পর্য্যন্ত করলো না।

ভীষণ রেগে তিনি চিৎকার করে ওঠেন, "কালা নাকি। যেমন করতে

বললাম করছেন না কেন? ওভাবে বীজগুলো মাড়িয়ে গেলে আপনাদের কি ধারণা বীজগুলো বাড়বে?"

আমিনেরা মহিলাটির প্রতি উদাসীন ভাবে তাকিয়ে তারা তাদের কাজ করে চলে দেখে মনে হয় যেন এব্যাপারে তাদের কিছু করার নেই।

লম্বা গাউন পরা তৃতীয় ব্যাক্তিটি পাহাড়ের ঢালু জায়গায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে তাচ্ছিল্য ভরে বলে, "চ্যাচাচ্ছিস কেন রে?"

"এটা আমার জমি। তাই প্রতিবাদ করবার অধিকারটুকু পর্য্যন্ত কি আমার নেই।" মহিলাটি রাগে গরগর্ করতে থাকেন।

কুৎসিত হাসি হেসে তৃতীয় ব্যক্তিটি বলে, "তোমার জমি? তাই নাকি?"

দুজন আমিনের একজন বললঃ "এতক্ষণে ঘুম ভাঙলো।"

সিগারেট টানা লোকটি বলেঃ "তোমার জমি? কিনলে কবে?"

কয়েক মুহুর্ত্তের জন্যে প্রশ্নটি তাকে চুপ করিয়ে দেয়। কিন্তু একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে হিসেবে এক মিনিট পড়েই তাঁর উত্তর মিলে যায়।

"নিশ্চয়ই আমার। কলেজ কর্তৃপক্ষ জমিটা আমায় দিয়ে গেছে।"

সিগারেট টানতে টানতে সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি বলেঃ "তোকে দিয়ে গেছে? কলেজকে মামলা করতে বলো তাহলে?"

এই সময়ের মধ্যেই আবার সেই লোকদুটো কুঁড়েঘরের চতুর্দিকের জমি মাপামাপি করতে লেগে যায়। তারা যতই কুঁড়েঘরের দিকে এগিয়ে যায়, শী কুইংগ-এর কুকুর দুটো, যারা দূর থেকে ঘেউ ঘেউ করছিল, তারা হিংস্রভাবে ওদের ভীষণ কাছে এসে পড়ে ডাকতে থাকে। তিনি এত ভীষণ রেগে গেলেন যে কুকুরগুলোকে চলে যাবার জন্যে তাঁর আঙ্গুল দিয়ে ঈশারা পর্য্যন্ত করলেন না। ভীষণ রেগে তারা সবজি ক্ষেতে কতটা ক্ষতি করেছে তার পরিমাপ করতে মহিলা নিজেই সেখানে গেলেন। কোন কোন জায়গায় যেখানে বাঁধাকপি সবে ফলতে সুরু করেছে সেখানে চিরতরে তার অস্তিত্ব খতম; এবং তাঁর হৃদয়টা এই দৃশ্য দেখে একেবারে ভেঙ্গে গেল মনে হলো যেন এরা তাঁর নিজের সন্তান সন্ততি, তাদেরকেই যেন পদদলিত করা হয়েছে। সেই সব কচি বাঁধাকপি চতুর্দিকের মাটি আলাদা করে তার ভেতর থেকে মরা চারা বার করে ওদের গালিগালাজ করতে করতে বলেনঃ

"জাহান্নামে যাও! যেভাবে তোমরা ওদের ধ্বংস করে গেলে তাতে তোমাদেরও ভালো হবেনা তা কিন্তু বলে দিলাম।"

বিনানুমতিতে প্রবেশকারীরা চলে গেলে সমগ্র উপত্যকাটায় নেমে আসে আবার সেই নিস্তব্ধতা। বাতাসে গাছের পাতাগুলি মৃদু মৃদু কাঁপছে, গাছের গুঁড়িতে কাঠঠোক্‌রা পাখী ঠোক্কর দিচ্ছে। দরজার চৌকাঠে বসে মা বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন।

বড ছেলেটি অস্বস্তি সহকারে প্রশ্ন করে, "ওরা কে মা?"

বিরক্তি সহকারে মা জবাবে বলেন, "তা জেনে তোর কি হবে? ওরা ডাকাত একদল।"

ক্ষতির পরিমাণ দেখে মায়ের ত মাথায় হাত। অবশ্য বীজের দাম এমন কিছু বেশী নয়; কিন্তু এভাবে পদদলিত হবার পর কটা চারা গজাবে বীজ থেকে তা কে জানে! এই ব্যাপারটা'কে খোলাখুলিভাবে চুরি বলাটা কি খুব অন্যায় হবে? চুপচাপ ঈশ্বরকে প্রার্থনা জানানো ছাড়া তাঁর আর কীইবা করার আছে?

"ভগবান! আমাদের দয়া করো! এ ধরণের লোকদের আর এখানে পাঠিও না।"

কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেল গাছ পাথরের মত ভগবানও দায়িত্ব জ্ঞান-হীন। দু একদিন পরে ঐ লোকগুলোর আবার দেখা পাওয়া গেল। এইবার কিন্তু সেই খাটো জামা পরা দুজন এলো। তাদের দেখে যে কুকুর দুটো ঘেউ ঘেউ করছিল তাদের প্রতি চীৎকার করতে করতে লোক দুটো একেবারে সোজা ঘরের দরজা অবধি চলে এলো। তাদের দেখে শ্রীমতি শীর মুখ গেল একেবারে শুকিয়ে।

অস্বস্তি সহকারে তিনি জিজ্ঞেস করেন, "এখন আবার কি চান?"

ওদের মধ্যে একজন গর্জে উঠে বলে, "এলাম তোমায় কিছু বলতে। তুমি যে জমিদার উও-এর কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে চার ম্যুর পরিমাণ মত জমি চাষ করো তার জন্যে তাঁর কাছে তোমায় তিন লক্ষ ইউয়ান টাকা জামিন হিসেবে গচ্ছিত রাখতে হবে। জমি ব্যবহার করা যেদিন বন্ধ করে দেবে তখন অবশ্য ঐ টাকা ফেরৎ পেয়ে যাবে।" পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে সে বলে চলে, "এবার তোমায় একটু বুদ্ধিমতী হতে হবে। এ জমিটা জমিদার উও-এর; তোমার নয়, তুমি কেবল চাষ করো। ওঁর কাছে দলিল পত্র সব রয়েছে। মামলা করে কোনদিনই ওঁকে হারাতে পারবে না—এমনকি জেলা শাসক তোমার পক্ষে থাকলেও না।"

এত সব কথা কাগজে কলমে লেখা রয়েছে জেনে শ্রীমতি শী ভাবেন যে তবে ত তর্ক করার কোন মানেই হয় না। এখন তাঁর মুখটা যেন

হতাশার একটা ছবি বিশেষ। তা সত্ত্বেও নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি ভীষণ ভাবে গর্জে ওঠেন, "এমনকি আমার পুত্র সন্তানদের বেচলেও অত টাকা ত হবে না।"

লোকটির সেই গা-জ্বালা করা জবাব, "চেঁচাচ্ছিস্ কেন? ওটা ত কেবল গচ্ছিত থাকছে। তোকে আবার জমির ভাড়া বাবদ পাঁচ দৌ চাল জমিদারকে দিতে হবে প্রতি বছর।"

শ্রীমতি শী এবার কেঁদে ফেলেন, "ওটাত দিতেই পারবো না। জমিটা একবার চেয়ে দেখ না!—এতে কতটা চাল হতে পারে? এতটা চাল দাবী করে তোমরা আমাদের মেরে ফেলতে চাও!"

লোকটা গজরাতে গজরাতে বলে, "আমায় বকাবকি করছ কেন? তোমার বেশ গলার জোর আছে তা শোনানোর জন্যে কি? তুমি যদি টাকা দিতে না চাও কেটে পড়ো না কেন? কেউ ত তোমায় বাঁধা দিচ্ছে না।"

অপর লোকটা বলে, "ঠিক কথা ত—স্রেফ কেটে পড়ো।" সে এতক্ষণ দড়ি দিয়ে কুকুর দুটোকে আটকে রেখেছিল। "কি জায়গারে বাবা! কি বদ্‌মেজাজী মহিলা! আর এই কুকুর দুটো ত বেজায় অসভ্য!"

মহিলাটির হাতে চুক্তি পত্র গুঁজে দিয়ে লোক দুটো সোজা চলে গেল পেছন ফিরে একবার দেখলো না পর্যন্ত। রাগে বাক্‌রুদ্ধ শ্রীমতি শী চুক্তি পত্রটা টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর কুঁড়ে ঘরের পিছনের পাহাড়ের ঢাল-এর দিকে লক্ষ করে তিনি আপন মনে বিড়বিড় করে বলেন, "অত সহজে এই উপত্যকা ছাড়ছি না বাবা! পাক্কা দশ বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে এ জায়গাটাকে বাগে আনতে। ঐ দশ বছরে যত ঘাম আমাদের ঝড়েছে তা কয়েক শ বালতি ত হবেই! এমনকি যদি তারা আমাকে জোর করে উৎখাত করতে চায়-তাহলেও নড়ছি না।"

নিঃসঙ্গতা ও গভীর একাকিত্ববোধ এখন আর শ্রীমতি শী কুইংগকে আগের মত তাড়া করে ফেরে না। তার এখন কেবল একমাত্র ভয় জমিদার উও তাঁকে আরও অসুবিধের মধ্যে ফেলতে পারে। উনি এটাই স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে জমিদার যতই নোংরা কৌশল প্রয়োগ করুন না কেন উনি কিছুতেই এই উপত্যকা ছাড়ছেন না। এই উপত্যকা ছেড়ে চলে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে তাঁর গত দশ বছর ধরে থাকার সুবাদে এই পাহাড়, বন ও ছোট্ট নদীকে এত ভালোভাবে চিনেছেন যে তিনি সকল সময় তাঁদের নিজের লোক বলেই মনে করতেন। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খালি পায়ে ঐ পাহাড়ের ঢালে

ঘুরে ঘুরে, সবুজ সব্জি, কমলালেবু এবং হল্দে তরমুজ দেখে তাঁর মন খুসীতে ভরে যায়। পাহাড়ে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের সময় তিনি কেবল শুকিয়ে যাওয়া গাছের ডাল কেটে নেন। গাছের কচি ডাল কাটার কথা তাঁর মনেই আসে না, কারণ এইসব গাছগুলো তাঁর প্রতিবেশীর মত এবং তাদের বেড়ে ওঠা দেখতে তাঁর খুব ভালো লাগে।

তাঁর প্রিয় জিনিসের মধ্যে আরেকটি হল এই ছোট্ট নদীটা, তিনি বেশ ভালো ভাবেই জানতেন যে এই নদীর জল না পেলে কোন কিছু ফসল ফলাতে তাঁকে বেগ পেতে হত। তাই প্রত্যেক নববর্ষের দিনটাতে তিনি ঐ ছোট্ট নদীর ধারে গিয়ে নিজের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ধূপ জ্বেলে ও কাগজের নোট পুড়িয়ে এর পূজার্চনা করতেন। বাজারে যে সব জিনিস নিয়ে যেতেন তিনি তার মধ্যে সীম ও টোমাটর অস্বাভাবিক ওজন দেখে কেউ বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনি খুসী হয়ে বলতেন, "ওখানকার জমিটা ভালো আবার কাছাকাছি নদীও আছে একটা।"

কিন্তু তার পরেই, এই উপত্যকার ঝকঝকে ছবি অন্য লোকদের এখানে আসতে আকর্ষিত করতে পারে এই আশংকায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিমর্ষ কণ্ঠে কথার শেষে তিনি যোগ দিতেন, "এই বলে, একটাই হচ্ছে কেবল অসুবিধে তাহলো কাঁটাঝোপ। সেইটা মাত্র তিন দিন ফেলে রাখো না দেখবে পুরো চত্বরটাই কাঁটা ঝোপে ভরে গেছে। অন্যান্য জায়গার তুলনায় এখানে দ্বিগুণ কাজ করতে হয় আমাদের মাজা ভাঙ্গা কাজ আর কি?"

শী কুইংগ এর আশংকার কারন বোঝা সহজ যখন তাঁরা ওঁকে উৎখাত করতে আসে। মনে মনে অনুভব করতেন তাঁকে এই উপত্যকায় যে কোন মূল্যেই হোক থাকতেই হবে। নিশ্চয়ই এই জমিটার উপর কিছুদিন ধরেই জমিদার উও-এর লোলুপ দৃষ্টি ছিল, কিন্তু কেবল মাত্র এখনই তাঁর স্বামী যখন এখানে নেই তখন তিনি তাকে উৎপাত করতে সাহস পেয়েছেন।

"ঠিক আছে। তোমরা ভেবেছ আমি মেয়েছেলে বলে তোমরা সব পার পেয়ে যাবে? ভালো কথা; আমিও দেখিয়ে দেবো একটা মেয়েছেলেতে কি করতে পারে?" তিনি মনে প্রতিজ্ঞা করেন—মাথাটা খুব জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে।

দরজার ঠিক পাশে রাখেন কাস্তে, নিরানি ও কুঠার। যদি কেউ তাঁদের উৎখাত করতে আসে তাহলে এর মধ্যে যে কোন একটা যন্ত্র হাতে নিয়ে তাঁদের দেখিয়ে তবে ছাড়বেন যে তাঁর মত একজন মহিলাকে তর্জন গর্জন করে পার পাওয়া সোজা না। ক্ষেতে কাজ করার সময়,স ময়ময় সম

সোজা দাঁড়িয়ে উঠে দেখে নিতেন যে উপত্যকার বাঁদিকের সঙ্কীর্ণ ঐ রাস্তা ধরে কেউ আসছে কিনা। কোন কোন সময় আবার এমন কি তাঁর সন্তানদের খেলা করতে পাঠিয়ে দিতেন পাহাড়ে যেখান থেকে তারা উপত্যকার প্রবেশ পথে নজর রাখতে পারবে। মোদ্দা কথা হল এই যে তিনি অসতর্ক অবস্থায় ওঁদের কাছে ধরা পড়তে রাজি নন।

কয়েকদিন পরে সেখানে এক বৃদ্ধের আবির্ভাব ঘটলো, হাতে কুঠার নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন তাঁর কুঁড়ে ঘরের দরজায়; আগুয়ান চেহারার উপর তাঁর চোখ নিবন্ধ। রাগে বিভৎস রূপ নিয়েছে তাঁর মুখ। ভীষণ জোরে ঘেউ ঘেউ করছে কুকুর দুটো। পরিবেশটা এতই উত্তেজনাপূর্ণ যে সবচেয়ে ছোট ছেলেটা ভয়ে কান্না সুরু করে দেয়।

বৃদ্ধ লোকটি দরজার সামনে এসে থামেন। তাঁর মুখ চোখ লাল, তিনি ভীষণ বিরক্ত হয়েছেন শ্রীমতি শী কুইংগ-এর ব্যবহারে। তিনি কুকুর দুটোকে তাড়ান নি, তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বসতে পর্য্যন্ত বলেন নি।

শ্লেষাত্মক সুরে বৃদ্ধ মেয়েটাকে প্রশ্ন করেন, "ওভাবে আমার দিকে চেয়ে আছ কেন? ভেবেছ যে আমি একজন ডাকাত? পাইপ ছাড়া যাঁর হাতে কোন জিনিস নেই, সেই বৃদ্ধ লোককে দেখে কিছুতেই মনে হয় না যে তিনি বলপ্রয়োগ করতে পারেন।"

শ্রীমতি শী কিছুটা শিথিল হয়ে বিব্রত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, "কে আপনি?"

'আমি হচ্ছি জিয়া ঝিংগ।'(২) বিরক্ত সহকারে তিনি উত্তর দেন গলার স্বর শুনে বোঝা যায় যে মহিলা যে তাঁকে চেনেন না তাতে তিনি ক্ষুব্ধ। "আমি এসেছি জমিদার উও-এর এই জমির ব্যাপারে। আমি জানি জমির ভাড়াটা একটু চড়া, কিন্তু একবার ভেবে দেখ তুমি গত দশ বছর ধরে এই জমি ভোগ করছ। একেবারে মাগনায়, অন্য যে কোন জমিদার হলে সে অনেক আগেই ভাড়া আদায় করতে চলে আসতো। তিনি প্রকৃতই ভালো ব্যবহার করছেন তোমার সঙ্গে, তোমার হয়ে দু এক কথা বলতেই তিনি গচ্ছিত টাকার পরিমাণ কমিয়ে ২'৯০০০০ ইউয়ান করে দিয়েছেন এবং বাৎসরিক ভাড়া করে দিয়েছেন নোতুন ওজন পদ্ধতি অনুযায়ী দশ দৌ চাল। কুকুরটা গোল্লায় যাক্।" তিনি চিৎকার করে তাঁর কাছে ছুটে আসা একটা কুকুরকে পাইপটা দিয়ে তাড়া করেন।

এইবার কিন্তু শী কুইংগ কুকুরটাকে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু বৃদ্ধের কথার শেষ অংশটা তাই শুনতে পেলেন না।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, "ভাড়া কমানোর হারটা ত বড়ই অদ্ভুত। দশ দৌ চাল, পাঁচ থেকে দশ।

কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মহিলাটিকে বলেন. "তুমি ত সঠিকভাবে কোন কথাই শুনতে চাও না দেখছি? আমি বলেছি নতুন ওজন পদ্ধতি অনুসারে দশ দৌ! সাধে লোকে তোমায় অবিবেচক বলে? লোকের কথা ভালোভাবে না শুনে তার উপর হামলে পড়ো।"

প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, "দশ দৌ ত দিতেই পারবো না। এইসব ছেলেমেয়েদের একবার দেখুন। ওরা ওদের বাবাকে জোর করে নিয়ে গেছে; আর আমি এখন একা—খেতে পাঁচ পাঁচটা মুখ, ভাড়া দেবার টাকা কোথায় পাব?"

ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়ানো রোগা রোগা বাচ্চাদের দেখে বৃদ্ধ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, "তা বললে ত চলবে না। কিন্তু যতদিন ওর জমিতে কাজ করবে ততদিন পর্য্যন্ত জমিদারের কাছে তোমার টাকা গচ্ছিত রাখতেই হবে এবং ভাড়াও দিতে হবে। মাগ্‌নায় জমি পাওয়া যায় কবে কোথয়ে একথা শুনেছ?"

"দয়া করে, ওঁর সঙ্গে আমার হয়ে কথা বলবেন না? তাঁকে একটু সদয় হতে বলুন না। আমার স্বামী ফিরে এলেই যেমন করেই হোক্ আমি তাঁকে দেনা শোধ দিয়ে দেব।"

"সে যদি কোনদিন আর না ফেরে?"

কাতরকণ্ঠে ঐ মহিলা বলেন, "দয়া করুন। ও কথা বলছেন কি করে? যদি আর ফিরে না আসে তাহলে আমাদের কি হবে?"

মুখটা একপাশে সড়িয়ে নিয়ে নিরুত্তাপ গলায় বৃদ্ধ বলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সেনার কপালে কি আছে তা কেউ বলতে পারে না।" তারপর কথাটা রূঢ় হয়ে যাচ্ছে মনে করে গলার সুরটা একটু অন্যরকম করে বলেন, "হতে পারে স্বর্গ তাকে রক্ষা করে কোন একদিন তোমার কাছে ফেরৎ পাঠাতেও পারে।"

কৃতজ্ঞতার সাথে মেয়েটি বলেন, "সেই আশা ত আমিও করে আছি।"

এতক্ষণে শী কুইংগএর ব্যাপারে বৃদ্ধ অধৈর্য্য হয়ে পড়েন। তাঁর দিকে পাইপটা নেড়ে নেড়ে তিনি বলেন, "যাক্ গে ভাড়ার ব্যাপারে আবার ফিরে আসা যাক্—আমি তোমায় উপদেশ দিচ্ছি যে জমিদার উও-এর সর্ত মেনে নাও। এখনি টাকা দেবার জন্য উনি চাপ দিচ্ছেন না। বছরের শেষে তাকে তুমি দিতে পারো। গচ্ছিত রাখার জন্য ২,৯০০০০ ইউয়ান

কিন্তু এখনই দিয়ে দিতে হবে। বৃদ্ধ চতুর্দিক একবার দেখে নিয়ে বলেন, "তোমার শূয়োর, মুরগী সব বেচে দিচ্ছ না কেন ?"

মরীয়া হয়ে শ্রীমতি শী জবাব দেন, "শূয়োরগুলো সব ছোট ছোট তাছাড়া সব বেচলেও খুব বেশী একটা টাকা পাওয়া যাবে না।"

বিস্ময় প্রকাশ করে জিয়া ঝিংগ জিজ্ঞেস করেন, "তোমার কোন জমানো টাকা নেই ? এখান থেকে চলে যাবার সময় স্কুল তোমায় কিছু টাকা দিয়ে যায় নি ?"

রাগে তিনি বলেন, "হ্যাঁ তারা দিয়েছিল। কিন্তু তখন আমার স্বামীর চাকরী ছিল না এবং জিনিষ পত্রের দাম দিনকে-দিন বাড়ছিল। সেই সামান্য অর্থ-দুমাসও পেরুলো না-কোথায় মিলিয়ে গেল। আমার যদি কিছু টাকা থাকতো তাহলে আমার ছেলেরা অত রোগা হত না।"

পুনরায় বৃদ্ধ লোকটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাথা নাড়েন।

শ্রীমতী শী হঠাৎ উপরে তাকান, আশায় তাঁর চোখ চকচক্ করতে থাকে। তার জামার আস্তিনের খুঁট ধরে মিনতি ভরা কণ্ঠে তিনি বলেন, "দয়া করে আমার হয়ে ওঁকে দুচারটে ভালো ভালো কথা বলুন না কেন ? জমিদার উওকে বলুন না আমাদের জন্য দয়া করে তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখা টাকাটা যেন বাতিল করে দেন। ভাড়ার ব্যাপারে বলতে পারি যে জমি থেকে যা ফসল হবে যেমন আলু, কুমড়া বা ঋতুতে ঋতুতে যেমন যা ফলবে তা তাঁকে দেব।"

বৃদ্ধ ব্যক্তিটি হাসিতে ফেটে পড়েন। বলেন, "শোন কথা ! তুমি কি মনে করো যাঁর বাড়ীতে এত মাছ মাংস সঞ্চিত সে কিনা সামান্য আলু, কুমড়ার জন্য লালায়িত। ঐ সব জিনিষ ওঁর শূয়োরেও খায় না। ওরা ভূষি মেশানো ভাত খায়, ও সব আশা করে লাভ নেই। ঐ প্রস্তাব দিতে আমার সাহসই হবে না।"

হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে মহিলা বলেন, "আমার কাছে ওঁর দাবী মেটানো অসম্ভব।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক এই কথা মেনে নিয়ে ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধে বলেন, "ও একটা চামার ! ওঁর ছেলে সেনা-বাহিনীর একজন অফিসার এবং প্রতি বছর ওকে প্রচুর টাকা পাঠায় সে। তাই ও যদি গচ্ছিত রাখার টাকার সবটাই বাতিল করে দেয় তাহলেও তার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না।"

শ্রীমতি শী এইবার চেঁচিয়ে ওঠেন, "ঐভাবে উনি যদি ব্যাপারটা দেখতেন !"

অপ্রতিভভাবে জিয়া ঝিংগ বলতে সুরু করে দেন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, "জমিদারকে গিয়ে কি যে বলি? ফ্যাসাদেই পড়লাম রে বাবা?"

তাঁর পেছনে মহিলা চেঁচিয়ে বলেন, "স্রেফ ওঁকে বলবেন যে বাঁশ নিংড়ে তেল বার করা যায় না।"

পেছনে না তাকিয়ে বৃদ্ধ রাগতস্বরে গর্জন করে বলেন, "তা এই কথাগুলো তাঁকে নিজে গিয়ে বলছ না কেন? এ সব ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহই নেই।"

এখন পরিষ্কার হল যে জমিদার উও জিয়া ঝিংগকে বার্তাবহ হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে ভবিষ্যতে কোন বার্তাবহ এলে তাকেও তিনি জানিয়ে দেবেন যে তিনি জমিদারকে গচ্ছিত রাখার টাকাটা দিতে পারবেন না; তবে তাঁর ক্ষেতে যে ফসল হবে তা থেকে জমি ভাড়া বাবদ সে কিছু পাবে। অবশ্য গভীর ভাবে বিচার বিবেচনার পর তিনি ঠিক করেন যে ভবিষ্যতে বার্তাবহের সঙ্গে তিনি আরও নম্র ব্যবহার করবেন এবং যতটা সম্ভব নম্রতার সাথে তাঁর আর্জি পেশ করবেন; যাতে করে তাঁরা ফিরে গিয়ে ওঁর হয়ে দুচার কথা বলতে পারেন। তিনি তাঁদের ঘরের ভেতরে নিয়ে আসবেন, বসতে দেবেন, চা করে দেবেন, তারপর চালের কলসীর ঢাকা তুলে তা তাদের দেখিয়ে জানাবেন যে, তাঁদের পরিবারের প্রযোজনের তুলনায় কত কম চাল আছে। তার পরে তাদের ক্ষেত দেখাতে নিয়ে যাবেন এবং তাদের বুঝিয়ে দেবেন যে আগামী মাসের আগে আদা তোলা যাচ্ছে না, এবং বাঁধাকপি আগামী শীতকালের আগে খাবার মত হবে না। বর্তমানে তাঁর কেবল আলু রয়েছে এবং তিনি অবশ্য খুসী মনে এক বুশেল আলু দিতে পারেন যদি জমিদার তা চান। তিনি এটা প্রত্যাখ্যান করলে সেটা তাঁর দোষ নয়। তাঁকে আরও সুবিবেচক হতে চেষ্টা করে যেতে হবে যাতে করে তিনি ভীত না হয়ে পড়েন—এমনকি জেলা শাসক নিজ হাতে ঐ মামলা যদি গ্রহণ করেন তাহলেও না।

পরের কয়েক দিন কারুর আর দেখা পাওয়া গেল না এবং শ্রীমতি শী কিছু শান্ত হলেন। প্রতিদিন যে জামতে তিনি জল দেন সেই পাহাড়ের ঢালে গিয়ে দেখল যে আদার ও পান্না রংএর পেঁয়াজের কচি কচি চারা বাজারে বেচার জন্য এখনই তৈরী হয়ে গেছে। তাঁর বাঁধাকপিগুলো, যাদের সযত্নে আগাছা মুক্ত রাখা হয়েছিল তা দৈনিক সবুজ হয়ে চলছে। তিনি সেগুলি জমিদার উওকে পাঠাবেন; তার সঙ্গে পাঠাবেন

এক বাক্স সোনালি রংএর কমলালেবু ও কিছু ছোট ছোট মিষ্টি লেবু তিনি যদি যথেষ্ট সদয়তা সহকারে তাঁকে ভাড়া ও গচ্ছিত রাখা টাকা দেবার জন্যে তাগাদা দেওয়া বন্ধ করেন তাহলে কি ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় তা তাঁর জানা আছে।

শ্রীমতি শী জানতেন যে দুটো আলু ও কুমড়োর জন্যে বড়লোকেরা মোটেই লালায়িত নয়। কিন্তু তারা ভীষণভাবে পছন্দ করেন টাটকা সব্জি, মিষ্টিলেবু, কমলালেবু। বাজার থেকে এসব সংগ্রহ করতে তাঁরা কি প্রায়ই লোক পাঠান না? এছাড়া তিনি জমিদারকে এক জোড়া মোটা মুরগী, নববর্ষের উপহার হিসেবে দিতে চান। মুরগীদের খাবার দেবার সময় তাদের গুণাগুন তুলনা করে সযত্নে তাদের পরীক্ষা করেন রোজ। সাদা মুরগী মোটেই ভালো নয় (৩), কেন না তারা বয়ে আনে দুর্ভাগ্য আবার কালো মুরগীকে অপরিষ্কার দেখায়, অনেক বিচার বিবেচনার পর একজোড়া কালো কালো ছোপ দেওয়া হলদে মুরগী বেছে নেন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে ঐ দুটো জমিদারকে পাঠাবেনই এমন কি তারা যদি শ্রেষ্ঠ ডিম প্রদানকারী হয় তাহলেও।

একদিন রাতে কুকুর দুটোর ভীষণ চীৎকারে জেগে ওঠে শ্রীমতি শী কাছাকাছি কোথাও ফটফট আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং দেখলেন যে ঘরটা তাঁর আলোয় আলোয় ভরে গেছেও ঘরে ধোঁয়া ঢুকছে। ব্যথিত হৃদয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে বোধ হয় রান্নাঘরে আগুণ লেগেছে. এই ভেবে নিয়ে খালি পায়েই সেখানে ছুটে যান। প্রথম তাঁর চিন্তা হল ছোট্ট নদী থেকে তাকে জল আনতে হবে; কিন্তু আগুন এত দ্রুত ছড়চ্ছে যে তাঁর উচিত প্রথমেই ছেলেমেয়েকে বাঁচানো তারা তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, একে একে তিনি তাদের বিছানা ও কাপড় চোপড় সহ বাইরে টেনে টেনে বার করলেন। তার পরই মুরগীদের খাঁচা থেকে ছেড়ে দিতেই পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে তারা পালালেন। তাঁর জিনিসপত্র রক্ষা করতে বার বার ঘরবার করতে করতে তার চুলে আগুন ধরে গেল। কুঁড়ে ঘরের খড়ের চালে আগুনের লেলিহান শিখা গর্জন করতে করতে বিশাল এক ধ্বংসোন্মাদনায় মেতে উঠেছে। খেতে যতক্ষণ সময় লাগে তার থেকেও কম সময়ের মধ্যে পুরো কুঁড়ে ঘরটাই মাটির সঙ্গে মিশে গেল, এমন কি তাঁর পাশে কমলালেবুর গাছটা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। ঐ এলাকায় কিছুই আর পড়ে রইলো না একমাত্র ছাইচাপা আগুন ছাড়া।

শ্রীমতি শী সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েন যখন তিনি চিন্তা করেন যে কত

কষ্টকরে তিনিও তাঁর স্বামী উভয়ে মিলে এই কুঁড়ে ঘরটা বানিয়েছিলেন, বছর বছর মেরামত করেছেন, ধীরে ধীরে আসবাবপত্র বানিয়েছেন, এবং শূয়োর পালন করেছিলেন এখন অবশ্য তারা মৃত। এইবার তিনি সাধ মিটিয়ে কাঁদলেন দেখে মনে হয়, তাঁর এত দিনকার জমানো সব বেদনা যেন তিনি উজাড় করে দিচ্ছেন।

একটা কমলালেবুর গাছের তলায় তাঁর ছেলে মেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে নিজে তাদের পাশে বসে থাকেন। বিস্ময়াবিষ্ট এক দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে থাকেন ছাই চাপা আগুনের দিকে। তিনি বিস্মীত, "আগুনটা লাগলো কি করে? রাতের খাবারের পর। ধোয়াধুয়ির শেষে ত রান্নাঘরের আগুন নেভানোই ছিল এবং রান্নাঘরের মেঝে ঝাঁট দেবার সময়, তার মনে পড়ে, জ্বালানী কাঠ সব উনোন থেকে অনেক দূরে নিরাপদ দূরত্বে রাখা হয়েছিল, তার শুতে যাবার পূর্বেই। আগুনটা তবে সুরু হল কি করে? যতই তিনি ভাবেন ততই তাঁর সন্দেহ বাড়তে থাকে। পরিশেষে তিনি নিশ্চিত যে কেউ বাড়ীতে আগুন দিয়েছে। উপত্যকা থেকে তাকে উৎখাত করার জমিদার উও-এর ঘৃণ্য পরিকল্পনার একটা অংশ নয় ত এটা?"

ছেলেমেয়েদের পাশে বসে থাকতে থাকতে তিনি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তারপরই সকাল হলো। এখন মৃত শূয়োরদের দেখে, ভাঙ্গা আচারের পাত্র দেখে, সমস্ত চালকে ছাইতে পারণত হতে দেখে, আসবাব-পত্র সবকে কাঠকয়লার মত হয়ে যেতে দেখে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। কুঠার, নিড়ানি, কাস্তে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, জল আনার কাঠের বালতিটা পুড়ে ছাই-এখন তিনি কি দিয়ে কাজ করবেন? বাড়ীটা চলে যাওয়ায় খুব মারাত্মক ক্ষতি কিছু একটা নয়—তারা গাছতলায় শুতে পারবেন। কিন্তু তাদের কি হাল হবে যদি তাঁরা মাটি খুঁড়তে না পারেন, সবজি ক্ষেতে নিড়েন আর জল দিতে না পায়া গেল? শূয়োরগুলো সব যদি পুড়ে না যেত, তাহলে সেগুলো বেচেও নোতুন যন্ত্রপাতি কিনতে পারতেন। কিন্তু সব মারা গেছে আর মুরগীগুলো সব এত ছোট যে বেচা যায়-না। এখন ডিম দেওয়া মুরগী বেচেও টাকা খুব একটা বেশী পাওয়া যাবে না। সবজীর ক্ষেত্রে বলা যায় যে দুই তিন মাসের আগে তা বাজারে নিয়ে যাওয়া যাবে না বেচার জন্যে যে আলুগুলো সব আরও ছমাস পরিবারটাকে খাওয়াতে পারতো তা এখন পরিণত হয়েছে অংগারে। কিন্তু আশু সমস্যা হচ্ছে খাদ্য। তাকে যে সমস্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে সে কথা

চিন্তা করলে তাঁর আপাদমস্তক কেঁপে ওঠে। এখন তার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে যে দিন ওঁর স্বামীকে ওরা নিয়ে যায় সে দিনের তুলনায়। কেননা তখনও পর্য্যন্ত জমি চাষ করার জন্য, ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্যে যন্ত্রপাতি তাঁর ছিল। কিন্তু এখন অনশন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছে!

গতরাতে উদ্ধারকরা বিছানাপত্র দেখার দায়িত্ব তাঁর বড় ছেলেকে দিয়ে তিনি বাজারে চলে গেলেন, তাঁর ছোট শিশুকে পিঠে নিয়ে। সেখানে চোখের জলে ভাসতে ভাস্তে তিনি তাঁদের গতরাতে তাঁর যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেছে তা সব বলে গেলেন। কয়েকজন তাঁর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তাঁকে টাকা, পোষাক ও চাল দিলেন। এক বৃদ্ধা, যিনি শ্রীমতি শীকে জানতেন, তাঁর বাড়ী পর্য্যন্ত জিনিষপত্র বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বাড়ী ফেরার পথে তিনি তাঁর বান্ধবীকে বললেন জমিদার কেমনভাবে তাঁকে ভয় দেখানোর জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন এবং বাড়ীতে আগুন লাগানোর জন্যে তিনিই দায়ী বলে সন্দেহ করেন। ভয়ে চারদিক দেখে নিয়ে তাঁর পোষাকের আস্তিনের খুঁট ধরে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেন ঃ

"আমার কথা শোন, এখান থেকে পালাও। তুমি ঐ নির্জন এলাকায় একমাত্র পরিবার! ভাবো ত যদি উও ..."

শ্রীমতি শীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কয়েক মিনিট পর কোনরকমে জবাব দেন ঃ "আমরা যদি চলে যাই কিভাবে বাঁচবো তবে?"

"সেত বটেই, কিন্তু ভাবোত—তুমি কি মারা পরতে চাও? ওঁর মত এক ধনী ও শক্তিশালী লোক-সে কোন মতেই তোমায় ছেড়ে দেবে না।"

ক্রোধে আর বেদনায় শ্রীমতি শীর বুক ভরে ওঠে। মরীয়া হয়ে তিনি বলেন, "ওর সাথে একবার লড়ে দেখব—তাতে যদি মরতে হয় ত মরবো।"

"সেটা করো না ভাই কখনও!" তাঁর সঙ্গী তাঁকে হাত বাড়িয়ে বাঁধা দিয়ে বলেন, "পাহাড়ের সাথে ডিম কি কখনও লড়তে পারে? ছেলে-মেয়েদের কি হবে তুমি যদি মারা যাও?"

এক মুহূর্ত বৃদ্ধা মহিলা গভীরভাবে চিন্তা করে নেন। তারপর তিনি শ্রীমতি শী এর জামা ধরে প্রস্তাব দিলেন, "তোমার বাপের বাড়ী যাচ্ছনা কেন? তুমি যেখানে জন্মেছ, বড় হয়েছ সেখানে জীবন ধারনের জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই।"

"সেখানে কোন জমি নেই আমাদের। আমরা ওখানে খাওয়া পড়া

চালাতে পারছিলাম না বলেই ত সে জায়গা ছেড়ে এলাম। তা না হলে কবে এখান থেকে চলে যেতাম।"

"কিন্তু এখনও ত তোমার আত্মীয় স্বজনের কেউ না কেউ ওখানে রয়েছেন? তাই না?"

"দশ বছরের বেশী সময় আগে ওখান থেকে চলে এসেছি আমরা। কে জানে ওঁরা কেউ এখনও বেঁচে আছে কিনা? যদি তাঁরা এখনও বেঁচে থাকেও তাহলে তারা আমাদের মত ভিক্ষুকদের পাত্তা দেবে কেন?"

"নিদেন পক্ষে তারা তোমায় কষ্ট দেবেন না।"

"কিন্তু সেখানে কিভাবে বাঁচবো আমরা? আমি যদি আমার পাঁচটা সন্তান ছেড়ে কাজে চলেও যাই তাতেও ওদের খাওয়ানোর মত যথেষ্ট উপার্জন করতে পারবো না।"

বৃদ্ধা মহিলা চুপ করে গেলেন; তারপর বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে চলে গেলেন।

আরেকবার তিনি মনস্থির করে ফেলেন যে যাই ঘটুক না কেন তিনি এই উপত্যকা ত্যাগ করছেন না পাহাড়ের ঢাল বরাবর এক চিল্‌তে জমি তাঁকে শক্তি জোগায় মনে দেয় সান্ত্বনা। তিনি আনমনেই বলেন, "অন্তত কিছুদিন এই সব্‌জি আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে।" কিন্তু তাঁর মনের গভীর একটা আশংকা সব সময় তাঁকে তাড়া করে ফেরে, "যদি জমিদার প্রকৃতই আমাদেন আরও ক্ষতি করার চেষ্টা করে?" তিনি নিজে নিজেই বিড়বিড় করেন, "ঠিক আছে, আমি ওঁর সঙ্গে লড়াই করে তবে ছাড়বো। এই জমি এত ফসল দিয়েছে এত বছর ধরে—তাঁর জন্যে আমার প্রাণ পর্য্যন্ত খুসী মনে দিতে রাজী আছি।"

প্রত্যেকদিন একটা আধভাঙ্গা পাত্র হাতে নিয়ে মহিলাটি ছোট্ট নদী থেকে জল এনে সব্‌জি ক্ষেতে জল দেন, রাতে উনি তাঁর ছেলে মেয়ের সাথে কমলালেবু গাছের তলায় ঘুমান। রাতের বাতাসে শুয়ে তাঁর ছেলেমেয়ের ঠাণ্ডা লেগে স্থায়ীভাবে কোন রোগ দেখা দেয়, এবং তাঁর সবচেয়ে ছোট বাচ্চার জ্বর এত ভীষণ বেড়ে যায় যে সে মায়ের দুধ পর্য্যন্ত খেতে চায় না। অরক্ষিত অবস্থায় মুরগী সব খোলা জায়গায় পড়ে থাকায় তাদের এক এক করে বন বিড়াল আর বেঁজী খেয়ে নেয়, কেবল মাত্র রক্ষা পায় কুকুর দুটো।

অসুখী মা গভীর এক চিন্তায় পড়ে যান। তিনি বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানান যাতে করে রাতারাতি তাঁর সব্‌জী সব পেঁকে ওঠে, তাহলে

সেগুলোকে পরদিন বেচে দিয়ে, তিনি কুঠার, করাত আর একঠা কাস্তে কিন্তে পারবেন। তারপর করাত দিযে বাঁশ কেটে কেটে নিজেদের জন্য যেমন তেমন করে খড়ের ছাউনি দেওযা ঘর বানিযে নেবেন একটা।

এক রাতে কুকুরের ভীষণ চীৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায। লাফ মেরে নেমে তিনি তাঁর পাশে রাখা পাথরটাকে শক্ত করে ধরে দাড়িযে প্রস্তুত থাকেন যাতে করে নিজে আক্রান্ত হলে লড়াই করতে পারেন। কিন্তু কেউ এলো না ত পাহাডের ঢালের দিকে চেযে কুকুর দুটো ভীষণ চেঁচাচ্ছে ; এবং তার মনে হল কেউ হযত তাঁর সব্জী চুরি করতে এসেছে। কিন্তু সব্জী সব এত ছোট যে তা চুরী করে মজুরী পোষাবে না, হযত কোন বন্য জানোযার পাহাড থেকে নেমে এসেছে। তাই পাহাডের ঢালে যওযার পরিবর্তে, শক্ত করে পাথরটা হাতের মুঠোয ধরে তার পাঁচটি ঘুমন্ত ছেলেমেযের মাথার কাছে প্রস্তুত হযে দাঁড়িযে থাকেন।

তারপর কুকুর দুটো চীৎকার বন্ধ করে দেয, উপত্যকায আবার নেমে আসে এক আদিম নীরবতা। কালো আকাশে মিটমিট করে জ্বলছে অসংখ্য তারা, শ্রীমতি শী শুযে পড়েন, তবে ঘুম এল না তাঁর। তার তখনও পর্য্যন্ত আশঙ্কা যে অন্ধকার থেকে বন্য জানোযারেরা ঝাঁপিযে পড়ে তাঁর ছেলেমেযেদের নিয়ে যেতে পারে। তিনি ভাবেন, "শুধু আমার স্বামী যদি এখানে থাকতেন ; তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে যদি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যেতেও হয তাতে কিছু মনে করবো না যদি শুধু জানতাম তিনি এখন কোথায আছেন, এই এলাকা এখন আমার আতঙ্ক।"

পরদিন সকালে ঢালের দিকে শ্রীমতি শী ছুটে যান এটা দেখতে যে সব্জী বাগানে যে পায়ের ছাপ তারা রেখে গেছে সে ছাপ কার—জন্তুর না মানুষের! পায়ের ছাপ দেখার জন্য পাহাড়ের ঢালের খুব নিকটে আসার বহু আগেই তাঁর নজরে পড়ে যে তাঁর সমস্ত সব্জী মাটি থেকে তুলে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হযেছে। রক্তাক্ত হৃদয নিযে তিনি এদৃশ্য দেখেন। সব্জী তাঁদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে তাঁর এই আশা চিরতরে এখন তিরোহিত। রাগে তাঁর বাক্‌রুদ্ধ। এ সবের মূলে জমিদার উও রযেছেন মনে করে তাঁকে গালমন্দ করতে করতে ছুটলেন, তিনি।

কিন্তু উপত্যকার শেষ প্রান্তে যখন তিনি এলেন, সেখানে দেখলেন যে পাহাডের খাঁড়ি আর ছোট্ট নদীর মাঝের রাস্তাটা বেড়া দিযে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার বেড়ার ফটকটা দৃহভাবে বন্ধ করা, যতই তা ধাক্কানো যাক না কেন সেটা একচুলও নড়ল না। ফটকটাও আবার এত উঁচু যে

তার উপর চড়ার চেষ্টা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই বন্ধ ফটকটায় পাথর দিয়ে ধাক্কা দেওয়া ছাড়া মহিলার গত্যন্তর ছিল না।

অনেক পরে একটা লোক ফটক পর্যন্ত এলো।

সে জোরে চিৎকার করে, "কি করছিস্, ওভাবে দরজা ধাক্কাছিস কেন।"

ধাক্কানো বন্ধ করে মেয়েটি বলেন, "দরজা খুলুন! জলদি! জমিদার উও-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

পাছায় হাত রেখে ঘাড়টা একদিকে কাৎ করে সে বলে, "কি জন্যে।"

লোকটার গরম মেজাজ দেখে শ্রীমতি শী ত ক্ষেপে লাল।

"উনি যেন জানেন না ন্যাকা! উনি আমার সব্জী নষ্ট করেছেন, কুঁড়ে জ্বালিয়ে দিয়েছেন, এ ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে আমার একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে!"

আবার তিনি দরজা ধাক্কাতে সুরু করেন, চীৎকার করে বলেন, "দরজা খুলুন! দরজা খুলুন!"

'এ্যাই ক্ষ্যাপা কুত্তি!' লোকটা বজ্রকণ্ঠে বলে। বেল্ট থেকে পিস্তল বার করে তাকে গুলি করার হুমকি দেয়—যদি সে দরজা ধাক্কান বন্ধ না করে!

"কি করে জানলি যে জমিদারের কাজ এ সব? ওকে করতে দেখেছিস্ তুই নিজে?"

পিস্তল দেখে শ্রীমতি শী ভয় পেয়ে যান। ফটক ধাক্কানো বন্ধ করেন। কিন্তু লোকটা পিস্তল চালালো না দেখে তিনি আবার সাহস সঞ্চয় করে বলেন, "আর কে হতে পারে? এ তল্লাটে উনি হচ্ছেন একমাত্র লোক যিনি এ ধরনের নোংরা কাজ করতে পারেন।"

"মুখ সামলে কথা বল্?" তারপর চাপা স্বরে বলেন, "ও শুনতে পেলে তোকে জেলে পাঠিয়ে দেবে।"

"আমি ভীত নই—এমন কি তিনি যদি আমায় খুন করার চেষ্টা করেন তা হলেও না।" আবার তিনি দরজা ধাক্কাতে সুরু করেন। "দরজা খোলো। নয়ত এটা টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেব।"

তাঁর পিস্তল দিয়ে শ্রীমতি শীর বুক লক্ষ্য করে লোকটা বলে, "এবার তোকে আমি মারবই।"

মহিলাটি বলেন সামনে খানিকটা ঝুঁকে, "চালাও! গুলি চালাও।"

কিন্তু লোকটা পিস্তল নামিয়ে নেয়।

সে বলে, "তোকে গুলি করা মানেই গুলির অসম্মান করা।" এই বলে সে ঘুরে চলে যায়।

"দরজাটা খুলছ না কেন ? কুত্তির বাচ্চা !"

তিনি দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে একসময় হাতে তাঁর ব্যথা ধরে যায় ; দরজা কিন্তু দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর তিনি সেখানেই বসে পড়েন—ক্লান্তিতে হাঁফাতে থাকেন।

অনেকক্ষণ ধরে বিশ্রাম নেওয়ার পর তিনি উপলব্ধি করলেন যে দরজার ব্যাপারে তাঁর আর কিছু করণীয় নেই। তাছাড়া ঐ লোকটাও ত বললো যে জমিদার উও-এর সাথে ঝগড়া করে কোন ফ্যায়দা হবে না, যেহেতু ওঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ মহিলাটির কাছে নেই। আবার কোর্টে এ ব্যাপারটা নিয়ে যাওয়াটাও কোন লাভ নেই। অসহ্য রাগে তিনি জমিদারের সঙ্গে লড়াই করতে এসেছিলেন কিন্তু তাঁর কাছ পর্য্যন্ত তিনি যেতেই পেলেন না ; এখন তাঁর পুনরায় শুভবুদ্ধি ফিরে এলো।

আবার তাঁর চিন্তাভাবনা ফিরে এলো ছেলে মেয়েদের ঘিরে। এবং একটা সুতীব্র মাতৃত্ব বোধ তাঁর হৃদয়টাকে আপ্লুত করে তোলে। ওদের কখনও তিনি পরিত্যাগ করবেন না। ওদের মানুষ করার জন্য একটা রাস্তা তিনি খুঁজে বার করবেনই।

তিনি ওখান থেকে উঠে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরে গেলেন।

কুঁড়ে ঘরটা পুড়ে যাবার ও সব্জীবাগান উৎপাটিত হবার পর পাহাড়ের এই ঢালটাকে আরও বেশী ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছে। ঝড় বাতাস থেকে রক্ষা পাবার জন্যে কোন আশ্রয় স্থল তাঁদের আর নেই ; আর জমি থেকে বাঁচার কোন আশাও তাঁদের নেই। এবং পাজী জমিদারটা নিশ্চয়ই অন্য কোন জঘন্য পরিকল্পনা করছে। এ জায়গা ত্যাগ করা ছাড়া তাঁর কাছে অন্য কোন বিকল্প নেই।

শ্রীমতির শী কোথায় যাবেন তার কোন ধারনাই নেই। তিনি কেবলমাত্র এটুকুই বুঝে ছিলেন যে যদি এখানে তিনি থাকেন ত তাঁর ছেলেমেয়েরা অনশনেই মারা যাবে।

সঙ্গে যা যা জিনিষ যাবে সে সব বাঁধাছাঁদা করে তিনি শেষ বারের মত কমলালেবু, মিষ্টি ছোট ছোট লেবুগাছ এবং কিশমিশ গাছ দেখতে গেলেন। সে সব নষ্ট করে দেবার তীব্র বাসনা তাঁর হয়েছিল। তিনি চান নি যে নোংরা জমিদারটা এ সব ভোগ করুক। কিন্তু আগুন লেগে তাঁর করাত ও কুঠার একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব এই টুকুই তিনি কেবল আশা করতে পারেন যে তাঁর ফল খেয়ে যেন জমিদারের রোগ ধরে।

সব শেষ, তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেলেন তাঁদের দিদিমার

কবরস্থানে,—তাঁকে বিদায় জানাতে। শ্রীমতি শী কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "মাগো! তোমার সাথে আমি থাকতে পেলাম না মা! ভিক্ষে করা ছাড়া আর আমাদের গতি নেই। আমরা যেখানেই যাই না কেন তোমার আত্মা যেন আমার ছেলেমেয়েদের রক্ষা করে।"

তারপর, তাঁর পিঠে বিছানা বেঁধে, কোলে বাচ্চাকে নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেন। বড় মেয়ে দুটি চাল সেদ্ধ করার কড়াইটা নিল, ছোট ছেলে দুটো চললো শূন্য হাতে।—কারণ বয়ে নিয়ে যাবার মত অন্য কিছুই আর ছিল না তাঁদের। তাঁদের পেছু পেছু চললো কুকুর দুটো। ওরা সবাই মিলে নদীর ধার ধরে ধরে চললো বাজারের দিকে।

সহৃদয় যে সব লোকজন একবার তাঁদের সাহায্য করেছিলো তাঁরা আরও সাহায্য করতে তাদের এবার অক্ষমতা, জ্ঞাপন করলে! কিন্তু তিনি তাঁর সন্তানদের জন্যে অন্ততঃ এক মুঠো খাদ্যের ব্যবস্থা করে নিলেন। বাসষ্ট্যাণ্ডের কাছে খোলা জায়গায় সেই বেদনাদায়ক রাতটা কাটালেন তাঁরা সকলে এবং পরদিন সকালে এখানে আর সাহায্যের আশা নেই দেখে ওঁরা সবাই নিকটবর্তী শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

শেষবারের মত উপত্যকটা তাঁদের দৃষ্টি গোচর হল। উপত্যকাটা এখন হাল্‌কা সাদা কুয়াশায় ঢাকা। প্রভাতী সূর্য্যের সোনালী ছটা পাহাড়ের উপর পাইন বনে পৌছেছে বটে, কিন্তু ছোট্ট নদীর ধারে ফলের গাছগুলো সব ও পাহাড়ের ঢালের কর্ষিত জমি এখনও রাতের অন্ধকারের ছায়ায় ঢাকা।

প্রথম এটা ছেলেমেয়েরাই দেখে এবং খুসীতে চীৎকার করে ওঠে। "ঐ আমাদের বাড়ী। মা। দেখো! নিচে তাকাও না মা?"

শ্রীমতি শী আড়চোখে একবার উপত্যকাটা দেখে নেন; তারপর চোখের জল ধরে রাখতে মাথা নীচু করে রাখেন।

ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞেস করে, "আমরা কখন ফিরে আসবো মা?"

চোখের জল গিলে জবাব দেন মা, "লেবুগুলো যখন পেকে উঠবে।"

ছেলেমেয়েরা খুব খুসী। কিন্তু ওদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করে! "মা", আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

প্রশ্নটায় মা বিচলিত বোধ করেন! অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেন।

তিনি ওদের বললেন, "তোদের বাবার খোঁজে।"

এই কথায় তাঁর ছেলেমেয়েরা আরও খুশী হয়। খুশীর জোয়ারে তারা

উত্তেজিত ভাবে চীৎকার করে "বাবা" "বাবা" করে ডাকতে শুরু করে দেয়।

শ্রীমতি শী এইবার ভেঙ্গে পড়েন; বড় বড় চোখের জলের ফোঁটা তার দুগাল বেয়ে ঝড়তে থাকে।

অনেক্ষণ কাঁদার পর তিনি একটু সুস্থ বোধ করেন। ছেলেমেয়েদের হাঁসির কলকলানি তাঁকে প্রফুল্ল করে তোলে। ঠোঁট দুটো কামড়ে ধরে তার সেই সিদ্ধান্তে পুনরায় অটল থাকেন যে সমস্ত ধরণের বাঁধা বিপত্তিকে নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুলবেনই।

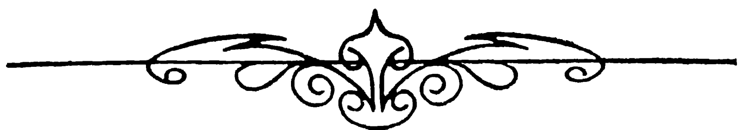
পরিশিষ্ঠ :—

(১) জ্যাপ বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে পরেই চিয়াং-কাই-শেক্ চীনা জনগণের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ সুরু করে দেন। সে সময় যুদ্ধ করার জন্য কৃষকেরা সামরিক বাহিনীতে যোগদানে অনিচ্ছা প্রকাশ করতো। তখন জোর করে তাদের সামরিক বাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করা হত। সাধারণতঃ এ কাজটা করা হত রাতে। যাদের নেতৃত্বে এ কাজ সংগটিত হতো তাঁদের বলা হত "বাও ঝাংগ" কুয়োমিনটাংদের নিয়ন্ত্রণে থাকা একশত পরিবারের প্রধানকে বাও ঝাংগ বলা হত।

(২) কুয়োমিনটাং বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকা ১০০টি পরিবারের প্রধান।

(৩) চীন দেশে সাধারনতঃ শোকের প্রকাশ দেখাতে হলে সাদা রং ব্যবহার করা হত।

লেখক—আই উও



চাঁদনী রাত

শহরে যাবার উদ্দেশ্যে লিউ-এর নৌকা অপেক্ষা করছে।

পাহাড়ের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে পূর্ণচন্দ্রোদয় হচ্ছে এবং তার ছটা নদীতীরে আছড়ে পড়ছে। নদীটা খুবই ছোট—পাহাড়ের পাদদেশে অন্ধকারে এটা অবস্থিত। জ্যোৎস্নালোকিত নদীর জল ধীরে ধীরে বয়ে চলছে। তার উপর ভাসমান চাঁদের আলোকে দেখে মনে হয় সেও বুঝি তার মত সর্পিল গতিতে ইয়াংগজি নদীতে গিয়ে মিশতে চাইছে। সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে অন্ধকার ফিকে হয়ে এলেও, এখনও সেটা জালের মত সব কিছুকে ঢেকে রেখেছে। পাহাড়, গাছ, নদী, মাঠ, বাড়ী—সব কিছুই সেই জালে ধরা পড়েছে। যদিও চাঁদের আলো নরম ও হাল্কা তাহলেও তা অন্ধকারে জালের গর্তের ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে বাইরে পড়ছে না।

পাথরের জেটিটা নদীর ভেতরে অনেকটা দূর পর্যন্ত বিস্তৃত; এবং তার ঠিক পাশেই লিউ এর নৌকাটা বাঁধা। তাকে নিবিড় ভাবে ঘিরে রেখেছে ঘন জলপদ্মগুলি, প্রচুর বেগুনি রং-এর জলপদ্ম প্রস্ফুটিত। জলের গোলুইতে চাপাপড়ে আছে তার পাতাগুলি।

নৌকার ভিতর টিমটিম করে একটা তেলের বাতি জ্বলছে। তীর থেকে দেখলে মনে হয় যেন গভীর অন্ধকারে ঘুমন্ত নৌকা গা ঢাকা দিয়ে আছে। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই; এটা একটা যেন পরিত্যক্ত দ্বীপ। কিন্তু নিশ্চিতভাবে নৌকায় লোকজন চড়ে বসে আছে।

দুজন যাত্রী চাঁদোয়া টাঙ্গানো কেবিনে শুয়ে আছেন। গোলুইতে বসে বসে একটি বাচ্চা ছেলে ঝিমুচ্ছে, আর নৌকার দাঁড়ের উপর বসে মাঝি লি বেশ মৌজ করে সিগারেট টানছে। কেউ কোন কথা বলছে না; দেখে মনে হয় আগেই এত বেশী কথা কওয়া হয়ে গেছে যে নোতুন করে তাতে আর কিছু যোগ করার মত কথা তাঁদের নেই। তাঁরা সকলেই রুটিনটা জানেন। যাত্রীরা সকলে নিত্যযাত্রী। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায়

নৌকাটা শহরে যায় আর ফেরে তার পরদিন সকালে। এই স্থায়ী রুটিনের রদবদল বিশেষ একটা হয় নি, নিত্যযাত্রীরা সপ্তাহের বেশীর ভাগ দিন এই নৌকায় যান তাই প্রায় সকলে একই সময় ঘাটে এসে হাজির হন তাঁরা। তারপর নিজেদের মধ্যে বেশী কথাবার্তা না বলে সোজা কেবিনে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েন এবং জেগে ওঠেন ঠিক সেই সময় যখন নৌকাটা শহরে ঢুকছে। কোন কোন সময় এখানেই তাঁরা নেমে পড়েন ; আবার কোন কোন সময় কেউ কেউ আবার প্রাদেশিক রাজধানী যাবার ছোট্ট স্টীমারে ওঠেন এখানে। আজকের রাতের কম বয়সী যাত্রীটি হলেন গ্রামের স্কুলের মাস্টারমশাই। বাড়ী তাঁর শহরে। প্রত্যেক শনিবার রাতে তিনি বাড়ী ফেরেন। বয়স্ক ব্যক্তিটি হলেন শহরের দোকান কর্মচারী—গ্রামে বাস করেন। মাঝে মাঝে দোকানের মালিক ব্যবসার প্রয়োজনে তাঁকে প্রাদেশিক রাজধানীতে পাঠিয়ে দেন।

চাঁদের আলো গোলুইতে পড়ে বাচ্চা ছেলেটার অবিন্যস্ত চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। সে এ ব্যাপার সম্বন্ধে সচেতন নয়—মনে হয়। সে তার মাথাটা কেবল ধীরে ধীরে ডাইনে বাঁয়ে দোলাচ্ছে, ক্লান্তিতে তার চোখ দুটো বোজা। কিন্তু মাঝে মধ্যে সে হঠাৎ তার চোখ খুলে তাকিয়ে থাকে নদীর ধার দিয়ে চলে যাওয়ার পথে বা নদীর জলে। যদি সে দেখে যে কোন কিছুই নড়াচড়া করছে না তখন নিজের মনে বিড়বিড় করে কিছু বলে আবার সে ঝিমুতে থাকে।

"আশ্চর্য্য ত ? গেনসেংগ এখনও এলেন না কেন ?" কেবিনে পাশ ফিরতে ফিরতে স্কুল মাস্টারমশাই নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাঁর পাশে ছোট ফোকরটা দিয়ে মাথাটা বার করে গোলুইএর দিকে তাকান।

সবকিছুই আজ ভীষণভাবে চুপচাপ। কোথাও কোন আলো জ্বলছে না, নদীর ধারের ঐ মন্দিরটাও আজ যেন ঘুমাচ্ছে। চন্দ্রালোকে বিস্তৃত হয়ে রাস্তাটা চিতিয়ে পড়ে আছে। সেখানে কেউ হাঁটছে না। কেবিনের ফোকরের ঠিক নীচে স্কুল মাষ্টারমশাই-এর মাথার খুব নিকটেই অনেক বেগুনি রং-এর জলপদ্ম ভাসছে।

মাস্টারমশাই কেবিনের ভেতরে মাথাটা টেনে নিয়ে ফোকরটা বন্ধ করে দেন। দোকান কর্মচারী ওয়াংগ চেঁচিয়ে মাঝিকে বলে :

"জানো কটা বাজে ? নৌকাটা ছাড়ছ না কেন ?"

লি নৌকার হাল থেকে উত্তর দেন : "গেনসেংগ এখনও এলেন না যে ! এখনও সময় আছে অনেক—চিন্তা করবেন না।"

"ও ত বরাবর সাতটাতেই আসে। কিন্তু আজ রাতে......" মাষ্টারমশাই আবার যোগ করেন। এই বলে ঘড়িটা হাত দিয়ে অনুভব করে ফোকরের বাইরে নিয়ে ঘড়িটা দেখে বলেন, "এখনই ত সাতটা চল্লিশ বেজে গেছে। আজ রাতে উনি আর আসবেন না।"

মাঝি কিন্তু নিশ্চিত। "উনি আসবেনই। নিশ্চয় আসবেন। তাঁর কাছে এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা তিনি শহরে নিয়ে যাবেন। জুন ভাই অত ভাব্‌নার কি আছে? আর ওয়াংগ সাহেব ত আপনি আমার পুরানো খদ্দের। আপনি ত দেখছেন যে প্রত্যেক দিনই আমরা ছোট্ট স্টীমারটাও পেয়েছি। এবং এমন একদিনও ঘটে নি ওটা আমাদের পৌঁছানোর আগেই চলে গেছে।"

জুন মাষ্টারমশাই বলেন, "গেনসেংগ আগে কখনও দেরী করেন নি। উনি খুব সকাল সকাল এসে হাজির হতেন। এখনই দেখছি উনি আমাদের অপেক্ষা করিয়ে রেখেছেন।"

বাঁ পায়ের গোড়ালির উপর ডান পায়ের গোড়ালি রেখে দোকান কর্মচারী ওয়াংগ বলেন, "কিছু একটা নিশ্চই ঘটেছে তাই এত দেরী হচ্ছে।"

"হতেই পারে না। আমি তাঁকে জানি। তিনি আফিং মদ কোনটাই খান না। কোন কিছুর কারণেই তাঁর দেরী হচ্ছে না। এখনই এলেন বলে! নৌকার পার ধরে ধরে গোলুইতি এসে চেঁচান, "লিন্।" বাচ্চাটা যে এতক্ষণ ঝিমুচ্ছিল সে তড়াক্ করে দাঁড়িয়ে ওঠে।

লি তাকে দেখে নিয়ে পাথরের জেটিতে নামেন। নদীর ধার ধরে কয়েক কদম হেঁটে আবার ফিরে আসেন। তাঁর ঠিক সামনেই আকাশ থেকে সরাসরি পূর্ণিমার চাঁদ ঝুলছে। তার রুপালী আলো ঠাণ্ডা জলের মত তার মাথাকে চান করিয়ে দিয়ে তাকে চাঙ্গা করে তোলে।

মন্দিরের পাশে বটগাছের কাছে এক ছায়ামূর্তির আবির্ভাব ঘটে হঠাৎ।

"গেনসেংগ আসছেন।" লি আপন মনেই বলেন। "তৈরী থাক্।" বাচ্চাটাকে তিনি নির্দেশ দেন। গেনসেংগ এখানে পৌঁছানোর সাথে সাথেই আমরা নৌকা ছেড়ে দেব।

বাচ্চাটা সম্মতিসূচক কিছু একটা বিড়বিড় করে বলে। তারপর লম্বা বাঁশের লাঠিটার একপ্রান্ত জলে ফেলে তাতে শরীরের খানিকটা চাপ দিয়ে জলে অল্প ঢেউ তুলে নৌকাটা তীরে ভিড়িয়ে দেয়।

পাথরের জেটিতে লি দাঁড়িয়ে। ছায়ামূর্তি আরও কাছে আসে। তিনি

দেখলেন যে যে লোকটি ছোট্ট একটা চাঁচের ঝুড়ি হাতে আসছে সে বেশ বেঁটে। উনি গেনসেংগ নন। ওর নাম ঝাংগ। ছোট্ট গ্রামের মনোহারী দোকানের মালিক ঝাংগও আজ রাতে শহরে চলেছেন।

"যাক্ নৌকাটা এখনও ছেড়ে দাও নি", ঝাংগ দ্রুত পাথরের জেটিতে নেমে আসেন এবং লি এর দিকে চেয়ে হাসেন।

"আপনি একেবারে নৌকা ছাড়ার মুখে এসে পড়েছেন। আমরা গেনসেংগ-এর জন্য অপেক্ষা করছি।" লি-এর স্বরে চিন্তার আভাস।

কেবিন থেকে মাস্টারমশাই চেঁচিয়ে বলেন, "এখন আটটা। উনি নিশ্চিতভাবে আসছেন না।"

"আরে সত্যই ত! উনি এখানে এখনও আসেন নি? উনি ত বরাবর খুব সকাল সকাল নৌকায় চড়ে বসে থাকতেন।" ঝাংগ নৌকায় চড়েন। একদিকে তাঁর চাঁচের ঝুড়ি নামিয়ে রেখে, ডেকে বসে একটা সিগারেট ধরান। চাঁদের সামনা সামনি বসে তিনি আস্তে আস্তে সিগারেট টানেন।

"এই লি, ওখানে গেনসেংগ আছে কি?" ববছাঁট চুল বিশিষ্ট মহিলাটি—পরনে তাঁর কালো মসলিনের প্যান্ট ও জামা,—খালি পায়ে নদীর তীর ধরে এগিয়ে আসেন। জেটিতে দাঁড়িয়েই তিনি চেঁচান।

"আজ প্রত্যেকে আমরা গেনসেংগ-এর জন্য অপেক্ষা করে আছি। উনি নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছেন। উনি কোথায় আছেন তা ত আপনার জানা উচিত।" বিরক্তি সহকারে লি জবাব দেন।

চিন্তিতভাবে মহিলা জানতে চান; "আপনি বলছেন উনি এখনও আসেন নি।"

"এমন কি তাঁর ছায়াটা পর্যন্ত আসে নি।"

"ঠাট্টা করছেন না ত? আমি কিন্তু বেশ চিন্তিত।" মহিলার কণ্ঠে ভেঙ্গে পড়ার আভাস।

"কে ঠাট্টা করছে? অত সময় আমার নেই। আমরা যা জানতে চাই তা হল আপনার স্বামী আজ রাতে এই নৌকায় যাবেন কি না?" লি-এর কণ্ঠস্বর বেশ গুরু গম্ভীর।

একটা বুক ফাটা আর্তনাদ করে মহিলাটি ঘুরে ছুটতে থাকেন।

লি ডাকেন, "দাঁড়ান দিদি দাঁড়ান।" ওর আবার কি হল?

মহিলাটি দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে নদীর তীর ধরে ছুটছেন—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন আর গেনসেংগ-এর নাম ধরে ডাকছেন।

তার চীৎকারের আওয়াজে লি বেশ অস্বস্তি বোধ করেন। কাঠের পুতুলের মত লি পাথরের জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকেন।

"কি ব্যাপার?" তিনজন যাত্রী বিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন। ঝাংগ বেশ পরিষ্কার ভাবে সব কিছুই দেখতে পাচ্ছে; ব্যাপারটা দেখার জন্য দোকান কর্মচারিটি হামাগুড়ি দিয়ে কেবিনের শেষে এসে যান। মাস্টারমশাই আবার কেবিনের ফোকর খুলে সেখান দিয়ে নিজের মাথা বার করে দেন।

সেখান থেকে সড়ে গিয়ে গড গড় করে লি বলেন, "খোদাই জানেন।"

"স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বোধ হয় কোন কথা কাটাকাটি হয়ে থাকবে, ঐ অবস্থায় ওঁকে ওখানে রেখে গেনসেংগ পালিয়েছে। হাঃ হাঃ হাঃ।" 'সিগারেটের শেষ টুকরো জলে ফেলে দিয়ে তিনি পিচ্ কাটেন।' "ঐ রকমই একটা কিছু ঘটে থাকবে।" পুনরায় তিনি হেসে ওঠেন।

"গেনসেংগ কখনও তার বৌ-এর সঙ্গে ঝগড়া করে না। এটা একটা অন্য কিছু হয়ে থাকতে পারে। আমি নিশ্চিত।" লি বিমর্ষ কণ্ঠে বলেন। তিনিও বিভ্রান্ত। কি হতে পারে?

"গেনসেংগ," "গেনসেংগ" মহিলার বুকফাটা আর্তনাদ রাতের নিস্তব্ধতাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় দূরে অনেক দূরে; প্রতিটা আর্তনাদ অনুসরণ করে চলেছে তার আগের আর্তনাদকে, প্রতিটা আর্তনাদ তার পূর্বের আর্তনাদ থেকে আরও বেদনার্ত, আরও করুণ, সবকিছুই থর থর করে কাঁপছে।

"এই লি! কি হল?" পাশ ফিরে কেবিন থেকে মাস্টারমশাই চীৎকার করেন। তিনি ফোকরটা বন্ধ করে দেন। কেউই তার কথার কোন জবার দিলেন না।

অধৈর্য্য হয়ে দোকান কর্মচারিটি অনুনয় করে বলেন, "নৌকাটা ছেড়ে দিন।" তাঁর আশঙ্কা হয়ত তিনি প্রাদেশিক রাজধানীতে যাবার ছোট স্টীমারটা পাবেন না।

মহিলার কান্না শুনে লি ক্রমে ক্রমে অশান্ত হয়ে পড়েন। যাত্রীদের প্রশ্নের জবাব দেবার পরিবর্তে তিনি পাথরের জেটিতে স্থির দাঁড়িয়ে সেই মেয়েটার স্বামীর নাম ধরে ডাক শুনতে থাকেন। "তা হতেই পারে না।" হঠাৎ তিনি মনে মনে বলেন, "মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।" তিনি দ্রুত লাফ মেয়ে জেটি থেকে নদীর তীরে নেমে রাস্তা ধরে ছুটতে থাকেন।

ছেলেটা, গোলুইতে বসে যে ঝিমুচ্ছিল, লাফ দিয়ে তীরে নেমে তাঁর পেছু পেছু ছুটতে থাকে। "বাবা, কোথায় যাচ্ছ বাবা ?"

লি ছুটছেন। তিনি উত্তর দিলেন না। বাচ্চার চীৎকার সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল,—বাতাসে তার সামান্য দাগ না রেখে। মহিলার সুতীব্র আর্তনাদে বাতাস আজ ভারি। প্রথমে একটা আর্তনাদ, তারপর আরেকটা, নোতুন, পুরানো···। চাঁদনী রাতটা যেন কান্না দিয়ে ঠাসা। ঐ হৃদয় বিদারক কান্না অবিরত কাঁপছে। এটা শুনে মনে হয় যেন একটা সজীব প্রাণ ধ্বংস হয়ে গেছে প্রাণটা যেন টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ছিঁড়ে গেছে।

তিনটে লোক কর্দমাক্ত রাস্তা ধরে ছুটছেন। মহিলা, মাঝি, বাচ্চাটা—প্রত্যেকে প্রত্যেককে ধাওয়া করছে। তারপর বাচ্চাটা থেমে ঘুরে দাঁড়ায়।

নৌকাটা এখনও জেটিতে দাঁড়িয়ে। তিনজন যাত্রীই কেবিন থেকে বাইরে এসে গোলুইতে বসেছেন। অনুসন্ধিৎসা বশত, তাঁরা গেনসেংগ সম্বন্ধে আলোচনা করতে থাকেন, কিন্তু বেশীর ভাগটাই তাঁরা আন্দাজের উপর ভর করে করছেন। প্রত্যেকেই তাঁদের কল্পনাকে যতদুর সম্ভব প্রসারিত করে আলোচনাকে সজীব করে তোলেন।

মহিলার হৃদয়বিদারক কান্না ক্রমে ক্রমে কমতে কমতে শেষে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। লি মহিলাটিকে একটি গাছতলায় এসে ধরে ফেলেন। পরিশ্রান্ত হযে তিনি গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছেন, তাঁর মাথার চুল আলুথালু, মুখটা তাঁর চোখের জলের কাটাকাটি দাগে ভরা, তাঁর চোখ নিবদ্ধ ওপারের গভীর জঙ্গলে, আস্তে আস্তে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন তিনি, ওঁকে এখন ঠিক ভূতের মত দেখাচ্ছে।

তাঁর হাত দুটো ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে তিনি চীৎকার করেন, "আপনার কি হয়েছে ? ক্ষেপে গেলেন কেন দিদি ? এত দুঃখ কিসের ? বলুন না আমায় ?"

মাথাটা তুলে গেনেসেংগ-এর স্ত্রী এতক্ষণে কান্না বন্ধ করেন। চোখ বড বড় করে তিনি এমন ভাবে লি-এর দিকে তাকিয়ে থাকেন যেন তিনি তাঁকে চেনেন না। অনেক অনেক পরে তিনি শোকাকুল কণ্ঠে শেষকালে বলে ওঠেন, "গেনসেংগ" "গেনসেংগ।"

লি একটু চাপ দেন তাঁকে, "হ্যাঁ গেনেসেংগ-এর কি হয়েছে ? বলুন না ?"

উদাসী গলায় মেয়েটা জবাব দেন, "কিছু জানি না।"

বিরক্তি সহকারে লি পিচ কেটে বলেন, "জানেন না ত শুধুমুদু কাঁদছেন কেন? পাগল নাকি?"

"ওরা ওঁকে নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করেছে। নিশ্চিতভাবে গ্রেপ্তার করেছে।" তিনি ভীষণ জোরে কেঁদে ওঠেন। তার মুখে আতঙ্কের ছাপ।

"ওঁকে গ্রেপ্তার করেছে? কে? আপনি বললেন না কেউ একজন তাকে গ্রেপ্তার করেছে?" লি জিজ্ঞেস করেন; সেও আতংকিত। তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে যায়। গেন সেংগ ছিলেন মাঝি লি-এর বন্ধু। লি ভাবে সে একজন সৎ লোক। তাহলে তাকে কেউ একজন গ্রেপ্তার করতে চাইবে কেন?

"এ নির্ঘাত তাংগ জিঝেন-এর কাজ—হতেই হবে।" মহিলা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলেন। গতকাল গেন সেংগ আমায় বলেছিল যে তাংগ জেলা শাসকের কাছে গিয়ে এই অভিযোগ তার নামে করে এসেছে ডাকাত দলের সাথে তার যোগাযোগ রয়েছে। ব্যাপারটা আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ বিকেলে গেন সেংগ যখন বাইরে বেরোয়, কেউ একজন যে দেখে তাংগ-এর কিছু লোকজন তার পেছু নিয়েছে। ওরা সংখ্যায় অনেক ছিল, আবার সঙ্গে একজন ডিটেকটিভ ছিল। সেই থেকে এখন পর্যন্ত গেন সেংগ ঘরে ফেরে নি। আমার স্থির বিশ্বাস ওরা গেন সেংগকে গ্রেপ্তার করেছে।"

"ঐ তাংগ লোকটা একটা টাকা ছেনতাইকারী বেজন্মা। কিন্তু তার গেন সেংগ-এর সাথে বিরোধটা কোথায়? দিদি আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে। আপনি নিজ চোখে কি দেখেছেন যে কেউ গেন সেংগকে পাকড়াও করেছে?" লি এইভাবে তাঁকে সান্ত্বনা দেয়। তার গলার স্বরে ততটা রূঢ়তা এখন আর নেই যা কয়েক মুহূর্ত আগেও ছিল।

"ভুল? কারণ আপনি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না! পুরসভার প্রধান হিসেবে তাংগ-এর চাকরী চলে গেলে তাংগ ভীষণ রেগে যায়। সে পিংগকে খুন করতে একটা লোক পাঠিয়েছিল। কিন্তু সে পিংগকে হত্যা করতে পারলই না উপরন্তু পুরসভার প্রধানের চাকরীটাও গেল। কয়েকদিন পূর্বে গেন সেংগ ও পিংগ-এর ভাই উভয়ে মিলে কৃষকের ইউনিয়নের মত এক সংগঠন গড়ে তোলে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে। আমি গেন সেংগকে অনুরোধ করেছিলাম সে নিজে যেন বুড়ো বেজন্মার বিরুদ্ধে না যায়। কিন্তু সে শুনলো না। সে সারাটা দিন ধরে চেঁচিয়ে বেড়ালো যে সে বদ্ জমিদার ও পাজি আমলাদের উৎখাত করবেই। কিন্তু এখন ত সে শেষ হয়ে গেল। তারা এমনকি যদি তার মাথাটা কেটে বাদ

নাও দিয়ে থাকে তাহলেও ওকে জ্যান্ত বাড়ীতে ফেরৎ পাঠাবে না। ডাকাতদের সাথে জোট বাঁধা—মারাত্মক অপরাধ।”

লি বিড়বিড় করে, “তাংগ এত শক্তি ধরে এ আমি বিশ্বাস করি না।”

“ওর যে টাকা আছে। জেলা শাসক ওর কথা শোনে; কেন না সে তাংগ-এর বন্ধু।” গেন সেংগ-এর স্ত্রী ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ চড়তে থাকে—চোখ থেকে তাঁর আগুন বেরুচ্ছে। তাঁর অসহায়তাকে ছাপিয়ে যায় তাঁর ক্রোধ। “এমনকি পিংগ-এর মত ভালো লোককেও সে খুন করতে চায়···আলিউকে কি ভুলে গেছেন? ওর আর গেন সেংগ-এর মামলা ত হুবহু এক।” আবার তাঁর মুখে আতঙ্কের ছাপ দেখা যায়।

লি নির্বাক। হ্যাঁ আলিউ এর কি ঘটেছিল তা বেশ ভালো করেই তাঁর মনে আছে। আলিউ ছিলেন এক সজ্জন ব্যক্তি। ব্যস্ততাপূর্ণ চাষের সময় সে ক্ষেতমজুরের কাজ করত। অন্য সময় কুলিগিরি করে জীবন চালাত। এক সময় তার বাঁশের বাঁকের জন্য বাড়তি কর দিতে নারাজ হয়; কয়েকজন কুলিকে সঙ্গে নিয়ে সে মিছিল করে তাংগ-এর বাড়ী গিয়ে বেশ হৈ চৈ বাধায়। তাংগ ছিল এই কর আদায়কারীদের দায়িত্বে। দুদিন পরে পুলিশ আলিউকে গ্রেপ্তার করে। তাকে পনেরো বছরের সাজা দেওয়া হয়—ডাকাতদের সাথে যোগাযোগ আছে এই সন্দেহে। আলিউকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন সে লি-এর নৌকায় একটা বোঝা নিয়ে আসছিল। লি এ সব বেশ পরিষ্কারভাবে দেখেছে। একটা সৎ লোক, যে কখনও কোন অন্যায় করেনি, তাকে কিনা জেলা-শাসক বললেন যে তাঁর নাকি ডাকাতদলের সাথে যোগাযোগ আছে। কালে কালে কি যে হলো! লি এখন গেন সেংগ-এর স্ত্রীর সব কথা বিশ্বাস করে।

লি-এর মাথা আনত হয়। তার হৃদপিণ্ডের উপর যেন বিশাল ভারী এক পাথর চাপা দেওয়া হয়েছে। হাত দুটো জড়ো করে তিনি ভাবেন। তিনি কিন্তু কোন সমাধান ভাবতে পারছেন না। মাথায় তাঁর অসহ্য যন্ত্রণা। তাঁর মনের ভেতর দিয়ে অনেক জিনিস উঁকি দিয়ে যায়। তিনি ভীষণভাবে বিভ্রান্ত। মহিলার হাত দুটো ধরে লি আদেশ করেন, “দিদি ওঠো জলদি। ওরা যদি গেন সেংগকে গ্রেপ্তার করেই থাকে, ত আমাদের ভাবতে হবে কেমন করে তাঁকে বাঁচানো যায়। এখানে বসে কেঁদে কেঁদে কি লাভ।” মহিলাকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দেন লি। তারা তারপর নদীর ধার ধরে যে রাস্তা গেছে সেই রাস্তা ধরে দ্রুত চলতে থাকেন।

অনেকটা দুর চলে যাবার পূর্বেই দেখা গেল বাচ্চাটা ছুটতে ছুটতে তাদের দিকে আসছে। সে খুব জোরে ছুটছে আর চেঁচাচ্ছে "বাবা, বাবা" বলে—তার মুখে আতঙ্কের ছাপ। "গেন সেংগ"······বাবার হাত ধরে সে খালি এ কথাই বলে—আর কিছু না।

কাঁপা কাঁপা গলায় তিনি জানতে চান, "হ্যাঁ কোথায় সে ?" তিনি দ্রুত তার কাছে গিয়ে তাকে ঝাঁকানি দিয়ে বলেন।

লি ভীষণ উত্তেজিত। "লিন বল কি হয়েছে ?" তার মনে অশুভ কোন ব্যাপার বাসা বাঁধে।

বাচ্চাটার মাথা ঘামে জবজব করছে। তার ছোট্ট মুখটা ভীত সন্ত্রস্ত। "গেন সেংগ" ·····সে তোৎলাতে তোৎলাতে বলে, "সে এখন······"ওদের দুজনের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে।

নদীর ধারে একটা ঘাসে ভরা বার্তের সামনে তিনজন যাত্রী বসে আছেন, রাস্তা থেকে খানিকটা নিচে এই গর্তটা। বাচ্চাটা সর্বপ্রথম সেখানে পৌঁছালো। সে ভীষণ ভয় পেয়েছে। বলে, "বাবা দেখ···।"

গেন সেংগ-এর স্ত্রী বিকট এক আর্তনাদ করে সামনে ছুটে যান। লি-ও তাকে অনুসরণ করেন।

নদীর ধারটা বেগুনি রং এর জলপদ্মে ঠাসা। ঘাসের উপর হাঁটু গেড়ে বসে মাষ্টারমশাই হাতে করে জলজ উদ্ভিদ সব আলাদা করছেন। জলের উপর শান্তভাবে পড়ে আছে একটা ফুলে যাওয়া দেহ। কালো মস্‌লিনের কাপড়টার খুঁঠ গাছের একটা ডালে আটকে ঝুলছে। জামাটার পেছনে বাঁ দিকে ঘেঁষে একটা ছোট্ট গর্ত।

"গেন সেংগ"—দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাকে জড়িয়ে ধরে মেয়েটি আর্তনাদ করে ওঠেন। তাঁর কান্না শুনে বোঝা যায় যে তার হৃদয়টাই বুঝি ভেঙে গেল।

মাথাটা একপাশে সরিয়ে নিয়ে বিমর্ষ ভাবে চাপা স্বরে মাস্টারমশাই বলেন, "ও মারা গেছে।"

দোকান কর্মচারী বলেন, "ওরা নিশ্চয়ই প্রথমে তাঁকে গুলি করে—রক্তটা দেখ।"

ছোট মালিক প্রস্তাব দেন, "ওকে আগে ওখান থেকে বার করা যাক্।"

লি বেশ জোরে শ্বাস ফেলেন। ছেলেটার কাঁপা কাঁপা হাত দুটো শক্ত করে নিজের হাতে নিয়ে জলের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন তিনি।

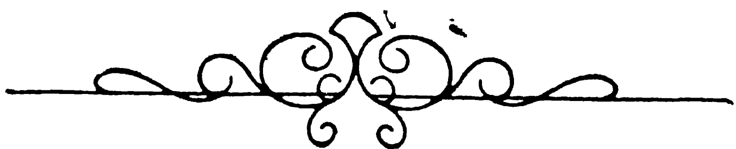
বিধ্বস্ত হৃদপিণ্ডের টুকরো টুকরো অংশের মত গেন সেংগের স্ত্রীর কান্না

অবিরাম বাতাসকে ভারী করে তুলেছে। সেই কান্না চাঁদনী রাতের ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। বাতাস, মাটি, জল—সকলে আজ যেন কাঁদছে—প্রতিটি গাছ, প্রতিটি গাছের শিক্‌, প্রতিটি ফুল, প্রতিটি জলপদ্ম সকলেই কাঁদছে।

গ্রামটা, ছোট নদীটা, চাঁদনী রাতে শান্তভাবে পড়ে রয়েছে যেন আজ। এই বেদনার্ত পরিবেশ দেখে যেন সমস্ত গ্রামটাই—কেউ বাদ নেই—যেন কেঁদেই আকুল। প্রত্যেকের চোখেই জল।

আজকের রাতটা চমৎকার এক চাঁদনী রাত। কোথাও কোন বাতাস নেই, বৃষ্টি নেই। কিন্তু লি-এর সেই নৌকা, যেটা সহরে পৌঁছানোর আগে প্রাদেশিক রাজধানী যাবার ছোট্ট স্টীমারটা পূর্বে কখনও আগে ছেড়ে চলে যায় নি। এই সর্বপ্রথম সেটা লি এর নৌকা পৌঁছানোর আগে সহর ছেড়ে চলে গেল।

লেখক—বা ঝিন



স্বামী

সেবার বসন্তকালে একনাগাড়ে সাতদিন ধরে বর্ষণের ফলে নদীর জল ভীষণ বেড়ে গেল।

তার ফলে নোঙ্গর করা অহিফেন ও বেশ্যালয় নৌকাগুলো নদীর তীরের এত কাছে চলে আসে যে নদীর ধারের উঁচু উঁচু বড় বড় বাড়ীর থামগুলোর সঙ্গে তাদের বেঁধে রাখা সম্ভব হয়।

"চার সাগরের চায়ের দোকানে" বসে আড্ডাবাজেরা চা পান করতে করতে জানালা থেকে ঝুঁকে নদীর উপর যদি লক্ষ্য করে তাহলে নদীর ওপারে প্যাগোডার পাশে "কুয়াশাচ্ছন্ন বৃষ্টি ও প্রস্ফুটিত লাল ফুলের" অপূর্ব দৃশ্য তাদের চোখে পড়বেই। নৌকার মেয়েরা তাদের খরিদ্দারদের অহিফেনের পাইপ ধরিয়ে দিচ্ছে—এদৃশ্যও তারা বসে বসে লক্ষ্য করতে পারবে। এই ধরণের সুবিধাজনক নিকটবর্ত্তিতার ফলে নদীর উপর বা নদীর তীরে থাকা পরিচিতরা নিজেদের মধ্যে অভিনন্দন বিনিময় করতে পারবে, পরস্পর আড্ডা দিতে পারবে, ছেনালী করতে পারবে এবং গলা চড়িয়ে খিস্তি খেউড় করতে পারবে। চায়ের দোকানের খরিদ্দারেরা চায়ের দাম মিটিয়ে নোনা লাগা ঢাকা বারান্দা পার হয়ে পাঁকের কাদা ছিটোতে ছিটোতে সোজা নৌকায় চলে যায়।

একবার নৌকায় উঠে তারা পাঁচ সেণ্ট থেকে পাঁচ ডলার পর্য্যন্ত অর্থ দিয়ে সেখানে অহিফেন খেতে পারবে, তাদের পছন্দ মত মেয়ে নিয়ে বা তা বাদ দিয়ে রাত কাটাতে পারবে। তাদের জন্যে সারারাত জেগে খুশী মনে অপেক্ষা করে থাকবে বেশ হৃষ্টপুষ্ট বড় নিতম্ব বিশিষ্ট সুন্দরী গাঁয়ের মেয়েরা এবং তারা ওদের সঙ্গে তখন এমন আচরণ করবে যাতে তারা মনে করে স্বগৃহে আছি।

অন্যান্য জায়গার মতই নৌকাতেও এই ধরণের কাজের নাম দিয়েছে

তারা ব্যবসায়। ওরা সকলে এখানে এসেছে ব্যবসা করতে। কথাটা এভাবে বলার ফলে যা দাঁড়ায় তা হল অন্যান্য কাজের সঙ্গে এই ধরণের কাজের কোন পার্থক্য নেই, এবং কাজটা নীতিগতভাবে ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। এদের প্রত্যেকে এসেছে গাঁয়ের কৃষক পরিবার থেকে, এবং যাঁতা, বাছুর, সুন্দর স্বাস্থ্যবান স্বামী ছেড়ে তার পরিচিতা কোন গাঁয়ের মেয়েকে অনুসরণ করে এই নৌকায এসে উঠেছে এই "ব্যবসায" করতে। ধীরে ধীরে ব্যবসায় করতে করতে এই সব মেয়েরা শহুরে বনে যায় ও নিজের গাঁ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ; ধীরে ধীরে সে এমন কতকগুলি কু-অভ্যাস আয়ত্ব করে যা কেবল শহরেই প্রযোজন হয। সে অধঃপতিতা হয়ে যায়। কিন্তু যদিও তা হবার প্রক্রিয়া অত্যন্ত শ্লথ ও সময় সাপেক্ষ, তাই ব্যাপারটা সকলের অলক্ষ্যেই ঘটে যায়। তাছাড়া ওদের অনেকেই গ্রাম্য সরলতা সব সময বজায রাখতে পারে। সুতরাং শহরে নদীর উপরে এই ধরণের নৌকার পতিতালযে গ্রাম্য মেয়ের কখনও আকাল পড়ে না।

কারণটা অত্যন্ত সহজ। যে সব মহিলাদের সন্তান উৎপাদনের তাড়া নেই, তারা যদি প্রতি মাসে তাদের দুটো সন্ধ্যাবেলার উপার্জন ঘরে পাঠায় তাহলে তাতেই তাদের সৎ, কর্মঠ, কৃষক স্বামী ঐ গাঁয়েই আরামে থাকতে পারবে। এই পদ্ধতিতে তাদের একটা বাড়তি আয়ও হয়। আর মেযেটাও তার স্ত্রী হিসেবে থেকেই যায়। এইভাবে অনেক তরুণ স্বামী তাদের স্ত্রীদের শহরে পাঠিয়ে নিজেরা চাষবাস করে শান্তি পূর্ণভাবে বাড়ীতে থেকে যায়।

যদি কোন স্বামী তার নৌকায় ব্যবসারতা স্ত্রীর সঙ্গ লাভে বঞ্চিত থাকে বা কোন উৎসবে তার সঙ্গে দেখা করতে চায় তাহলে যেহেতু মেযেটার বাড়ী যাওয়া হচ্ছে না তাই স্বামীকেই ধোপ দুরস্ত কাচা পোষাক পরে কোমরে তামাকের থলি গুঁজে—যা তারা সব কাজের সময সঙ্গে রাখে পিঠে—রাঙা আলু, আঠালো চালের পিঠে বা সেই ধরণের কিছু জাতের রান্না ভরে নিয়ে শহরের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়ে। ঘাটে জিজ্ঞেস করে প্রথম নৌকা থেকে খোঁজ নিতে নিতে স্ত্রীর সঠিক অবস্থান আবিষ্কার করে। তারপর নৌকায় চড়ে কেবিনের বাইরে ডেকে সাবধানে কাপড়ের জুতো খুলে রাখে। তার বয়ে আনা জিনিসপত্র স্ত্রীকে দিতে দিতে সে তার স্ত্রীর আপাদ মস্তক অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। কারণ এতদিনে স্বাভাবিক ভাবেই তার চোখে মেয়েটা এত বদলে গেছে যে চেনাই যায় না তাকে আর।

মাথার তেল চকচকে লম্বা চুলের বড় খোঁপা, সুন্দর টানা টানা ভ্রূজোড়া, পাউডার মাখা সাদা মুখ, রাঙ্গানো ঠোঁট এবং এই শহুরে পরিবেশ, শহুরে পোষাকে—এই সব কিছুই মেয়েটার গাঁয়ের স্বামীকে দুশ্চিন্তা গ্রস্ত ও বিচলিত করে তোলে। স্বামীর এই হতবুদ্ধিতার কারণ মেয়েটা খুব সহজেই বুঝতে পারে নিরবতা ভঙ্গ করে তাই সেই প্রশ্ন করে, "পাঁচ ডলারটা পেয়েছ ত ?" বা "শূকরীর আরও বাচ্চা হলো না কি ?" যে কায়দায় সে এসব কথা বলে, সেটাও এত বদলে গেছে যে কানে অপরিচিতের মত ঠেকে। এটা যেন শহরের সহজ সরল রাশভারী কোন মহিলার কণ্ঠস্বর। তা মোটেই গাঁয়ের লাজুক নম্র শান্ত পুত্রবধূর কণ্ঠস্বর নয়।

যখন স্ত্রী তাকে টাকার কথা, শূকরীর কথা জিজ্ঞেস করে তখনই তার স্বামী পরিষ্কার দেখতে পায় যে এখনও পর্য্যন্ত নৌকায় তার কিছু মর্য্যাদা আছে স্বামী হিসেবে। দেখে যে শহুরে এই মহিলা সম্পূর্ণভাবে তার গাঁকে ভুলে যায় নি। তাই সে সাহস সঞ্চয় করে ধীরে ধীরে পকেট থেকে পাইপ বার করে চকমকি পাথর ঠুকে তাতে আগুন ধরায়। তারপর আসে তার দ্বিতীয়বার অবাক হবার পালা। তার বৌ পাইপটা ছিনিয়ে নিয়ে তার সিংএর মত শক্ত হাতে গুঁজে দেয় শহরের মেশিনে তৈরী সিগারেট। আবার এই অবাক হওয়াটাও তার ক্ষণস্থায়ী। দেখা যায় কিছুক্ষণ পরেই সে সিগারেট টানছে আর গল্প গুজব করছে……।

সান্ধ্যভোজের পর সে তখনও সেই অদ্ভুত স্বাদের সিগারেট টানছে ; ঠিক সেই সময় এক খরিদ্দার এসে হাজির। তার গোচর্মের তৈরী গামবুট পরা চেহারা দেখে মনে হয় সে বোধ হয় দোকানদার বা নৌকার মালিক। তার পকেটের একটা কোন থেকে ভারি রূপার একটা তার উঁচু হয়ে বেরিয়ে আছে। নৌকার উপর সে টল্‌ছে, ঘুরপাক খাচ্ছে, আর এই বলে চেঁচাচ্ছে—যে সে একটা ভালো যৌন সঙ্গম পেতে চায়। লোকটার দাম্ভিক আচরণ আর কর্কশ কণ্ঠস্বর তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার নিজের গাঁয়ের মোড়ল আর স্থানীয় সবচেয়ে শক্তিশালী পুলিশ আমলাকে। তাই কাউকে কিছু না বলে সেই স্বামীটি দম বন্ধ করে পেছনের কেবিনে সকলের অলক্ষে মাথা নিচু করে চলে যায়। আর এখন সিগারেট না টেনে সেখানে বসে উদাসীন ভাবে গোধূলির আলোয় নদীটা দেখতে থাকে। অন্ধকার নদীর এই দৃশ্য বদলে দিয়েছে। নদীর তীরে এবং নদীর উপরের নৌকায় প্রদীপ জ্বলছে। তারপর তার চিন্তা ঘুরে ফিরে ঘরে ফেলে আসা মুরগী, শূয়োর ছানাকে কেন্দ্র করে চলতে বাধ্য—এরা যেন তার একমাত্র বন্ধু, তার

পরিবার। এখন সে তার স্ত্রীর খুব কাছে কিন্তু বাড়ী থেকে বহু দূরে। একাকীত্বের এক অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে তার।

সে কি বাড়ী ফিরে গিয়েছিল? না। তার গাঁ এখান থেকে ৩০লি দূরে। আবার পথে নেকড়ে, বন বিড়াল, বা রাতের পাহারাদের দেখা মিলতে পারে। সবচেয়ে ভালো কাজ হচ্ছে এদের এড়ানো। না সে ফিরে যেতে পারে না। নৌকার মাঝি অপেরা দেখার জন্য আর চার সাগরের চা পান করানোর জন্য তাকে আটকে দেবেই। কিন্তু এখানে যখন সে রয়েছেই তখন সে একবার উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত রাস্তা-ঘাট ও শহুরে লোকদের দেখবেই। অতএব তার বৌ যতক্ষণ না ফাঁকা হচ্ছে ততক্ষণ সে পেছনের কেবিনে বসে নদীর সৌন্দর্য দেখতে থাকে। তারপর সে নৌকার চাঁদোয়া টাঙ্গানোর কাঠামোঠা ধরে নৌকার ধারে ধারে সংকীর্ণ ঐ পথ বেয়ে নৌকার আগে এসে তীরে নেমে পড়ে। শহরের সব দেখার পর, ঐ একই রাস্তা ধরে ফিরে আসে নৌকায় এখনও পর্য্যন্ত কেবিনে শুয়ে যে লোকটা অহিফেন টানছে সেই খদ্দের যাতে বিরক্ত না হয় তার জন্য গলার স্বর অনেক নামিয়ে দেয় সে।

শোবার সময় হলে শহরের রক্ষীর ড্রামের বাজনা বেজে ওঠে এবং সেও জিলিয়াংগ পাহাড়ের ঢপ্ ঢপ্ শব্দ যেন শুনতে পায়। কেবিনের ফাটা জায়গায় উঁকি দিয়ে দেখে যে সে লোকটা এখনও শুয়ে আছে। স্বামীটা এ ব্যাপারে কোন আপত্তি তুলতেই পারে না। পেছনের কেবিনে নোতুন বিছানায় সে একাই শুয়ে পড়ে। মাঝরাতে যখন সে ঘুমাচ্ছে বা তার চিন্তাগুলোকে এলোপাথাড়ি ছেড়ে দিয়েছে তখন তার বৌ সময় করে তার ঘরে ঢুকে তাকে মিছরি দিতে আসে। তার মনে পড়ে তার স্বামীর কি সুন্দর দাঁত ছিল। তাই যদিও সে ঘুমাচ্ছে, যদিও তার রাতের খাওয়া সারা হয়েছে তাহলেও এক টুকরো মিছরি তার মুখে গুঁজে দেয় তার বৌ। তারপর নিজেই লজ্জিতভাবে সেখান থেকে চলে যায়। স্বামীর সেই মিছরি চোষা দেখে মনে হয় কেবল এই জন্যই বৌকে তার ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। ওদিকে সে খরিদ্দারের অপেক্ষায় জেগে রয়েছে; আর পেছনের কেবিনে তার স্বামী শান্তিতে ঘুমাচ্ছে।

হুয়াংগঝুয়াংগ-এ এধরণের স্বামী অনেক অনেক আছে। এ জায়গাটা অনেক স্বাস্থ্যবতী মেয়ে ও সৎ স্বামীর জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সেখানকার জমি অত্যন্ত খারাপ। আবার ফসল যা ফলে তার অর্ধেকের বেশী

ওদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যায় কর্তৃপক্ষ। তাই গাঁয়ের লোকেরা যতই পরিশ্রম করুক না কেন বছরের তিন মাস কেবল রাঙ্গালুর পাতা ও ভুষি ছাড়া তাদের খাবার বলতে কিছুই থাকে না। দিন চালানো দায়। যদিও তারা পাহাড়ে থাকে, আর মাত্র ২০ লি দূরে ঘাটে সেখানকার মেয়েরা এই ধরণের জীবনযাপন করে। এই ব্যবস্থার সকল সুবিধাই সব পুরুষই দেখতে পায়। নামেই কেবল তারা অমুকের বৌ, যে সন্তান সে ধারণ করে তাও স্বামীর ; এবং যে রোজগার সে করে তার একটা ভাগ নিশ্চিতভাবে পায় তার স্বামী।

নদীর তীর ধরে সব নৌকাই টেনে তুলে রাখা হয়েছে। সংখ্যায় তারা এত বেশী যে একজন নোতুন লোকের পক্ষে তা গোনা অসম্ভব। যে লোকটি প্রতিটি নৌকার নম্বর, তার ক্রমপর্যায়, এবং প্রতিটি নৌকা আর তার মাঝির চেহারা পর্যন্ত মনে করে রেখে দেয় সে হল পঞ্চম জেলার এক বৃদ্ধ এই নদীর পাহারাদার।

এই পাহারাদার-এর চোখ একটাই ছিল। যৌবনে এক গুণ্ডার—যাকে সে পরে খুন করেছিল—সাথে লড়াই করার সময় অপর চোখটা তার উপড়ে নেয় সেই লোকটা। কিন্তু মনে হয় সে দু চোখের অপেক্ষা এক চোখেই ভালো দেখতে পায়। ঐ নদীটার একমাত্র দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তার উপর। স্থল এলাকায় চীনের প্রেসিডেন্টের যা ক্ষমতা ছোট্ট নৌকাগুলির উপর তার সেই একই ক্ষমতা।

জলস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে পাহারাদারের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। যেমন কোন্ নৌকার পিতামাতা নদীর পারে যদি গিয়ে থাকে, তার শিশু দুধ খাবার জন্যে চীৎকার করছে কিনা।—এসব দেখাই তার কাজ। কোন ঝুটঝামেলা হচ্ছে কিনা—হলে তার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে কি না! এমন কোন নৌকা আছে কিনা যা ভেসে যাচ্ছে—অথচ তার দায়িত্বে কেউ নেই। আজকে এই ভদ্রলোককে এমন এক ঝামেলার তদন্ত করতে হবে যেটার সুরু নদীর তীরে, কিন্তু এখন নদীও যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। গত কয়েক-দিনে শহরে তিনটি ডাকাতি হয়ে গেছে। জনগনের জন্য নিরাপত্তা সংস্থার মতে যদিও শহরের প্রতিটা কোণ ও গর্ত ভালোভাবে খোঁজা হয়েছে তবে লুঠের মালের কোন হদিশ এখনও পর্যন্ত মেলে নি। একবার এই অনু-সন্ধানের কাজটা শহরের সম্মানিত অফিসারদের দ্বারা সংঘটিত হয এবং এখন সেই কাজের দায়িত্ব এসে পড়েছে এই নদীর পাহারাদারের উপর। তাকে মিথ্যাবাদী নিরাপত্তাবাহিনীর অফিসারেরা নির্দেশ পাঠিয়েছে যে

আজ মাঝরাতে সে এবং সশস্ত্র জল পুলিশ একত্রে মিলে সমস্ত নৌকায় খারাপ চরিত্রের লোকের অনুসন্ধান যেন চালায়।

এই খবরটা তার কাছে পৌঁছায় আজ সকালে। এই কাজের জন্য তাকে সারাটা দিন ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হয়। সর্বপ্রথম তার দায়িত্ব হচ্ছে সেই সব লোকেদের কাজ করে দেওয়া যারা তাকে প্রায়ই ভালো ভালো খাবার আর ভালো মদ খাওয়ায়। তারপর তার কাজ নৌকা থেকে নৌকায় গিয়ে তার বাসিন্দাদের সাথে কথা কওয়া। তাকে খুঁজে বের করতে হবে কোন নৌকায় সন্দেহজনক কোন অপরিচিত লোক আছে কি না।

জলের উপর একজন নদীর পাহারাদারের অসীম ক্ষমতা এবং জলে যা ঘটছে সবই তার নখদর্পনে। বহুদিন থেকেই মাঝিদের মধ্যে এই ব্যক্তিটার প্রভাব আছে এবং যেহেতু আইনের চোখে এই লোকটি খারাপ বলে চিহ্নিত, তাই কর্তৃপক্ষ রীতি অনুযায়ী নদীর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ কাযকরী করার জন্যে তাকে ব্যবহার করতো। এখন তার বয়স বেড়েছে—যুগ বদলাচ্ছে—অবশ্য যুগ বদলাচ্ছে তার সুবিধের মুখ চেয়ে। তার অবস্থা এখন ভাল, বিবাহিত এবং সকল সময় সে মদ্যপান করা পছন্দ করে। তার ছেলেমেয়ে রয়েছে, ক্রমশঃ সে একজন সৎ ও শান্তিপ্রিয় লোকে পরিণত হয়েছে। যদিও তার কাজ হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করা, তাহলেও মনে মনে তার দরদ থাকে এই সব মাঝি মাল্লাদের উপর। ব্যাপারটা এই হওয়ায় সে সকলের কাছে এক আদর্শ চরিত্র হিসেবে পরিগণিত হয় এবং জেলা শাসকের চেয়েও তার সম্মান কোন অংশেই খাটো নয়; লোকে তাকে ঘৃণা বা ভয় কোনটাই করে না। অনেক বেশ্যাদের কাছে সে তাদের ধর্মপিতাস্বরূপ। এই সামাজিক সম্পর্ক থাকার কারণেই সে সর্বদা মাঝিদের পক্ষ অবলম্বন করে থাকে।

এখন সে একটা কাঠের তক্তা পার হয়ে এসে হাজির হয় সদ্য রং করা 'ফুলের নৌকায়'। বড় বড় অট্টালিকার একটি অপেক্ষাকৃত শান্ত দোকানের পাদদেশে অবস্থিত এটি। সেই দোকানে জলপদ্মের বীজ বিক্রী হয়। সে জানে এ নৌকাটা কার। নৌকায় পা রেখে হাঁকে "সাত নম্বর"।

কোন উত্তর নেই। কোন যুবতী মেয়ের আবির্ভাব ঘটলো না। নৌকার মালিকানা যার সেও বেরিয়ে এল না। নদীর পাহারাদার একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। হয়ত কোন যুবক প্রকাশ্য দিবালোকে কেবিনের ভেতরে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত আছে এই মনে করে সে নৌকার কিনারায় দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে নজর রাখতে থাকে এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে।

পুনরায় সে হাঁক পাড়ে। এবার মাসি ও উদো-এর নাম ধরেই ডাকে। উদো এক বারো বছরের মেয়ে, রোগাটে তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর; বড়রা যখন শহরে যায় তখনও সাধারণতঃ তার উপর নৌকার সব দায়িত্ব দিয়ে যায়। সে রাঁধে, দোকান করে, এবং কোন কোন সময় মার খায়, কাঁদে এবং খুব তাড়াতাড়ি কান্না বন্ধ করে আবার গান গাইতে সুরু করে। যাহোক এবারও উদো-এর ও দেখা মিললো না। তার মনে হল কেবিনের মধ্যে কারুর শ্বাস টানার শব্দ যেন তিনি শুনলেন এবং ধরে নিলেন যে তারা সকলে ঘুমিয়েও নেই বা তারা নৌকাটাকে কখনই ফাঁকা রেখে যেতেই পারে না। তাই অন্ধকার কেবিনে উঁকি মেরে ডাকেন, "কে আছ?"

এখনও কোন উত্তর নেই।

বেশ রেগে এবার জোরে প্রশ্ন করেন; "কে ওখানে?"

তার কাছে অপরিচিত এক পুরুষের কণ্ঠস্বর তোৎলাতে তোৎলাতে বলে, "আমি, ওরা সব শহরে গেছে।"

"সববাই?"

"হ্যাঁ, তারা.........।"

হয়ত এই উত্তর পেয়ে প্রশ্নকর্তা ক্ষুব্ধ হতে পারে এবং তাকে তার উত্তর কিছুটা বদলাতে হতে পারে এই আশঙ্কায় সে কোন রকমে সেই অন্ধকার থেকে কষ্টেসৃষ্টে দাঁড়িয়ে বাইরে দরজায় এসে দাঁড়ায়। সে চাঁদোযার কাঠামোটা নিঃস্বন্দে ধরে বিব্রত ভাবে আগন্তুকের দিকে চেয়ে থাকে।

তার দৃষ্টি লোকটার পায়ের চকচকে শূয়োরের চামড়ার জুতো—যা এত চকচক্ করছে যে দেখে মনে হয় যেন সেটা খেজুর রস দিয়ে পালিশ করা হয়েছে—থেকে উপরে উঠতে উঠতে নরম পিংগলবর্ণের হরিণ চর্মের তামাকের থলে, তারপর বুকের উপর আড়াআড়ি রাখা দুটি বাহু এবং শেষে এক জোড়া পেশীবহুল লোমশ হাত পর্য্যন্ত একবার ঘুরে আসে; তার একটা আংগুলে বিশাল বড় একটি সোনার আংটি। সবশেষে সে দেখে নেয় তার চোকা চোয়াল বিশিষ্ট মুখ যা দেখে মনে হয় অসংখ্য কমলালেবুর খোসা জোড়া লাগিয়ে তৈরী হয়েছে এটি। লোকটি বুঝে নেয় এই বৃদ্ধের মধ্যে মাল আছে। তাই শহরের মানুষের অনুকরণ বলে, "মহাশয় ভেতরে এসে বসুন। ওঁরা এখনই ফিরে এলেন বলে।"

মাড় দেওয়া পোষাক আর উচ্চারণ শুনে পাহারাদার বুঝে ফেলে লোকটা কৃষক এবং সত্ত সত্ত গাঁ থেকে এসেছে। মেয়েটার দেখা পেলে সে

চলে যাবে এই মনে করে পাহারাদার এখানে এসেছিল, এখন কৌতূহল বশতঃ সে থেকেই যায়।

"কোত্থেকে আসছ?" পিতৃতুল্য স্বরে সে লোকটাকে প্রশ্ন করে। যাতে করে সে সহজ হতে পারে। "আমি ত তোমায় চিনি না।"

যুবকটা মনে হল চিন্তা করছে, আমিও তোমায় চিনি না। কিন্তু সে জবাব দেয়ঃ "গতকাল আমি এখানে এসেছি।"

"ক্ষেতে গমের শিষ্ বেরিয়েছে কি?"

"গম? হাঃ হাঃ আমাদের জলশক্তি চালিত যন্ত্রের চাকার সামনে কত গম? আমাদের শূয়ারগুলো হাঃ হাঃ হাঃ। তারা·········।"

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল যে সে তার প্রশ্নের জবাব দেয় নি এবং সে একজন সম্মাণীয় শহরবাসীর সঙ্গে কথা বলছে, যার সামনে, "আমাদের জল শক্তিচালিত যন্ত্রের চাকা," "শূযার" এই সব শব্দের উল্লেখ করা তার উচিত হয় নি, এই মনে করে সে ভেঙ্গে পড়ে একেবার চুপসে যায়।

ক্ষীণ হাসি হেসে সে নম্রভাবে পাহারাদারের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার ইচ্ছে পাহারাদার যেন তাকে সহানুভূতির সঙ্গে উপলব্ধি করে ক্ষমা করে দেয়—কেন না সে একজন সৎ লোক এবং অত তড়বড় করে কথা বলতে চায নি সে।

পাহারাদার এটা বেশ ভালো ভাবেই বুঝতে পারে। তাদের দুজনের মধ্যে যে স্বল্প কথাবার্তা বিনিময় হয়েছিল তা থেকেই এটুকু বুঝেছিল এ লোকটা নৌকার কোন বাসিন্দার নিকট আত্মীয় হতে পারে। "সাত নম্বর কোথায গেছে?" সে প্রশ্ন করে! "কখন ফিরবে?"

এবার যুবকটি খুব সাবধানে উত্তর দেয়। কিন্তু উত্তর সেই একই, "আমি গতকাল এসেছি····· ·· গতকাল বিকালে।" তারপর সে ব্যাখ্যা করে বলে যে তাকে নৌকায় উপর নজর রাখতে দিয়ে সাত নম্বর মাসি আর উদোকে সঙ্গে করে ধূপ জ্বেলে মন্দিরে পূজো দিতে গেছে। নিজের পদমর্য্যাদা পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্যে সে এর সঙ্গে যোগ করে দেয় যে সে সাত নম্বরের স্বামী।

যেহেতু সাত নম্বর পাহারাদারকে ডাকত তার "ধর্মবাপ" বলে তাই সে প্রথম সাক্ষাতেই তার "ধর্মপুত্র" ঠিক ঠিক আদ্‌বকায়দা তাঁকে প্রদর্শন করছে কিনা তার উপর জোর দিলেন না। কয়েকটি ছোট খাটো মন্তব্য করার পর ওরা দুজনে কেবিনের ভেতরে চলে গেল।

ওখানে একটা ছোট্ট বিছানা রয়েছে। তার উপরে পরিষ্কার ভাবে

ভাঁজ করে রাখা হয়েছে একটা সিল্কের লেপ ও একটা লাল রং এর ছাপা কাপড়। রীতি অনুযায়ী বিছানার ধারে বসে পড়ে আগন্তুক। কেবিনের দরজা দিয়ে আলো আসছে; তাই বাইরে থেকে এ জায়গাটা অন্ধকার মনে হলেও সব ঠিকই দেখা যাচ্ছে।

যুবকটি আগন্তুকের জন্য সিগারেট দেশলাই খুঁজে পেতে বার করে আনে। এ কাজ করতে গিয়ে সে থতমত খেয়ে একপাত্র শুকনো বাদাম ভাজা উল্টে ফেলে। গোল গোল চকচকে বাদামী রংএর বাদাম ছত্রাকার হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। যুবকটি সেগুলো মাটি থেকে তুলে তুলে পাত্রটিতে রেখে দেয়—এটা তার উপলব্ধিতেই এলো না যে এর থেকে কিছু বাদাম আগন্তুককে তার দেওয়া উচিত। আগন্তুক কিন্তু এ জায়গাটাকে নিজের ঘরের মত করে নিল। সে কিছু বাদাম তুলে নিয়ে তার খোলস ভেঙ্গে বাদামটা মুখে ফেলে দেয়; আবার সে এও মন্তব্য করে যে হাওয়াতে শুকানো বাদাম খেতে কত ভালো লাগে।

পাহারাদার দেখে যে তার অথিতি সেবক একটা বাদামও খায় নি। তাই সে মন্তব্য করে "বাদাম গুলো চমৎকার! তুমি বাদাম পছন্দ করো না?"

"খুব করি! আমার বাড়ীর পেছনেই ওগুলো হয়। গত বছর সারা গাছ জুড়ে এক পাহাড় বাদাম। আপনি নিশ্চয় হয়ত দেখে থাকবেন যে ভাবে বাদামগুলো তাদের কাঁটা ওয়ালা খোলস থেকে কেমন ভাবে বেরিয়ে আসে" এই বলে সে এমন ভাবে হাসতে থাকে যা দেখে মনে হয় সে বুঝি তার বাচ্চাদেরকে গল্প বলছে।

"আজকালকার দিনে এরকম আকারের বাদাম পাওয়া বেশ কঠিন।"

"আমি সবচেয়ে বড় বাদাম ফলিয়েছি।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ! কেন না সাত নম্বর বড় বাদাম বেশ পছন্দ করে, তাই ওর জন্যে—তা আমায় রাখতে হয়।"

"তোমাদের ওখানে বাঁদুড়ে বাদাম আছে না কি?"

"সেটা আবার কি?"

পাহারাদার যুবকটিকে একটা গল্প শোনায়। "পাহাড়ের খুব ওপরে একদল বাঁদর বাস করতো। যদি কেউ ওদের খুব গালি গালাজ করতো তাদেরকে ওরা তোমার হাতের মুঠার আকারের বাদাম ছুঁড়ে মারতো। অতএব যদি কারুর ঐ আকারের বাদাম খাবার বাসনা জাগতো তাহলে

তারা সেই পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে বাঁদরদের তেড়ে গালি গালাজ করতো। তারপর তারা বাদাম কুড়োবার জন্যে সেখানেই অপেক্ষা করে থাকতো।”

বাদামের গল্প এই লাজুক যুবকের জিভের আড়ষ্টতা ভেঙ্গে দিল। এই আগন্তুককে তার নিজের সমগোত্র ধরে নিয়ে গাঁ সম্বন্ধে সব ধরণের তথ্য সেচ্ছায় তাকে জানিয়ে দেয়। প্রথমেই সে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল ঐ জায়গাটার নাম “বাদাম-গর্ত” হলো কেন? তারপর বর্ণনা করলো বাদাম কাঠের তৈরী কাস্তের হাতল কত শক্ত আর কত সুবিধাজনক। সে তার বাড়ী সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য ভীষণ উৎসুক ছিল। কেন না গতকাল বিকেলে তার এখানে আসার পর থেকে সারারাত ধরে খরিদ্দারের যা ভীড় আবার তার সঙ্গে ধোঁয়া ও আর মদ্যপান এত চলে যে তাকে পেছনের কেবিনে কেবল মাত্র উদোকে সঙ্গী করে শুতে হয় আবার উদো ঘুমায় মরার মত। আজকের প্রথম জিনিস হলো তার বৌ এর সাথে কথা বলার সুযোগই ঘটে নি; কেন না সে বলে যে তাকে আজ সাত লি পুলে গিয়ে ধূপ জ্বেলে দিয়ে আসতেই হবে; আর তাই বৌ তার স্বামীকে একা এই নৌকার দায়িত্ব দিযে চলে গেছে। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে বৌ কিন্তু এখনও ফেরে নি। যদিও সে নৌকার পেছনে গিয়ে নদীতে তাকিয়ে দেখেছে এবং যদিও নদীর উপর সব কিছুই তার কাছে অভিনব তা সত্বেও তার বড় একঘেঁয়ে লাগছে। অবশ্য কেবিনে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার মনে হয়েছিল যে তার গাঁয়ের কাছের নদীটা যদি এই নদীর মত ফুলে ফেপে উঠতো তাহলে ঝাকে ঝাঁকে পোনামাছ এসে তার বেড়া দিয়ে রাখা যাযগায় এসে ঢুকে পড়তো। একবার পোনামাছ ধরা পড়লে সেটাকে সূর্য্যের আলোয় শুকিয়ে উইলো গাছের ডালে তার কানকে ধরে ঝুলিয়ে সে রেখে দিত। যখন সে তার ধরা পড়া পোনামাছের আকারের কথা চিন্তা করেছিল। ঠিক সেই সময় এই আগন্তুকের অকস্মাৎ আবির্ভাব ঘটে এবং তার মনে হল সব মাছই আবার নদীতে ডুবে গেল।

এই ধরণের আলোচনায় আগন্তুকের বিরাগ আছে তা কিন্তু তাকে দেখে মনে হলো না। অতএব যে সব কথাবার্তা তার বৌকে বলার পরিকল্পনা সে করেছিল এখন সেই সব কথা এখানে বলার সুবর্ণ সুযোগ মিলে গেল যুবকটির।

গাঁয়ে, কি সব ব্যাপার স্যাপার ঘটছে তা সবই সে বলে দেয় পাহারা-

দারটিকে এবং তার সদ্যজাত শূকরছানা কতটা পাজি হয়েছে তাও তাকে বলে। কারখানা সারানোর বর্ণনা দিতে গিয়ে সে রাজমিস্ত্রীদের নিয়ে খানিক ঠাট্টা করে। তারপর সে ছোট কাস্তে নিয়ে কিছু কথা বলে। এই কাস্তে সম্বন্ধে পাহারাদারের কোন ধারণাই ছিল না।

"এখন বলুন ত ব্যাপারটা আশ্চর্য কি আশ্চর্যের নয়?" শপথ করে বলছি যে সেটার জন্যে আমি বাড়ী তন্ন তন্ন করে খুঁজি—বিছানার নিচে, জানালার নীচের তাকে, গোলাবাড়ীতে—সর্বত্র। কিন্তু কোথাও কাস্তের চিহ্ন মাত্র নেই। কাস্তেটা একেবারে উবে গেছে। আমি সাত নম্বরের ঘাড়ে দোষটা চাপালাম—সে ত কেঁদেই অস্থির। কিন্তু তা সত্বেও কাস্তের খোঁজ পেলাম না এবং সব সময় আমলো যা—।—এটা লুকিয়ে ছিল কড়িকাঠ থেকে ঝুলানো চাল রাখার বেতের বাক্সে। ঐখানে সে ঝলছে ৬ মাস। চাল খাচ্ছে। ঐ হতভাগা কাস্তেটার সারা দেহে মরচে পড়ে গেছে। আমি যা বলছি তা বুঝতে পারছেন ত? এতদিন ধরে কাস্তেটা ওখানে ছিল কেমন করে? ওটা সব সময় ঝুলত জানালায়, তারপর সব কথা আমার মনে পড়ে গেল। একবার ঐ কাস্তেটার খাঁজকাটা সুচালো প্রান্তে আমার হাত কেটে গিয়ে একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড। এবং রাগে ওটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দি। তারপর একদিন আবার সেটা নদীতে গিয়ে ভাল করে শান দি।—কাস্তেটা খুব খারাপ না। এখনও কাস্তেটা ভালো কাজ দেয়। যদি অসাবধান হওনা একটু—একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড। ব্যাপারটা এখনও সাত নম্বরকে বলিনি। সেদিনের কাঁদাকাটা সে নিশ্চয এখনও ভুলতে পারেনি। এতক্ষণে সেটা পাওয়া গেল। মুখ টিপে হেসে সে বলে, শেষ পর্যন্ত কাস্তেটা পাওয়া গেল।

নির্লিপ্তভাবে পাহারাদার উত্তর দেয়, "তার সব ভালো যার শেষ ভালো।"

"ঠিক বলেছেন! ওটা ফিরে পেয়ে আমি খুশী। কেন না আমি সন্দেহ করেছিলাম হয়ত সাত নম্বর ওটা নদীতে ফেলে দিয়ে আমায় তা বলার দরকার মনে করে নি। এখন বুঝছি সে আমায় মিছে কথা বলেনি। আমি ওর সাথে ভালো ব্যবহার করি নি। আমি শপথ করে তাকে বলি যে যদি কাস্তেটা খুঁজে না পাও তো তোমায় মারবো। আমি অবশ্য ওর গায়ে হাত তুলিনি কখনও—বুঝে দেখুন! কিন্তু বৌ এত ভয় পেয়ে যায় যে অর্ধেক রাতটাই সে কেঁদে ভাসিয়ে দিল।"

"কাস্তেটা তোমরা ধান কাটতে ব্যবহার করো বুঝি?"

"ওহো! ওটা অনেক কাজেই ব্যবহার করা যায়। ফসল কাটতে?—না। ছোট্ট একটা কাস্তে সঙ্গে থাকার সুবিধে কত! আমি কাস্তে দিয়ে রাঙ্গা আলুর খোসা ছাড়াই বা কাঠ কেটে বাঁশী বানাই। এটা ছোট্ট এবং হাতুড়ি পিটে পিটে এমনভাবে তৈরী যে তার দাম হবে ৩০০ নগদে। আমরা সবাই ওটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরি—বুঝলেন না?"

পাহারাদার জবাব দেন, "বুঝলাম। প্রত্যেক লোকের একটা করে কাস্তে থাকা প্রয়োজন।"

আগন্তুক সত্য সত্যই উপলব্ধি করছে এটা মনে করে যুবকটা বহু বিষয়ের উপরই অনেক কথাই বলে। সে যে আগামী বছর একটি সন্তানের আশা করে এমন কি এ কথাটাও বলে ফেলে—যেটা তার আলোচনা করার কথা কেবল স্ত্রীর সঙ্গে যখন তারা রাতে এক বালিশে শোবে। তবে কথাগুলি সে খুব অমার্জিতভাবে তাকে বলেনি। শেষে যখন পাহারাদার চলে যেতে উদ্যত সেই সময় তার মনে পড়ে ভদ্রলোকের নামটা তার জিজ্ঞেস করা হয় নি।

"মহাশয়, আপনার নাম কি? একটা নামের কার্ড যদি রেখে যেতেন ত তাদের বলতাম……।"

"দরকার নেই। কেবল বলবেন এই রকম জুতো পরা এক লম্বা লোক নৌকায় এসেছিল। তাকে বলো সে আজ যেন কোন খরিদ্দার না নেয়, আমি ব্যবসা নিয়ে নিজে আসবো।"

"কোন খরিদ্দার নয়। আর আপনি আসছেন—এই ত?"

"ঠিক্! নিশ্চয়ই আমি আসছি। আমরা যেহেতু পরস্পরের বন্ধু তাই আমার সঙ্গে এক সাথে খাবার নেমন্তন্ন করলাম।"

"বন্ধু? হ্যাঁ বন্ধুই ত!"

পাহারাদার যুবকটির কাঁধে চাপড় মেরে লাফ দিয়ে নেমে অন্য এক নৌকায় চলে গেল।

সে চলে যাবার পর যুবকটি আন্দাজ করার চেষ্টা করে লোকটা কে! এই প্রথম সে এমন এক ব্যক্তিত্বের সাথে কথা বলার সুযোগ পেল যিনি তার মনে এক চমৎকার ও অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে দিয়েছেন। ভদ্রলোক তার সঙ্গে কেবল কথাই বলেনি আবার তাকে তাঁর বন্ধু বলে সম্বোধন করেছে এবং তার সঙ্গে এক সাথে ভোজ খাবার নেমন্তন্ন করে গেছে। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই সাত. নম্বরের সবচেয়ে ভালো খরিদ্দারদের মধ্যে একজন। নিশ্চয়ই তাকে সে প্রচুর টাকা দেয়। আনন্দে হঠাৎ তার

গান গাইতে ইচ্ছে করে। আস্তে আস্তে সে একটা লোকসংগীত গাইতে শুরু করে।

মেছোঘেড়ির পোনা মাছে ভরে
নদীর জল যখন বাড়ে।
বড় পোনা ছোট পোনা
সব সাইজই বাড়ে।

সে অপেক্ষা করছেই ত করছেই। কিন্তু সাত নম্বর এখনও ফিরলো না। কেউই ফিরে এল না। লম্বা লোকটার সামাজিক মূল্য এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে তার কথা বলার কায়দার কথা ভাবতে থাকে যুবকটি। তার পালিশ করা বুট জুতোর কথা সে ভাবে—যেন সবচেয়ে ভালো বনের খেজুর রসে জুতোটা পালিশ করা হয়েছে। তার মনে পড়ে লোকটার আঙ্গুলের বিশাল আংটির কথা। ঈশ্বর জানেন তার দাম কত? তার মনে পড়ে ভদ্রলোকের মাথা নাড়া ও কথা বলার কায়দা; যেন রাজ্যপাল কথা বলছে—তাহলে এই লোকটাই সাত নম্বরের সম্পদের দেবতা।

দুপুর নাগাদ অন্যান্য নৌকার লোকজনেরা তাদের রান্নাবান্না সুরু করে দেয়, সব জায়গা থেকেই ভিজে কাঠের ধোয়া উঠে নদীর ওপারে পাতলা সিল্কের মত উড়ে চলে যায়। এই ধোয়ায় সকলের চোখেই জল আসে। নদী তীরে খাবারের দোকানে রাধুনিদের কাঠি দিয়ে গামলা বাজানোর শব্দ-শোনা যাচ্ছে; নিকটবর্তী কোন নৌকায় বুঝি এখন বাঁধাকপি ভাজা হচ্ছে। এখনও সাত নম্বর ফিরলো না। কিন্তু তার স্বামী তো ভিজে জ্বালানী কাঠ ধরাতে জানে না, অতএব উনুন থাকে ঠাণ্ডা ও নির্বাক। শেষ পর্যন্ত সে আগুন জ্বালার প্রচেষ্টাই ছেড়ে দিল।

দুপুরের আহার না পেয়ে ক্ষুধার্ত পেটে ছোট্ট টুলে বসে সে ড্রাম বাজাতে বাজাতে অনেক কথাই ভাবে। তাঁর মগজে একটা বদ্ চিন্তা বাসা বাঁধে। সেই লোকটার অনেক টাকা থাকার ফলে গর্বিত ভাবে ফুলে থাকা থলেটার মানসিক চিত্র তার মনের শান্তি কেড়ে নেয়। সেই চৌকা চোয়াল বিশিষ্ট মুখটা এখন তার কাছে বিরক্তি কর বলে মনে হয়। এই মুখটা এখন তার কাছে মনে হয় চোলাইকারকদের রক্ত ও দানা দিয়ে তৈরী। স্মৃতি পাগল করে দেয় তাকে। ধরা যাক সেই নির্দেশের কথা—যা সে দিয়েছিল সাত নম্বরের স্বামীকে। "তাকে বলো যে আজ বিকেলে সে যেন কোন খরিদ্দার না ধরে, আমি আসবোই।"

চুলোয় যাক্। অসহ্য এই বাচাল মুখটার ক্রুরতা। ও কথা সে বললে কেন ? কি কারণ থাকতে পারে ?.........

রাগের সাথে এই সব অনুমান যুক্ত হয়ে ওটাকে সে বাড়িয়ে তোলে এবং ক্ষুধার্ত থাকায় সেটা আরও বেড়ে যায়। এবং এই সরল যুবকের আহত অনুভূতি তার আদিম আবেগকে বিপদাপন্ন করে তোলে।

এখন তার গান গাইতে মন লাগে না। ঈর্ষায় তার গলা বুজে আসে। তার মনে আর কোন সুখ নেই। পরদিন বাড়ী গিয়ে আবার ক্ষেতে ফিরে যেতে মনস্থির করে ফেলে যুবকটি।

খারাপ মেজাজ নিয়ে পুনরায় সে উনুনে আগুন ধরাবার চেষ্টা করে যদিও তাতে সফলতা অর্জন করতে সে ব্যর্থ হয়। তাইতে সে ক্ষেপে গিয়ে সব জ্বালানী কাঠ জলে ভাসিয়ে দেয়।

"জাহান্নামে যাক্। যা সব সমুদ্রে চলে যা।"

কিন্তু কাঠ সব কয়েক গজ মাত্র ভেসে গেছে এমন সময় অন্য এক নৌকার লোক তা তুলে নেয়, সে এই ধরণের ভেসে যাওয়া কাঠের অপেক্ষায় ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে সে ঐ কাঠ পুরানো এক টুকরো দড়ির সাহায্যে ধরিয়ে ফেলে। সেই কাঠ ফটফট শব্দে ফেটে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিটতে থাকে এবং মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত নৌকাটায় ধোযায় ধোঁয়ায় একাকার হযে যায়। এই দৃশ্য দেখে যুবকটার লজ্জাও হলো আবার দুঃখও পেলো। সে মনস্থির করে ফেলে যে তার বৌ ফিরে আসার আগেই সে এখান থেকে চলে যাবে।

বড় রাস্তার শেষে ওর বৌ ও উদোএর সাথে দেখা হযে যায় যুবকের। তারা পরস্পর হাত ধরে, হাসতে হাসতে কথা কইতে কইতে আসছে। উদো-এর হাতে একটা বেহালা, দেখে মনে হয় সেটা একেবারে আনকোরা নোতুন, এরকম চমৎকার বেহালা, সে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না।

"কোথায় যাচ্ছ ?"

"বাড়ী।"

"আমি তোমায় নৌকাটায় নজর রাখতে বলে এলাম—পালাচ্ছ কি রকম ? কে আবার তোমায় চটালো ? মনটা তোমার এত ছোট কেন ?"

"আমি চলে যাচ্ছি , আমায় যেতে দাও।"

"চলো, নৌকায় ফিরে চলো।"

বৌকে দেখে মনে হল সে বেশ গোঁয়ার। এবং যখন যুবকটি দেখতে

পাচ্ছে যে তার জন্যে বেহালা কিনে এনেছে তার বৌ, তখন সে আর বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে জেদ করলো না। তার কপালের জ্বলন্ত ব্রণ দুটো আঙুল দিয়ে ঘস্‌তে ঘস্‌তে বিড়বিড় করে, "ঠিক আছে তাহলে" এই কথা বলে তার পেছু পেছু নৌকায় ফিরে এলো।

হাঁফাতে হাঁফাতে মাসি এসে হাজির, মুখ চোখ তার লাল, হাতে শূয়োরের ফুসফুস, তাকে ধরে কেউ পাচার করে দিতে পারে এই আশংকায় চোরের মত এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। নৌকায় সে চড়তেই কেবিনের ভেতর থেকে সাত নম্বর চেঁচিয়ে তাকে বলেঃ "মা একবার চিন্তা করুন! আমার মরদ বাড়ী চলে যাবার কথা বলছে।"

"কি ব্যাপার? একটা অপেরা পর্য্যন্ত না দেখেই চলে যাবে কি রকম?"

"রাস্তায় ওর সঙ্গে আমাদের দেখা—ওতো বেশ উত্তেজিত। হয়ত আমাদের ফিরতে দেরী দেখে অস্থির হয়ে পড়েছিল তাই।"

"ঠিক! তার দেরী হওয়ার জন্য ও আমায় বা ভগবান বুদ্ধকে দোষী করতে পারে। কসাইটাকেও দোষী করো। এতক্ষণ ধরে তার সঙ্গে আমার তর্কাতর্কি করা উচিত হয় নি। আবার কসাই এরও উচিত হয় নি এই সব শূয়োরের ফুসফুসে অত জল পাম্প করে দেওয়া।"

"না! একমাত্র দোষ আমার!" কেবিনে বসে সাত নম্বর বলে। তার স্বামী যেহেতু তার বিপরীত দিকে বসে, তাই সে অন্তর্বাস খুলে ফেলে যাতে করে সে তার পাতলা বডিসে সূঁচের কাজ করা খাসি পাতিহাসের ছবি দেখতে পায়; সাত নম্বর গতমাসেই মাত্র এটা বানিয়েছে।

নীরবে স্বামী তার বৌকে দেখে। শরীরে অল্প উত্তেজনা তার অনুভূত হয়। নৌকায় পেছনে বসে উদো আর মাসি গল্প করছে।

"আমাদের জ্বালানী কাঠ সব নিল কে?"

"চালটা কে ধুয়ে রাখলো?"

"ও নিশ্চয় উনুন ধরানোর আগুন পায় নি।·········ওত গাঁ থেকে এসেছে। সেখানে ওরা পাইনের ডালে আগুন জ্বালে।"

"গতকালই ত আমরা নোতুন একটা জ্বালানী কাঠের বাণ্ডিল খুললাম তাই না?"

"কিছুই তার পড়ে নেই।"

"যাও আরেকটা বাণ্ডিল নিয়ে এস, কাউকে কিছু বলো না।"

উদো খিলখিল করে হেসে ওঠে। "ও যা পারে তাহলো কেবল চাল ধোয়া।"

শান্তভাবে কেবিনে বসে নীরবে যুবকটি এই সব কথা শোনে। নোতুন বেহালায় তার চোখ নিবন্ধ।

তার বৌ তাকে বলে, "বেহালার তারে সুর বাঁধা আছে। বাজাও না।"

প্রথমে সে কোন কথা বললো না ; তারপর বেহালাটা তার হাঁটুর উপর রেখে তারের উপর পাইনের রজন টেনে পরীক্ষা করে নিল। তারপর তারটা ধরে টান দিতেই তার আঙুল থেকে অদ্ভুত এক শব্দ বেরোয়। মুখে এক মিষ্টি হাসি খেলে যায় তার।

কেবিনটা দ্রুত ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে ওঠে। তার বৌ-এর অনুরোধে কেবিনের বাইরে নৌকার কিনারে দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাতে থাকে যুবক স্বামীটি।

দুপুরের আহারের সময় উদো বলে, "দাদা, 'তুমি যদি চীনের প্রাচীরে বিধবা মেংগ জিয়াংগ কাঁদে' গানটা বাজাতে পারো তো আমি ওটা গেযে দেবো।"

"আমি ওটা জানি না।"

"আমাকে বোকা বানাবার চেস্টা করো না।"

"শুনেছি তুমি বেশ ভালো বাজাও।"

"আমি তোমায় বোকা বানাচ্ছি না। খালি বলছি যে আমি 'মা মেযেকে বিদায় দিল' গানটা বাজাতে পারি।"

মাসি বলে, "সাত নম্বর বলেছে যে তুমি ভালো বেহালা বাজিযে। তাই যখন মন্দিরের মেলায় বেহ'লাটা দেখি তখনই তোমার কথা মনে পড়ে যায় এবং তোমার জন্য ওটা কেনার কথা ভাবি। কপাল ভালো যে ওটা আমরা খুব সস্তায় পেয়ে গেছি। তোমাদের গাঁযে এক ডলার দিয়েও ঐ রকম বেহালা কিন্তে পারবে না। তাই কি না ?"

"ঠিক! কত দাম নিল ?"

"১০৬ 'নগদে।' ভাল দর না—সবাই বলছে।"

উদো মুখ টিপে হেসে বলে : "কে বলেছে ?"

মাসি রেগে গিয়ে বলে, "কে বললে না—ছুঁড়ি! তুই কি জানিস ? তোর কথা বলার দরকার নেই।"

তার অসমীচীন কাজের জন্য ভয়ে জিভ কাটে উদো।

আসলে এই বেহালাটা তারা বিনা পয়সায় পেয়েছে। এক বন্ধু তাদের দিয়েছে। উদো সেই কারণে অযথা নিজের নাক গলানোর জন্য বকুনি

খেল। সাত নম্বর হাসে। বৃদ্ধার কৌশলহীনতার জন্যই ব্যাপারটা ঘটেছে ধরে নিয়ে তার স্বামীও খানিকটা হেসে নেয়।

কোন রকমে খাবার গলাধঃকরণ করে সে নোতুন বেহালা বাজাতে সুরু করে। এটার আওয়াজটা পরিষ্কার ও মিষ্টি। খুসীর আমেজে উদো খাবার পাত্র ও কাঠি ফেলে রেখে গাইতে লেগে পড়ে বেহালার সুরে। মাসী খাবার কাঠি দুটো দিয়ে তার মাথায় আঘাত করায় তার ভাত গলধঃ-করণ করে সে বাটি ও প্যান ধুয়ে রেখে দেয়।

সেদিন বিকালে সামনের কেবিনে চাঁদোয়া টাঙ্গানো হয়। সে বেহালা বাজাচ্ছে আর উদো ও সাত নম্বর গান গাইছে। লাল কাগজে মোড়া কেরোসিনের বাতি থেকে ঠিক উৎসবের বা বিবাহের সময়ের মত গোলাপি আলোয় কেবিনটা উদ্ভাসিত। স্বামীটির উৎসাহ বেড়ে যায়—বেহালাটা এত সুন্দর। কিন্তু অনেকক্ষণ আগে থেকেই দুজন সেনা তীর থেকে ভীষণ মাতাল অবস্থায় এই গান শুনছিল।

সেই মাতাল দুটি এখন হোঁচট খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত নৌকার পাশটিতে এসে দাঁড়ায়। নৌকার পাশের সরু কিনারা দুটো কর্দমাক্ত হাতে ধরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, "ওখানে কে গাইছে বাবা! তোমার নামটা একবার দেবে? একটা ভালো গানের জন্য তোমায় ৫০০ দেবো—নগদে। শুনতে পাচ্ছ? আমরা তোমায় ৫০০ দেবো নগদে।"

সঙ্গে সঙ্গে বেহালা বন্ধ হয়ে গেল। সকলে একেবারে চুপ।

ধপ্ ধপ্। মাতাল দুটো নৌকায় লাথি মারে এবং চাঁদোয়াটা খুলে নিতে চেষ্টা করে—কিন্তু পারে না। কেননা দড়ি দিয়ে ওটা কোথায় বাঁধা আছে তার হদিশ পায় না। ওদের মধ্যে একজন গর্জন করে ওঠে। "কুত্তিরা তোদের টাকা চাই না? হাবা কালা বনে গেলে নাকি বাবা? কে এখানে গোলমাল পাকাবার সাহস রাখে? আমি ভয় পাই না—সম্রাটকেও না। আমি যদি ভয় পাই ত আমায় পেঁদিয়ে মেরে ফেলো। আমাদের উচ্চপদস্থ অফিসারেরা হচ্ছে পচা, দুর্গন্ধময় কচ্ছপের ডিম—সব্বাই—আমি তাকেও ভয় করি না।"

কর্কশ গলায় আর এক মাতাল চেঁচায়, "বেরিয়ে আয় বেশ্যারা। আমাদের মত ভদ্র লোকেদের নৌকায় উঠতে সাহায্য কর না বাবা!"

পাথর দিয়ে তারা নৌকায় জোরে জোরে আঘাত করে, এবং অশ্লীল কথার এমন বান ডেকে দেয় যে নৌকার লোকজনেরা ত ক্ষেপে লাল, মাসি দ্রুত আলো নিভিয়ে বাইরে গেল চাঁদোয়াটা খুলে আনতে।

সেনাদের চীৎকার শুনে সাত নম্বরের স্বামী বেহালাটা বগলদাবা করে চুপটি করে পেছনের কেবিনে চলে গেল। আর সামনের কামরায় নোংরা কথা বলতে বলতে এসে হাজির হল মাতাল দুটো। তারা প্রথম জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো সাত নম্বরকে। তারপর মাসিকে ও সবশেষে উদো কে।

অভদ্রভাষী সেই মাতালটা প্রশ্ন করে, "এখানে বেহালা বাজাচ্ছিল কে? বেহালা বাজিয়ে কে এখানে নিয়ে আয়-আর আমাদের আরেকটা গান গেয়ে শোনা।"

মাসীও এত ভয় পেয়েছে যে তার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছেনা, এবং কি করতে হবে তা সাত নম্বর ও কিন্তু জানে না। মাতাল দুটো আবার তাদের গালি গালাজ করে। "দুর্গন্ধ ওয়ালা কুত্তির দল, ঐ অসতীর স্বামীটাকে এখানে হাজির করে তাকে বেহালা বাজাতে বল্। আমরা ওকে হাজার দেবো। এর থেকে আর ভালো দাম কি হতে পারে? ঐ হাজারই দেবো তোরা যদি নড়াচড়া না করিস্ ত নৌকাটা জ্বালিয়ে দেবো। শুনছিস্ বুড়ি ডাইনী জলদি কর্। আমার মেজাজ যদি একবার চটে যায় তাহলে তোদেরই কষ্ট পেতে হবে।"

"আমরা কয়েকজন মিলে একটু আমোদ আহ্লাদ করছিলাম—আর কি! মহাশয়। আর কেউ নেই এখানে ……।"

"বেরিয়ে আয়, কুৎসিত বুড়ী! দুর্গন্ধ যুক্ত রোগা বুড়ো গাই। বেহালা বাজিয়েকে বার করে নিয়ে আয় এখানে। বেজন্মা! আমি গান গাইব।" সে কোন মতে তার নিজের পায়ের উপর ভর রেখে দাঁড়ায়; তার মানে সে এখন বেহালা বাজিয়ের খোঁজে পেছনের কেবিনে যাবে। মাসী ভীষণ ভয় পেয়েছে; ভয়ে তার মুখটা হাঁ হয়ে রয়েছে। সাত নম্বর মরীয়া হয়ে মাতালের হাতটা ধরে নিজের বুকের উপর মেলে দেয়। ইংগিতটা বুঝে নিয়ে সে আবার বসে পড়ে। "ঠিক আছে। চমৎকার! এসব আমার চলবে। আজ রাতে আমি এখানে শোব…।" কোন অপেরার একটা গানের ডুকলি গেয়ে ওঠে নিজেই।

সে ধপ করে সাত নম্বরের বাঁ পাশে বসে পড়লো আর তার অন্তরঙ্গ বন্ধুটি বসে তার ডান দিকে।

যখন মনে হল যে সামনের কেবিনের ব্যাপারটা মোটামুটি শান্ত হয়েছে তখন সাত নম্বরের স্বামী পরের দরজা থেকে আস্তে আস্তে মাসীকে ডাকে। মাসি চুপিসারে পা টিপে টিপে পেছনের কেবিনে যায়—তার মন্দে তখনও সেনাদের গালাগাল অনুরণিত হচ্ছে।

বিভ্রান্ত হয়ে স্বামিটা প্রশ্ন করে "ব্যাপার কি ?"

"ওরা মানে অফিসারেরা নিরীহ জীব—মানে যখন তারা মদখায়—ওরা বেশীক্ষণ থাকবে না।"

"ওদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া ভালো। একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, কথাটা হচ্ছে আজ এক বিশাল চৌকো চোয়ালওয়ালা লোক এসেছিল এখানে। বড় কোন অফিসারের মত তাঁকে দেখতে। সে বলে গেছে যে আজ যেন তোমরা কোন খরিদ্দার না নাও—কেন না আজ উনি আসবেন—বিকেলে।"

"তার পায়ে কি চামড়ার বুট জুতো ছিল এবং গলার স্বর কি তার গুরু গম্ভীর ?"

"ঠিক বলেছেন। আবার আঙ্গুলে তার বিশাল বড় এক সোনার আংটি।"

"ও হচ্ছে সাত নম্বরের ধর্মবাবা। তাহলে সে আজ সকালে এসেছিল-তাই না ?"

"তিনি অনেকক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে গল্পগুজব করলেন এবং কিছু বাদামও খেয়েছেন।"

"তিনি কি বললেন ?"

"বললেন যে তিনি নিশ্চিতই আসছেন। এবং তোমরা যেন কোন খরিদ্দার না নেও।...এবং তিনি আমায় তার সঙ্গে ভোজ খাওয়ার নেমন্তন্ন করবেন বলে শপথ করে গেলেন।

মাসী ভাবতে থাকে নদীর পাহারাদার এখানে আসছে কেন? নিশ্চয়ই সে এখানে রাত কাটাতে চায় না। আমরা ত সমবয়সী! এমন কি হতে পারে যে এই মেয়েটার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছে!...সে কিন্তু মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না। যদিও একজন অভিজ্ঞ মেয়ে সংগ্রাহক হিসেবে সে সব ধরণের কলংকজনক গালগল্পে এত অভ্যস্তা হয়ে গেছে যে কোন কিছুতেই তার মুখ লজ্জায় আর লাল হয় না। কিন্তু তাকেও ঐ সব নোংরা নামে সেনারা সম্বোধন করায় তার সম্মানে ঘা লাগে। সে পা টিপে টিপে সামনের কেবিনে ঢুকে নোংরা দৃশ্য দেখে ঠোঁট উল্টে বলে, "শূয়ার।" এই কথা বলে পেছনের কেবিনে আবার ফিরে যায়।

"কি হল ?"

"কিছু না।"

"ওরা চলে গেছে ?"

"ওরা ঘুমাচ্ছে।"

"ঘুমাচ্ছে ?"

মাসি যদিও যুবকটির মুখ পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাচ্ছে না তাহলেও তার কণ্ঠস্বরে তার অনুভূতি বেশ ভালো ভাবেই বোঝা যায়। সে বলে, "ভাই তুমি ত শহরে খুব কমই আসো! চলো না নদীর ধারে নেমে খানিক স্ফুর্তি করি! আমি তোমায় অপেরা দেখার নিমন্ত্রণ করছি। আজ রাতে তাদের যে অপেরা হবে তার নাম, "কিউ হু তার স্ত্রীর উপর তিনটা কৌশল প্রয়োগ করে।"

সে মাথা নাড়ে বটে তবে কিছুই বলে না।

আরও কিছু ছ্যাবলামির পর সেনা দুটো চলে গেলে সামনের কেবিনে আলোর নিচে সাত নম্বর, উদৌ, ও মাসি বসে মাতালদের কাণ্ডকারখানা নিয়ে নিজেদের মধ্যে একটু হাসি ঠাট্টা করতে থাকে। পেছনের কেবিনে তখন কিন্তু সাত নম্বরের স্বামী রয়েছে। মাসি কয়েকবারই তাকে ডাকতে গেছে. কিন্তু মাসির কাছে অজ্ঞাত কোন কারনে সে মাসির কথাকে পাত্তাই দিল না। তাই সে ওখান থেকে ফিরে এসে ব্যাঙ্কের নোট পরীক্ষা করতে লেগে যায়। কেন না সে বলতে পারতো কোনটা আসল নোট, কোনটা নকল। এই চারটে নোট কিন্তু আসল নোট। সে সাত নম্বরকে নোটের ক্রমিক সংখ্যা ও তার নক্সাটা দেখায়। তারপর নোটের গন্ধ শুঁকে বলে দেয় যে নোটটা কোন মুসলমানদের সরাই খানা থেকে এসেছে। নোট থেকে গোরুর গায়ের বোঁটকা গন্ধ বেরুচ্ছে।

উদৌ দ্বিতীয়বার যুবকটির ঘরে গেল এই কথা বলতে, "দাদা ওরা চলে গেছে। চলো গান বাজনা শেষ করে দি। তারপর ....।"

সাত নম্বর উদৌকে টেনে সরিয়ে দেয়। যেন সে তার মনে অন্য কিছু একটা ভাঁজছে।

সবকিছু ভীষণ ভাবেই চুপচাপ। পেছনের কেবিনে বসে সাত নম্বরের স্বামী বেহালার তার ধরে আস্তে আস্তে টানছে। তারপর সে সেটা রেখে দেয়।

তীর থেকে ভেসে আসা ঘন্টার শব্দ ওরা সবাই শোনে, কোন কোন দোকানদারদের আজ বিয়ের ব্যাপার রয়েছে। এবং তাই অতিথিরা এসেছেন তাদের অভিনন্দন জানাতে। আজ রাতে সেখানেও অপেরা হবে একটা। সারারাত ধরে কি মজাই না হবে।

সাত নম্বর এখন ধীর পদক্ষেপে পেছনের কেবিনে যায়, কিন্তু সেখান

থেকে সে দ্রুত ফিরে আসে। নিশ্চিতভাবেই তার মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হল।

মাসি জিজ্ঞেস করে, "কি ব্যাপার ?"

সাত নম্বর মাথা নেড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে : "ও এত মাথামোটা না। ঠিক আছে ও মাথা মোটাই থাকুক।"

নদীর পাহারাদার এখনই আসছে না এই চিন্তা করে তারা. মাসি, সাত নম্বর এবং উদো-সকলে সামনের কেবিনে ঢুকলো ; লোকটা কিন্তু পেছনের কেবিনে।

নদীর পাহারাদারের নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধানকারীর দল মাঝরাতে এল। নদীটা এখন ভীষণ শান্ত ; সম্পূর্ণ সশস্ত্র চারজন পুলিশ নৌকার পাশে পাহারা দিতে দাঁড়ায়। আর নদীর পাহারাদার এবং অনুসন্ধান-কারী দলের নেতা টর্চ জ্বেলে সামনের কেবিনে প্রবেশ করে। এই সময়ের মধ্যেই মাসি কিন্তু কেবিনে আলো সাজিয়ে রেখেছে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে মাসির জানা আছে যে এ ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর না। সাত নম্বর বিছানায় বসে রয়েছে কাঁধে তার জ্যাকেট ঝুলছে। সে এদের দুজনকে সম্ভাষণ জানিয়ে উদোকে কাপে চা ঢালতে বলে। উদো এর ঘুম এখনও পুরোপুরি ছাড়ে নি। সে তখনও তার স্বপ্নে তোলা কালো-জামের কথা চিন্তা করছে।

মাসী সাত নম্বরের স্বামীকে ঘুম থেকে তুলে বাইরে টেনে নিয়ে এল। নদীটার পাহারাদার ও একজন কালো ইউনিফর্ম পরা অফিসারকে দেখে সে ত কথা বলতেই বিশেষ ভীত হয়ে পড়ে। ওরা কি গুরুতর কোন বিপদে পড়েছে ?

অনুসন্ধান কারীর দলের নেতা কঢ়তা প্রদর্শন করে জানতে চায়, "এ কে ?"

পাহারাদার ওকে জানায়, "ও হচ্ছে সাত নম্বরের স্বামী। ওর সঙ্গে দেখা করতে গতকালই গাঁ থেকে এখানে এসেছে।"

সাত নম্বর আবার এর সাথে যোগ করে দেয়, "অফিসার ও গতকালই মাত্র এখানে এসেছে।"

অফিসার একবার সাত নম্বরকে ও আরেকবার তার স্বামীকে ভাল করে দেখে নেন এবং পাহারাদারের কথা মেনে নিয়ে কিছুই বলেন না। এলোমেলো খানিক খোঁজাখুজি চালাতে চালাতে বাদাম রাখার পাত্রটা দেখতে পেল। নদীর পাহারাদার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে একমুঠো বাদাম

তুলে অফিসারের ধোপদুরস্ত ইউনিফর্মের পকেটে গুঁজে দেয়, অফিসার স্রেফ একটু হাসে।

তা'র পরই অনুসন্ধানকারীর দল অন্য আরেক নৌকায় চলে গেল। কিন্তু মাসির পুনরায় চাঁদোয়া টাঙ্গানোর আগেই একজন পুলিশ এই কথা বলতে ফিরে এলো, "মাসি, সাত নম্বরকে বলো যে তাকে ভালো ভাবে সাবধানে তদন্ত করতে অফিসার আবার ফিরে আসবেন। বুজেছ?"

"উনি কি এখনই আসবেন?"

"অনুসন্ধান-এর কাজ শেষ করে আসবেন।"

"সত্যি?"

"ওরে বুড়ি কুত্তি, বল্ কখন তোকে আমি মিছে কথা বলেছি?"

মাসী খুসীতে উদ্ভাসিত। কিন্তু সাত নম্বরের স্বামী বিস্মৃত; কেন তার বৌকে তদন্ত করতে হবে এ সম্বন্ধে তার মাথামুণ্ড কিছুই সে বুঝছেনা। কিন্তু সাত নম্বরকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে তার আগের সেই বদ মেজাজ ফিরে এলো। যুবকটি চেয়েছিল যে বৌর সাথে রাতে শুয়ে কিছু কিছু পারিবারিক ব্যাপারে আলোচনা করে ঝুট ঝামেলা মিটিয়ে ফেলবে। সুতরাং নিজেই সে বিছানার প্রান্তে বসে পড়ে। তার মনের ভিতর কি আছে তা আন্দাজ করে এবং এখনও সে এই সব ব্যাপারে অন্ধকারেই রয়ে গেছে জেনে সাত নম্বরকে মাসি জানায়, "অফিসার এখনই আসছেন।"

নীরবে সাত নম্বর ঠোঁট কামড়ায়। তার মন এখন বেশ বিক্ষিপ্ত চিন্তায় চিন্তিত।

স্বামী এখান থেকে চলে যাবার জন্যে খুব ভোরে উঠে পড়ে। একটি কথা পর্যন্ত না বলে সে কাপড়ের চটিটা পায়ে বেঁধে নিয়ে তার তামাকের থলেটা খুঁজে বার করে নেয়। সব যখন প্রস্তুত তখন সে বিছানার ধারটিতে বসে পড়ে—দেখে মনে হয় সে যেন কিছু বলতে চা'য় কিন্তু তা বলতে পারছে না।

সাত নম্বর তাকে জিজ্ঞেস করে, 'গত রাতেই তুমি আমার ধর্মবাবার সঙ্গে দুপুরের ভোজ খাওয়ার প্রস্তাবে রাজী হও নি?"

জবাব দেবার ভঙ্গীতে সে মাথা নাড়ে।

"কেবল তোমার জন্যেই উনি আজ এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করেছেন। আজকের খাদ্যের তালিকায় থাকছে চারটা প্রধান পদ ও চারটে ছোট পদ এবং ভাজা মাছ। উনি তোমায় যখন এত সম্মান দেখাচ্ছেন তখন তুমিই বা পেছিয়ে যাচ্ছ কেন?"

"........."

"অপেরা দেখতে চাও না ?"

"........."

"সুন্দর স্বর্গীয় রেস্তোঁরা দুপুর বেলায় শূয়োরের পুডিং করে। এবং তুমি এই খাবারটা বেশ পছন্দ করো।"

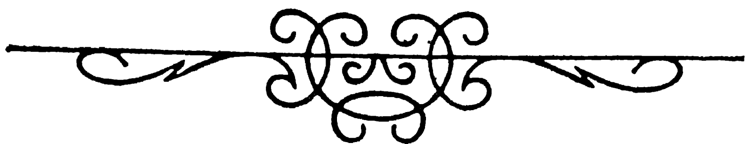
"সে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত। সাত নম্বর কিন্তু সম্পূর্ণ দিশেহারা। সে ওখান থেকে চলে গিয়ে আবার ফিরে আসে- গতরাতে সেনাদের দেওয়া টাকা তার মানিব্যাগ থেকে বার করে নিতে। সে নোটগুলো বসে বসে গোনে। চারটে নোট আছে। সেগুলোকে ভাঁজ করে সে তার স্বামীর বাঁ হাতে সেটা গুজে দেয়। স্বামী কিন্তু কোন কথাই বলে না। সে তার স্বামীর চিন্তা আন্দাজ করতে পেরেছে এটা ধরে নিয়ে মাসিকে বলে, "আরও তিনটে নোট দাও ত ?" সাত নম্বরের হাতে এই তিনটে নোটও দেওয়া হল ; সেগুলো সে গুনে তারপর সেটা স্বামীর ডান হাতে গুঁজে দেয়।

স্বামী মাথা ঝাঁকিয়ে নোটগুলো মাটিতে ছুড়ে ফেলে দেয। তারপর সে তার শিংএর মত কর্কশ দুটো হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে বাচ্ছা ছেলের মত ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে।

এটা অত্যন্ত খারাপ দেখাচ্ছে। উদো ও মাসি পেছনের কেবিনে উধাও হয়ে গেল। উদো এর কাছে এ ব্যাপারটা অদ্ভুত হাস্যকর মনে হয়। —ওমা এতবড় ছেলে কাঁদে। কিন্তু সে হাসলো না। পেছনের কেবিনে দাঁড়িয়ে কড়ি কাঠ থেকে সে ঝুলন্ত বেহালাটাকে দেখতে পায় এবং সে দু-চারটে গানও গাইতে চায় কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তা থেকে কোন শব্দ বার করতেই পারলো না সে।

নদীর পাহারাদার যখন তার দূরের অতিথিকে দুপুরের ভোজের নিমন্ত্রণ করতে এলো, তখন দেখলো নৌকায় কেবল মাসি আর উদো রয়েছে। তাদের কাছ থেকে সে জানতে পারে যে স্বামী স্ত্রী উভয়েই তাদের গাঁয়ে ফিরে গেছে ।

লেখক—সেঙ কঙ ওয়েন



অতুলনীয় তিন যোদ্ধা

(১) কেমন করে দ্বন্দ্ব দেখা দিল।

কেউ কেউ মনে করেন আমরা সৈনিকেরা অত্যন্ত সহজ সরল জীবন যাপন করে থাকি। তাঁরা মনে করেন যে যুদ্ধ করা এবং নিদ্রা যাওয়া ছাড়া আমাদের যেন অন্য কোন কাজ নেই। আসলে কিন্তু তা না।

আমাদের কোম্পানীকে দেখে মনে হয় আমরা সকলে যেন নিজের বাড়ীতে আছি। তফাৎটা কেবল এই যে বাড়ীটা আমাদের এই মুহূর্তে ট্রেঞ্চে হতে পারে আবার পরমুহূর্তে তা কোন কৃষকের খড়ো গাদাতেও হতে পারে। এসব করেও আমাদের সকলে পারিবারিক আনন্দের অংশও যেমন ভোগ করি আবার তেমনি পারিবারিক সমস্যার ভাগও গ্রহণ করতে হয়।

অন্যান্য জায়গা সম্বন্ধে আমার কিছু বলার নেই। আমায় কেবল আমার স্কোয়াড সম্বন্ধে দুচার কথা বলতে দিন।

ঘটনাটা ঘটে গেছে অল্পক্ষণ পূর্বে—যখন আমরা একজন সেনাকে পুনরায় আমাদের স্কোয়াডে ফিরে পেয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলাম, ঠিক তখনই অভ্যর্থনা জানালে কি কোন আনন্দদায়ক ঘটনা না। তার পরিবর্তে দেখা দিল দ্বন্দ্ব।

লোকটা একজন যুদ্ধের বীর। তিনি প্রথম তাঁর আঘাত থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আবার রণাঙ্গনে ফিরে যাচ্ছেন। আমরা মনে করেছিলাম প্রকৃতই তিনি অভ্যর্থনা পাবার যোগ্য। সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা সকলে অর্থাৎ পুরো স্কোয়াড ইঁটের তৈরী খাটে বৃত্তাকারে বসেছিলাম, এখানে আসার পথে তাঁর ধারণা হয়েছিল হয়ত আর তিনি আমাদের দেখা পাবেন না। তাই আমাদের সকলকে তাঁর চারিদিকে পেয়ে তিনি বেজায় খুশী, অঙ্গভঙ্গী সহকারে তিনি পুংখানুপুংখ রূপে বর্ণনা করে চলেন কেমন করে ট্রেনে চেপে এখানে তিনি এলেন, কেমন ভাবে জমিদারদের উৎখাত করতে

সত্যমুক্ত কৃষকদের সাহায্য করেন। তাঁর গল্প শুনতে শুনতে ত হেঁসে কুটি কুটি। তারপর আমরা আমাদের কোম্পানীতে যা সব ঘটছে তা প্রাণবন্ত ভাবে বর্ণনা করতে সুরু করি। সবশেষে একজন কমরেড বললেন, আপনি চলে যাবার পর থেকেই আমরা সবাই আপনার কথা স্মরণ করতাম। গত কয়েকদিন ধরেই সমগ্র রেজিমেণ্টটাই আপনার বীরত্ব পূর্ণ কীর্ত্তির গল্পে গুঞ্জরিত হচ্ছিল। আপনার প্রশংসায় আমরা সকলে মুখর ছিলাম। আর রেজিমেন্ট কমাণ্ডার ত বলেই দিলেন আপনার কাছ হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে। তিনি বলেছেন আপনি হচ্ছেন একজন শৌর্য্য পূর্ণ বীর। আমরা যখন পরস্পরের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করছিলাম হঠাৎ অপর একজন সেনা ঘরে প্রবেশ করে। যদিও সে একটা বাক্যের বেশী কথা বলেনি তাহলেও দ্বন্দ্ব সুরু করে দেওয়ার পক্ষে তা যথেষ্টই ছিল।

(২) ইয়ান চেংগফু

উপরে যাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল বীর যোদ্ধা হিসেবে সেই ইয়ান চেংগফু হচ্ছেন এই গল্পের প্রধান চরিত্র। তাঁর অতীত সম্বন্ধে কেউ কিছু না জানলেও এক নজরে তাঁকে দেখে বলে দেওয়া যায় যে তিনি এক গরীব পরিবার থেকে আসছেন। স্কোয়াডে সকল সময় সে একদল জোয়ান বাঘের মতই থাকতেন এবং যুদ্ধের সময় পরিণত হতেন এক একগুঁয়ে প্রকৃত বাঘে।

আহত হয়ে হাসপাতালের বিছানায় পাছা ঘসড়াতে ঘসড়াতে বিরক্ত হয়ে তিনি বাড়ী চলে যান। সেখানে তিনি দেখেন যে গরীব মানুষেরা এক নোতুন জীবনে প্রবেশ করতে চলছেন। তাদের পোষাক পরিচ্ছদ যথেষ্টই, আস্তাবলে তাদের ঘোড়া রয়েছে, এবং নিজ বাড়ীর দরজার বাইরেও তাদের সব জমি আছে। তাঁর হৃদয় অপরিমেয় খুসীতে ভরে যায়। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় কৃষক সংগঠণ তাঁর এই প্রত্যাবর্তন আনুষ্ঠানিক ভাবে যখন পালন করছিলেন তখন তিনি দৃঢ়তা সহকারে বলেন :

"আমায় বলতে দিন, তাহলে সরাসরি ব্যাপারটা ধরতে পারবেন। যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করেছি এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি ফিরে এসে দেখি আপনারা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, আমিও এটা পরিষ্কার ভাবে দেখলাম। এখন কেবল আমাদের শুভ সংবাদের অপেক্ষায় থাকতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি কখনও আমাদের লালাদুনের নাম ডোবাবো না।"

পরদিন সকাল হবার আগেই তিনি উধাও হয়ে গেলেন, ইয়াং চেংগফু হাসপাতালে ফিরে ওয়ার্ডের সব কমরেডদের সঙ্গে দেখা করে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে রওনা দিলেন।

সেনাদলে তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে লোকেরা তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক কীর্ত্তি কলাপ নিয়ে আলাপ আলোচনা চালাতো। প্রতিটি লোক সে সব গল্প অন্যান্য অনেকের কাছে করতো ; তাঁরা আবার সে গল্প আরও বেশী বেশী লোকের কাছে করতো, এমনি করে ঠিক যে ভাবে কিংবদন্তির গল্প প্রচারিত হয়ে আসতো অতীত কাল থেকে ঠিক সেই ভাবে এইসব গল্প ব্যাপকভাবে প্রচারিত হল। আসলে এটা সত্যই প্রচার করার মতই গল্প। একদিন শত্রুর সাথে এক অপ্রত্যাশিত যুদ্ধে আমরা তখন লিপ্ত ; দেখি কি যে ইয়ান চেংগফু একেবারে সামনের সারিতে। হঠাৎ তিনি একাই সামনে ছুটে এগিয়ে যান এবং কয়েক মুহুর্ত্ত পরেই আমাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শত্রুদের মেশিনগান ও ৬০ মি. মি. এর কামান থেকে সর্বত্র ধোঁয়া উড়ছে, আগুন জ্বলছে। আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে ইয়ান চেংগফু খতম হয়ে গেছেন,—বিপ্লবের এক শহীদ বনে গেছেন, কোম্পানী কম্যাণ্ডার ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর লোকজন নিয়ে রক্তাভ চোখে আক্রমণ করতে এগিয়ে যান। তারপর কি ঘটলো তা কেউ কল্পনাই করতে পারবে না। ঠিক এই সংকটময় মুহুর্তে বিভিন্ন স্তরের শত্রু সেনাদের মধ্যে হঠাৎ প্রবল বিভ্রান্তি দেখা দেয়, এবং তাদের গোলাবর্ষণ খানিকটা শিথিল হতেই আমরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। যা ঘটেছিল তা হল এই শত্রুদের ঠকানোর জন্য খানিক এদিক সেদিক করার পর কোন ভাবে ইয়ান চেংগফু এসে হাজির হলেন একেবারে শত্রু পক্ষের সাময়িক সদর দপ্তরে এবং আমাদের আক্রমণের সময় তিনি এক হাতে বোমা ছোঁড়েন। ফলে শত্রু-দের বিভিন্ন স্তরে ভীষণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এখন তিনি তাঁর বন্দুকের ডগায় এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, রেজিমেণ্টের অফিসারকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। ইয়ান চেংগফু চীৎকার করে জানান যে এই লোকটা এই সময় তাঁর সেনাদের পরিচালনা করছিলেন। একবার এই এলাকাটা দখলে আসার পর আমরা একেবারে শত্রু সেনাদের পেছনের গভীরে চলে গেলাম। পরবর্তী আক্রমণের সময় দেখা গেল তিনি আবার একেবারে গোলাগুলি বর্ষণের প্রথম সারিতে হাজির। তিনি চীৎকার করে বলেন : "আমি চেংফু আবার যুদ্ধের প্রথম সারিতে এসে গেছি।" তাঁর চীৎকার শুনে আমাদের উৎসাহ বেড়ে যায়। সে সময় আমাদের স্কোয়াডের দায়িত্ব ছিল

শত্রুকে আক্রমণ করার, কিন্তু ঠিক সেই সঙ্কট মুহূর্তে তিনি আহত হয়ে জ্ঞানহারিয়ে ফেলেন। কোম্পানি কম্যাণ্ডার আদেশ দিলেন তাঁকে বয়ে নিয়ে যুদ্ধ সীমানার বাইরে নিকটবর্তী বনের মধ্যে স্ট্রেচার বাহকের হাতে তুলে দিতে।

(৩) বুড়ো ক্রুলার।

লি ফাহেকে আমরা ঠাট্টা করে ডাকতাম বুড়ো ক্রুলার বলে। এ নামটা আমরা এত বেশী ব্যবহার করতাম যে জনগন বোধহয় তাঁর আসল নামটা ভুলেই গিয়েছিল। এমন কি রাজনৈতিক শিক্ষকও কোন কোন সময় তাঁকে এই পরিচিত নামে ডাকতেন।

বুড়ো ক্রুলার একজন বৃদ্ধ সেনা। কেউ কেউ আবার তাঁকে বলতো, "বুড়োরা কোনদিন উন্নতি করতে পারে না।" কিন্তু এ কথায় কিছু মনে করতেন না তিনি।

আমরা গিরিখাদটা (১) দখল করার পর আমাদের অনেকেরই প্লেটুন কমাণ্ডারের পদে পদন্নোতি ঘটে; কিন্তু তখনও তিনি একজন সাধারণ সেনাই রয়ে গেলেন। যাহোক তিনি তাঁর নিজের অদৃষ্ট নিয়ে পরিতৃপ্ত এবং কেউ এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি নম্রভাবে হেসে বলতেন, "আমি ভীষণ ভালো আছি ও ব্যাপারে মোটেই চিন্তিত নই।"

তাঁর সমস্যা হচ্ছে উদার নীতিবাদিতা; কোন জিনিষটাই তিনি গুরুত্ব সহকারে নিতেন না, তিনি কখনও প্রধান প্রধান শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতেন না। কিন্তু ছোট ছোট শৃঙ্খলা বারবার ভঙ্গ করতেন, যদিও তিনি তিন বছরের বেশী সময় ধরে সেনাবাহিনীতে রয়েছেন। নিশ্চিতভাবে তিনি একশতেরও বেশী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন কিন্তু সকল সময়ই তিনি অক্ষতই রয়ে গেছেন। অবশ্য যুদ্ধের সময় তিনি যথেষ্ট চালাক এবং যখনই নিদারুণ ভাবে পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনই তিনি দ্রুত, ক্রোধন্মোত্ত হয়ে লক্ষ্য বস্তুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। যা হোক্ তিনি রাজনীতিগত ভাবে দুর্বল ছিলেন, এবং তাই যে সকল আইন শৃঙ্খলা আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা করত সেগুলো সমস্তই তিনি ভঙ্গ করতেন। কখনও কোন মেডেল তাঁর গলায় ঝোলে নি। যাহোক্ আমাদের গল্পে আবার ফিরে আসা যাক্। সেই রাতে আমরা যখন ইয়ান চেংগফুকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলাম তখন তিনি হঠাৎ এক মন্তব্য করে বসেন। তিনি সেখানে এক পাশে বসে তামাক পাতা পাকিয়ে টানছিলেন; কিন্তু লোকে যখন

চেংগফুর প্রশংসা করছিল তখন তিনি হঠাৎ তাদের একপাশে সরিয়ে দিয়ে নিজের মাথা বার করে বলেন :

"আমার অনুমান ও স্রেফ কপালের জোরে মেডেল পেয়েছে।"

এই মন্তব্য শুনে ত ইয়ান চেংগফু রাগে ফেটে পড়েন। ভীষণ ক্ষেপে তিনি ভ্রূ কুঁচকে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেন, "কপাল বলে কি বোঝাতে চাইছ ?"

বুড়ো ক্রুলার তাঁর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকেন চুপচাপ। বলেন :

"ছোট বড় মিলিয়ে আমি একশর্তেরও বেশী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি ; কিন্তু আমার দেহে একটাও বুলেট স্পৃষ্ট ক্ষত নেই—এটা নিশ্চয়ই দক্ষতার লক্ষণ। তুমি বীর হতে পারো—সেটা ঠিক আছে কিন্তু যুদ্ধের সময় তুমি একজন শিক্ষার্থী মাত্র।—এখনও।"

দ্রুত ঠাণ্ডা জল লেগে সকলের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। স্কোয়াড দলপতি বলেন যে রাত অনেক হয়েছে এবং এখন বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ার সময় এবং সেই দিন থেকে ইয়ান চেংগফুও বুড়ো ক্রুলার পরস্পরকে অগ্রাহ্য করার অভ্যাস চালু করে দিলেন।

(৪) ঝাও ঝিয়াওই

ইয়ান চেংগফুও বুড়ো ক্রুলারের মধ্যে ঝগড়াটা যদি ঐ দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে ব্যাপারটা মোটামুটি সহজই থাকতো, কিন্তু এখন আব র ঝাও ঝিয়াওই এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েন।

ঝাও ঝিয়াওই একজন জোয়ান সেনা, বয়স মাত্র উনিশ। কুয়োমিনটাং এলাকাকে মুক্ত করতে আমরা যখন গ্রীষ্মকালীন অভিযান চালাই তখন সে এ পক্ষে যোগ দেয়। যেহেতু তার বয়স বেশ কম তাই সে ভীষণ ভাবে নষ্ট হয়ে যায় নি। তাই তাকে সেনাবাহিনীর একেবারে পেছনে পাঠানোর পরিবর্তে সঙ্গে সঙ্গে সরাসরি সেনাবাহিনীর সংখ্যা ভারি করতে তাকে পাঠানো হলো। আপাতদৃষ্টিতে ঝাও ঝিয়াওইকে নির্দোষ এবং প্রাণবন্ত মনে হলেও তার নিজের মধ্যে এখনও সন্দিগ্ধতা রয়ে গেছে। আমাদের আলোচনার সময় সে একটা কথাও বলতো না ; চারদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখতো, ভাবতো, "দুটো বাঘ যখন লড়াই করে তখন একজন হেরে যেতে বাধ্য, আমি লক্ষ্য রাখছি যে জিতবে আমি তার পক্ষ নেব।" অতএব আমাদের রেজিমেন্টে তার উদ্দেশ্য ছিল এই সক্রিয় হয়ো না আবার পেছিয়ে পড়াও চলবে না। সব ব্যাপারে খুঁত ধরা তার একটা বাতিক ; আবার যখনই তার মনে হত যে তাকে পূর্বতন যুদ্ধবন্দী হিসেবে

যথাযত সুযোগ সুবিধে দেওয়া হচ্ছে না তখনই সে গালমন্দ করতো, এখন সেই বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যাপাটা কোথায় গেল ?—সবগুল।” পাঁচ নম্বর স্কোয়াড ছিল এক আদর্শ স্থানীয় স্কোয়াড। অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তা পরিচালনা করেন দলপতি, কিন্তু একটা কঠিন শক্ত পাথরেও ত ফাটল থাকতেই পারে। ঝাও জিয়াত্তই আমাদের সঙ্গে কিছুদিন যাবৎ রযেছে, তাই স্বাভাবিক ভাবেই তার এই উদারনীতিবাদিতা তাকে বুড়ো ক্রুলারের খুব কাছে নিয়ে এল। সেদিন সন্ধ্যেবেলা যখন ইয়ান চেংগফুর সাথে বুড়ো ক্রুলারের বেশ বাগবিতণ্ডা চলছে তখন সে গোপনে গোপনে বুড়ো ক্রুলারের পক্ষে ছিল, কেননা কৃষকদের নবজীবন লাভ, জমিদারদের উৎখাত, বীর ইত্যাদি সম্পর্কে ইয়ান চেংগফু-এর গল্পে সে বিরক্ত বোধ করে এবং পরদিনই সে বুড়ো ক্রুলারের কাছে যাবার চেস্টা করে, যাহোক বুড়ো ক্রুলারের নিজস্ব কিছু নীতি ছিল। তিনি ঝাও ছোঁড়ার সাথে একসঙ্গে তামাক টানতে আগ্রহী কিন্তু তাঁদের নিজ নিজ অনুভূতি গিয়ে ওর সাথে আলাপ আলোচনা করা নৈব নৈব চ। তিনি নিজে নিজেই চিন্তা করেন আমার অনেক কষ্ট সহ্য করে এখানে আসতে হয়েছে, আর তুমি ত কেবল মাত্র যুদ্ধবন্দী। যেহেতু ঝাও এখানে কোন সান্ত্বনা পেল না তাই সে ইয়ান চেংগফু এর খোঁজে বেরিয়ে পডলো। তার মেজাজটা ঝাও বিগড়ে দিতে পারলো এই কথা বলে ; যে বুড়ো ক্রুলার নাকি বলেছে :

“ইয়ান চেংগফু কি এমন বিরাট কাজ করেছে ? পরের লড়াইতে সে কি করে দেখা যাক্।”

অবশ্যই ইয়ান চেংগফু তাঁর নিজের সম্বন্ধে যে কোন কথা শোনার জন্য আগ্রহী ছিলেন এবং তাই সে দিন থেকে বুড়ো ক্রুলারের সঙ্গে তার সম্পর্কটি আরও খারাপ হয়ে গেল। তাঁদের দেখা হলেই পরস্পর মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতেন।

কিন্তু যখন ঝাও নিজের অনুভূতির কথা পাড়লো ইযান চেংগফু তাতে কোন আগ্রহই দেখালেন না। এটা আবার কেন ?

ইয়ান চেংগফু-এর অনুভূতিটা হচ্ছে শাগি-চিন মুক্ত এলাকা থেকে আগত একজন মুক্তি যোদ্ধা ; কিন্তু তুই ভাঁচিস চিয়াং-কাই-শেক এলাকার একজন বন্দী মাত্র। তাঁর এই উচ্চস্তরের মানসিকতার ফলে ঝাও ছোঁড়া বেশ বিমর্ষ হয়ে পড়ে।

এই ভাবে চার পাঁচ দিন পরে একটি আদর্শ স্কোয়াড আর আদর্শ রইলো না।

(৫) স্কোয়াড নেতা লি ঝানহু বেশ চিন্তিত।

ঝগড়া যত বেড়ে যায় স্কোয়াড নেতা তত বেশী বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁর নিজ হাতে গড়া আদর্শ স্কোয়াড তাঁর চোখের সামনে ভেঙ্গে পড়েছে, তাই তিনি যে চিন্তিত হবেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

লি ঝানহু একজন ভালো স্কোয়াড নেতা ; যখনই কোন অসুবিধে দেখা দেয় তিনিই সবসময় সর্বপ্রথম সক্রিয় হন। কেউই ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না যে একটা স্কোয়াড পরিচালনা করা কি কঠিন কাজ। দশটা লোকের দশ রকমের মানসিকতা থাকতে পারে ; একজন দক্ষ নেতার কাজ হচ্ছে দশটা মনকে ঐক্যবদ্ধ করে একটা মনে পরিণত করা। লি ঝানহু কখনও রাগেন নি বা কাউকে রক্তচক্ষু দেখান নি। উনি এমন একজন পুরানো সেনা যিনি অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছেন এবং একজন ধৈর্য্যশীল শিক্ষক যিনি সকলের স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। স্কোয়াডের মধ্যে দ্বন্দ্বের আবির্ভাব ব্যাপারটাকে ভীষণ জটিল করে তোলে—বিশেষ করে তাঁরা যখন লড়াই করছেন বা পদযাত্রা করছেন। এই তিনজনে কেউ কারুর সঙ্গে কথাটি পর্য্যন্ত বলেন না যদি ওদের তিনজনকে পর পর বদলি প্রহরার দায়িত্ব দেওয়া হত তাহলে দেখা যেত কেউই দায়িত্ব পরস্পরকে হস্তান্তর করছেন না। একসঙ্গে তিনজনকে খেতে দিলে দেখা যেত ইয়ান চেংগফু যদি পূর্বদিকে মুখ করে বসতেন তাহলে লি ফাহে বসতেন পশ্চিম দিকে মুখ করে—সবসময়ে একজনের পেছনে অপর জনের পেছন দিয়ে। যদি একটাই ইঁটের খাটে ওদের শুতে দেওয়া হতো তাহলে লি ফাহে যদি ঘুমিয়ে পড়তেন তাহলে দেখা যেত ভোঁস ভোঁস শব্দ করে তাঁর বিছানা গুটিয়ে নিয়ে ইয়ান চেংগফু মাটিতে ঘুমিয়ে পড়তেন। একদিন লি ঝানহু মনস্থ করলেন ওদের তিনজনকেই সামনা সামনি বসিয়ে কথা বলানোর। প্রথমে তিনি চেংগফু-এর সাথে কথা বলেন। কিছুক্ষণ কথা বলার পর ইয়ান চেংগফু বলেন ঃ

"আমি জনগণের সেবা করবো তবে অপমানের সঙ্গে কোন রফা নয়। আপনি দেখে নেবেন যুদ্ধক্ষেত্রে আমি ভীরু কী ভীরু নয় ; এবং তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে সে জায়গা ছেড়ে চলে যান।

তারপর তিনি যান লি ফাহের কাছে। তাঁর কথা শোনার সময় সারাক্ষণ সিগারেট টেনেই চলেন। যখন স্কোয়াড নেতার কথা শেষ হল তিনি বলেন, "যাই ঘটুক না কেন আমি জনগণের সেবা করে যাবো। সে ব্যাপারে কোন প্রশ্নই নেই।"

স্কোয়াড নেতা তারপর ঝাও জিয়াওই-এর সাথে কথা বলেন, ঝাও শেষে বলেন :

"আহ স্কোয়াড নেতা আগে আমি এসব কিছুই বুঝতামনা ; কিন্তু এখন আমি মুক্ত এবং এখন শিক্ষালাভ করেছি। আমি জনগণের সেবা করবো—আর কি বলতে পারি ?"

এতসব ঝামেলার পরও ওঁরা তিনজনেই "জনগণের সেবা করে যাবো" এই শ্লোগানেই স্থির থাকলেন। স্কোয়াড নেতার উৎসাহ পরিণত হলো বিরক্তিতে এবং তিনি বিড়বিড় করে বলেন, "মনে হচ্ছে ঐ তিন জনেই যেন একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন।" তিনি প্রকৃতই চেষ্টা করছেন একটা পথ খুঁজে বার করার কিন্তু তার হাসি বা চোখের জল কোনটাই এ ব্যাপারে নূন্যতম সাহায্যে এলনা।

ঠিক এই সময়েই রেজিমেন্ট ঐক্যবদ্ধতা ও সংহতির একটা আহ্বান জানালো। যেহেতু পাঁচ নম্বর স্কোয়াড আগে একটি আদর্শ স্কোয়াড ছিল তাই রাজনৈতিক শিক্ষকের বাসনা হল এটাকে বিশেষ শিক্ষা দেবার এবং তাই এঁদের সঙ্গে পরিচিত হতে তিনি অনেক সময় ব্যয়ও করলেন। এই স্কোয়াডের ভেতরের ব্যাপার স্যাপার দেখে তিনি ও অবাক, সেটা তিনি অনুমোদনও করলেন না। এই ব্যাপারে লি ঝানহু এত বিমর্ষ হয়ে পড়েন যে তাঁর চোখ ফেটে জল আসে। তিনি রাজনৈতিক শিক্ষককে পাকড়াও করে বলেন, "মাষ্টারমশাই পাঁচ নম্বর স্কোয়াড সম্বন্ধে এখনও আশা করা যায়। দয়া করে আরও তিনটে দিন আমাদের সময় দেন।" অনুরোধ গৃহীত হলো এবং নেতা ভাবেন "এখন আমি কি করবো ?" তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন "ঘেরাও করে উৎখাত করার অভিযান" এর এবং সরাসরি তিনজনকে ডেকে পাঠালেন। কয়েকটা বাক্যের সাহায্যে তিনি তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সমস্যাটা তুলে ধরেন। অপ্রত্যাশিতভাবে তিনজনাই কিন্তু একই সুরে জবাব দেন, "স্কোয়াড নেতা, সবকিছুই তো ঠিকঠাক ভাবেই চলছে এমন কিছু ত খারাপ ঘটে নি।" এইকথা শুনে তিনি খুশী হলেন এবং পাঁচ নম্বর স্কোয়াড যাতে করে আদর্শ স্কোয়াডের পদক লাভ করতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁদের কিছু বললেন। কিন্তু পরদিনই দেখা গেল যে কেউই তাঁদের নিজ নিজ সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও সরল না এবং প্রত্যেকে প্রত্যেককে অগ্রাহ্য করেই চলেন। এ ঘটনায় স্কোয়াড নেতা ভীষণ বিমর্ষ হয়ে ক্ষোভে কেঁদে ফেললেন—যখন তিনি একা পড়ে যান। যেহেতু তাঁদের একটা লড়াই-এ অংশ নিতে হবে এবং সেজন্য তাঁর

প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন তাই ঐক্যের ব্যাপারে আর বেশীদূর কিছু এগুলো না।

(৬) এক টুকরো হাড়।

পরদিন সকালে আকাশে কালো মেঘও অল্প বৃষ্টির মাঝেই লড়াই শুরু হয়ে গেল। সেদিন লড়াই শেষে লি ঝানহু তাঁর দলবল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেলেন। এক জনশূন্য কবরের ঢিবির বিস্তীর্ণ এলাকার ভেতর দিয়ে যাবার সময় লি ঝানহু এক টুকরো হাড় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন; তা মাটি থেকে তুলে দেখার জন্য নীচু হলেন। তাঁর স্কোয়াডের লোকেরা কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ্য করেন এবং তিনি ওদেরকে প্রশ্ন করেন ঃ

"জানো কি এ হাড়টা কার?"

বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁরা আলোচনা সুরু করে দেন। কেউ কেউ বলেন এটা কোন গরীব লোকের হাড়; আবার অনেকে বলেন এটা বড় লোকের হাড়। শেষ পর্য্যন্ত লি ঝানহু তাঁর বক্তব্য রাখেন ঃ

"আমার অনুমান এটা কোন গরীব মানুষের হাড়। কোন জমিদার, বড় চাষী এবং ধনী লোক মারা গেলে তাকে গোর দেওয়া হয় কফিনে যথাযথ সমাধি সৌধ সহ। তাঁদের হাড় এভাবে মাটিতে গড়াগড়ি যায় না। গরীব লোকেরা জীবিতকালে কিছু খেতে পায় না এবং মারা যাবার পরেও শান্তিতে থাকার মত জায়গাও তাঁদের জোটে না। তাদের হাড় বাতাস ও বৃষ্টিতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ওদের জন্যে ভাবেটা কে?"

শিবিরে ফিরে এসে সেনারা মাঠে খড় ছড়াতে ও জল দিতে লেগে পড়ে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে লি ঝানহু লক্ষ্য করেন যে ইয়ান চেংগফু, লি ফাতে ও ঝাও জিয়াওইকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না; এমনকি খাবার সময় পর্য্যন্ত তাদের কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। তিনি ব্যারাকে ছুটে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরেই ঝাও ছোড়াটা যে ইটের তৈরী খাটে শুয়ে পড়েছিল এখনও সে সেখানেই রয়েছে। স্কোয়াড নেতার মনে হয় বুড়ো ক্রুলার বা ইয়ান চেংগফু-এর সঙ্গে ওর হয়ত আবার কোন ঝগড়া বেঁধেছে এবং তাই তাঁকে তিনি সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন ঃ

"আহ্‌, ঝাও জিয়াওই মানুষ ঐ রকমই! যখন তারা একত্রে থাকে তখনই তারা বিরক্তি প্রকাশ করে, কিন্তু যখন তারা আলাদা হয়ে পড়ে তখন আবার তারা একত্র হতে চায়।"

ঝাও এর বাহু ধরার জন্যে তিনি কষ্ট করে ইঁটের তৈরী খাটে উঠে বসেন। কিন্তু ঝাও হঠাৎ ঘুরে উঠে আর্তনাদ করে স্কোয়াড নেতার কাধে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাও মাউ করে কেঁদে ওঠেন।

অনেকক্ষণ কাঁদার পর সে স্কোয়াড নেতাকে এক গল্প শোনায় এবং তার ফলে গল্প বলিয়ে ও তাঁর শ্রোতা উভয়েই কেঁদে ভাসিয়ে দেন।

স্কোয়াড তৎক্ষণাৎ কোম্পানীর সদর দপ্তরে গিয়ে রাজনৈতিক শিক্ষককে এই ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেন। এবং গল্প শুনে তিনিও বেশ বিচলিত হয়ে পড়েন এবং তিনি স্কোয়াড নেতাকে ফিরে গিয়ে ঝাও-এর উপর খেয়াল রাখতে বলেন। ফিরে যাবার পথে তাঁর ভাতা তুলে লি ঝানহু সেই টাকায় কিছু ডিম কিনে আনেন এবং তা ঝাও ছোঁড়ার জন্য সেদ্ধ করে দেন। পাত্রটা তুলে ধরেই সে আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এখন কথাটা হচ্ছে এই যে ঝাও জিযাওই কি বলেছিল আর স্কোয়াড নেতা কি শুনেছিল সেটা জানার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে হবে—কেননা অন্য আরেকটা ব্যাপারে আমাদের একটু মনো সংযোগ করতে হবে।

(৭) এখন ইয়ান চেংগফু ও বুড়ো ক্রুলার প্রসঙ্গ।

ইয়ান চেংগফু ভীষণ বিমর্ষ এবং কিছুক্ষণ একা বসে থাকার জন্য নির্জন জায়গায় খোঁজ করতে করতে ধীর পদক্ষেপে পেছনের চত্বরে যেখানে শস্য আবর্জনা রাখা হয় সেখানে চলে এলেন বুড়ো ক্রুলারও অবনত মস্তকে সেদিক পানে হেঁটে চলেছেন। ওঁরা যদি পরস্পরের পায়ের শব্দ না শুনতে পেতেন তাহলে তাঁদের পরস্পরের ঘাড়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। ইয়ান চেংগফু মাথা তুলতেই বুড়ো ক্রুলারকে দেখতে পান আবার তিনিও মাথা তুলে ইয়ান চেংগফুকে দেখকে পান। এবং তারপরই কে যেন তাঁদের আদেশ দিল, "ফিরে যাও"। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দুজনেই মাথা ঘুরিয়ে সেখান থেকে চলে যান।

কিছুক্ষণ সামনে পেছনে করে ঘোরাঘুরি করার পর ইয়ান চেংগফু গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন।

বুড়ো একটা সিগারেট পাকিয়ে সেটা টানতে টানতে নির্জন জায়গার সন্ধানে মাথা নীচু করে দেওয়ালের পাশ ধরে ধরে হেঁটে চললেন।

ইয়ান চেংগফু বনের ভেতর একদিক থেকে ঢুকলেন ত বুড়ো ক্রুলার অন্যদিক থেকে বনে ঢুকলেন। এবং এইভাবে ইয়ান চেংগফু যেমন একটা

নদীর তীরে এসে হাজির হলেন ত বুড়ো ক্রুলারও নদীর তীরে এসে উপস্থিত। আরেকবার তাঁদের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়।

ইয়ান চেংগফু ভীষণ রেগে নিজেকেই শাপ শাপান্ত করেন। নেহাৎ তিনি নিজের থেকে প্রথমে কথা কইবেন না তাই, না হলে নিশ্চিতভাবে তিনি বুড়ো ক্রুলারকে কষে গালাগাল করতেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে স্কোয়াড নেতা তাঁদের খোঁজে সেখানে এসে উপস্থিত। তিনি দুহাতে দুজনের দুহাত ধরে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

শিবিরে ফিরে ওঁদের কারুরই খাবার ইচ্ছে না থাকায় সোজা বিছানায় শুয়ে পড়েন।

(৮) রাতে একটা বাতি জ্বালা হল।

সন্ধ্যেবেলায় একটা বাতি জালা হয়। ইটের তৈরী খাটের নীচে লাইন করে রাখা জুতোগুলো পরীক্ষা করে স্কোয়াড নেতা তার মধ্য থেকে দুটা ছেঁড়া জুতো বেছে নেন। নিজের হাঁটুতে শন পাকিয়ে সুতো তৈরী করে জুতো সেলাই-এ লেগে পড়েন। তিনি কাজ সুরু করতেই ঝাও ছোঁড়া বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে তাঁর কাজ নিজে করে দেবার আবেদন জানালেও স্কোয়াড নেতা সেগুলো তাকে দেন না, একটু হেসে ঝাওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "ঘুমোও ত! তোমার শরীর ভালো ঠেকছে না। আবার কাল সকালেই লড়াই করতে হতে পারে।" কিছু পরে স্কোয়াড নেতাকে চমকে দিয়ে ইয়ান চেংগফু উঠে বসেন। তিনি হাত বাড়িয়ে জুতো জোড়া ধরতে যান কিন্তু স্কোয়াড নেতা আবার সেটা সরিয়ে নেন বলেন, "তোমার শরীর ভালো না-দুর্বল দেখাচ্ছে তোমায়। তোমার কি মনে হয় না পরে তোমায় আরও বেশী কাজ করতে হতে পারে? এখন ঘুমোও।" সেখানে কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির সহকারে বসে থেকে ইয়ান চেংগফু আবার শুয়ে পড়েন। হঠাৎ একটা মর্মর ধ্বনি শোনা গেল, বুড়ো ক্রুলার উঠে বসে চাপাস্বরে স্কোয়াড নেতাকে বলেন, "আপনি ঘুমোন, আমি সেলাই করে দিচ্ছি।" স্কোয়াড নেতা মুচকি হেসে বলেন, "সাধারণতঃ তোমরা যদি স্বেচ্ছায় সাহায্য নাও করতে চাও তাহলেও তোমাদের কাছে আমার সাহায্য চাইতেই হবে। আজ তোমরা কেউই সুস্থ নও। তাই তোমাদের এখন বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন," কিন্তু ততক্ষণে পুরো স্কোয়াডটাই জেগে গেছে। কেউ ঘুমোয়নি এবং তারা সবাই চারদিকে পরস্পরকে দেখছিল, তৎক্ষণাৎ

ঝাও ছোঁড়া ভীষণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং সেদিন স্কোয়াড নেতাকে তার বলা সেই গল্পটা এদের সকলকে কাঁদতে কাঁদতে পুনর্বার বলেন।

"আমার বাবা ছিলেন একজন শূকর পালক। একবার একটা শূয়োর, হারিয়ে যায়, তাই জমিদার তাঁকে এমন মার মারে যে তিনি অজ্ঞান হয়ে মারা যান। তাঁকে গোর দেবার আগেই কুওমিনটাং বাহিনী আমায় জোর করে তাদের সেনাবাহিনীতে নিয়ে নেয়।"

"আমি কাঁদলাম ও লড়াই চালালাম; ঠাণ্ডা জলে চামড়ার চাবুক ভিজিয়ে এমন মার আমায় তারা মারে যে আমি মরারও বাড়া হয়ে উঠলাম। আমি তাদের বলি আমার যদি মরণও হয় তাহলেও আমার বাবাকে একবার দেখবোই। ওদের একজন বলে: "তোমার বাবা যদি মারা গিয়েই থাকে তিনি এখন যা করেছেন তাহলো কবরের জায়গাটা দুর্গন্ধময় করে তুলেছেন দেখার কি আছে?" "এ ঘটনাটা দুবছর পূর্বে ঘটেছিল। সেদিন তাঁকে গোর দিতে কেউ ছিলেন না এবং তাঁকে গোর দেবার জায়গাই ছিল না সেদিন। বাতাসে আর ঝড়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে···।" কথাগুলি শেষ না করেই ঝাও চীৎকার করে কেঁদে ফেলে।

এই সময় ইয়ান চেংগফু দ্রুত উঠে গিয়ে ঝাও ছোঁড়াকে দু বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেন।

"আমি দুঃখিত ছোট্ট ঝাও আমার! চিয়াং কাইশেক-এর এলাকা থেকে আসা সব লোককেই আমি অবজ্ঞা করতাম। আমি জানতাম না যে তুমিও গরীবদের মতোই একজন, ওদের মতই অত্যাচারিত।"

একবার তিনি কথা বলতে স্থুরু করে ইয়ান চেংগফু তাঁর নিজের দুঃখ কষ্টের গল্প বলতে বলতে চোখের জল আর ধরে রাখতে পারলেন না।

"তোমার বাবাকে হত্যা করেছে জমিদার এবং আমার মায়ের কপালেও একই ব্যাপার ঘটে। আমার বাবাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন আমার বয়স আটারো বৎসর। এবং তাঁকে কঠিন পরিশ্রম করানো হতো। জমিদার বিষ খাইয়ে আমার মাকে হত্যা করে। দাঁতালো রেঁদা দিয়ে মেরে মেরে ভাইকে খুন করা হয়—আমি লুকিয়ে থেকে এ সব দেখেছি। আমাকে কেউ খুঁজে পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করে যত জোরে সম্ভব ছুটে লিয়াও নদীর ধারে এসে উপস্থিত হলাম। আমি নদীর দিকে তাকিয়ে সত্যাই সত্যাই চিন্তা করছিলাম নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সব ল্যাঠা চুকিয়ে দিতে। তারপরই ভাবলাম: বাবা বেঁচে আছেন না মারা গেছেন তাই আমি জানি

না এবং ইয়ান পরিবারের আমিই একমাত্র জীবিত প্রাণী এখন আমি যদি এদিক সেদিক করে রয়ে যাই তাহলে আজই হোক আর কালই হোক আমি প্রতিশোধ নিতে পারবো। আর আমি যদি মরেই যাই তাহলে জমিদার ত আরও খুসী হবে। তারপর এক বছর ধরে ভিখারীর জীবন যাপন করি। গ্রীষ্মকালে আমি মাঠে শস্য বয়ে নিয়ে যেতাম, শীতকালে শূয়োরের খোঁয়াড়ে শুতাম।

একমাত্র ক্রুলার ছাড়া স্কোযাডের সবাই কেঁদে ভাসিয়ে দেয় ঐক্য ও সংহতির কথা জনগণ সাধারণভাবে বলতো, কিন্তু অন্য মানুষদের দুঃখ কষ্টের মধ্যে নিজের দুঃখ কষ্টকে দেখতে পেয়ে তারা আগের চেয়ে অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ হযে ওঠে অন্যান্যদের সঙ্গে। ঝাও তাকিয়ে থাকে ইয়ান চেংগফুএর দিকে, সেও তাকিয়ে থাকে ঝাও-এর দিকে। তারপর ইয়ান বলেন ঃ

"তোমার গল্প শুনে বুঝলাম যে গরীব মানুষ সর্বত্র একই ভাবে অত্যাচারিত হযে থাকে।"

ঝাও বলে, 'ঠিকই বলেছ! তোমার গল্প শুনে বুঝলাম যে কমিউনিষ্ট পার্টি ও অষ্টম রুট বাহিনীতে গরীব গরীবকে সাহায্য করে। গত কয়েক-দিন ধরে আমি এত বোকা ছিলাম যে এইটাই বুঝতে পারছিলাম না। আমার মনে হচ্ছে যে আমি যেন বিপ্লবের অযোগ্য এবং নিজেও অযোগ্য।'

স্কোয়াড নেতা লি ঝানহু বলেন, "প্রত্যেকেই কথা বলুন। নিজেদের লোকের কাছেই যদি আমরা নিজেদের দুঃখ কষ্টের কথা না বলি তাহলে বল্‌বোটা কাকে ?"

সূর্য অস্ত যেতেই রাতটা আরও অন্ধকার হয়ে এল। পৃথিবীতে কত লোক রয়েছে। যাঁরা নিরাপদে ও অক্ষত দেহে ঘুমোতে পারেন ? কত লোকে তাঁদের দুঃখ কষ্টের কথা নিয়ে, তাদের রক্ত ভেজা অশ্রুর কথা নিয়ে ভাবে ? একজন তার দুঃখের কথা শেষ করলে অপরজন বলতে সুরু করে এবং এই ভাবে সে রাতে পাঁচ নম্বর স্কোয়াড জুড়ে অঝোর ধারায় বেদনার্ত চোখের জল ঝরে। এবং পরদিন সকাল পর্যন্ত আলো জলতেই থাকে।

(৯) লি ফাহের কি হল।

একমাত্র লি ফাহে, যাঁর বুকে বিশাল এক ওজন চাপানো রয়েছে বলে মনে হয়, মুখ খোলেন নি। একটা কথাও না বলে তিনি সে রাতে চুপচাপ বসে রইলেন। অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যতই তিনি চিন্তা করেন ততই

তাঁর নিজের উপর বিরক্তি বেড়েই চলে, অন্যান্যরা নির্মমভাবে নিজেদের দুঃখ কষ্ট অনুভব করে। কিন্তু তাঁর হৃদয়ের চারপাশে কঠিন এক চড়া পড়ে গেছে। নিজেকে তিনি নির্মমভাবে প্রশ্ন করেন, "ওরা সকলেই গরীব ঘর থেকে এসেছে। একমাত্র আমিই কি তাহলে বড়লোকের ঘর থেকে এসেছি?" তিনি স্মরণ করেন ছোট থাকতে যখন তিনি গাঁয়ে বাস করতেন তখন সেখানে অপেরার গান গাইতে ও ইয়ানগ্নি নাচ নাচতে ভীষণ পছন্দ করতেন। তিনি যে একজন সুপরিচিত অবাঞ্ছিত ব্যক্তি এই ব্যাপারের সুযোগ গ্রহণ করে জমিদার তাঁকে এক ঝটকায় ভিটেমাটি ছাড়া করতে লেগে যান। যখন তাঁকে গ্রামের বাইরে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তখন তাঁর নগ্নতা চাপা দেওয়ার মত একজোড়া প্যান্টও সঙ্গে ছিল না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে গ্রামেই ফেলে এসেছিলেন। যদি ঐ বছরগুলিতে সে যদি কোথাও কাজে না যুক্ত হয়ে থাকে ত নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট তাকেও ভোগ করতে হয়েছিল। অবমাননা ও ক্ষতি স্বীকার করা এটাই কেবল পড়েছিল লি ফাঙের জন্য, এমন কি তাঁর প্রতিশোধ নেবার স্পৃহাটা পর্য্যন্ত হারিয়ে গিয়েছিল। যদি কমিউনিষ্ট পার্টি ও অষ্টম রুট বাহিনীর সঙ্গে তাঁর দেখা না হত তাহলে গোটা জীবনটাই তাঁর অর্থহীন হয়ে পড়তে পারতো। কিন্তু গত চার পাঁচ বছর ধরে তিনি একদল সৈনিক—প্রথমে গিরিখাদের ভেতরে, পরে তার বাইরে; এবং এই সব কথা স্মরণ করে তাঁর মনে হয় যে সত্যই তিনি বিপ্লবের, তাঁর কম্যাণ্ডারের ও নিজেরই অযোগ্য। সে রাতের পরে, যদিও তিনি কাউকে বলেননি, গোপনে গোপনে একটি সিদ্ধান্তে আসেন। "সোনার জড়ির মূল তেঁতো কিন্তু আমার ভাগ্য আরও তেঁতো।" সিদ্ধান্ত নেবার এটাই সঠিক সময়। তিনি চিন্তা করেন তাঁর রাজনৈতিক শিক্ষকের কথা, এবং তাঁর উচ্চতর অফিসারদের কথা—যাঁরা কখনও ওঁর সঙ্গে খারাপ আচরণ করেননি। দুর্ভাগ্যের সন্তান ঝাও ছোঁড়ার কথাও তাঁর মনে পড়ে। ইয়ান চেংফু-এর কথা ভাবেন—তিনি সত্য সত্যই তাঁর সাথে গোলমাল মিটিয়ে ফেলতে চান এবং তার সাথে করমর্দন করতে চান। কিন্তু যে মুহূর্তে ঠোঁটের আগায় কথাটি এসে পড়ে সে মুহূর্তেই আবার তিনি মনে করেন, "তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিলে দুঃখ পেতে হয়। দেখা যাক।"

(১০) রণাঙ্গণের সাধারণ নিয়তি সকলের মধ্যে ঐক্য আনে।

কয়েকদিন পরে আমাদের সেনারা আবার লড়াইয়ে নেমে পড়ে। যুদ্ধটা যখন জমে উঠেছে ঠিক তখনই আমাদের কোম্পানী যুদ্ধে যোগ দেয়।

সাধারণতঃ ঝটিকা বাহিনীর দায়িত্ব অর্পিত হবার কথা পাঁচনম্বর স্কোয়াডের উপর। কিন্তু প্রথম পনেরো মিনিটের মধ্যে দেখা গেল সেটা দ্রুত ছত্রভংগ হয়ে গেল। এবং পাঁচ নম্বর স্কোয়াডের উপর আদেশ এল দ্রুত সামনে যাবার। জ্বলন্ত চোখে দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুলে লি ঝানহু বলেন, "কমরেড, গতকাল রাতে আমরা যে সব দুঃখ কষ্টের কথা আলোচনা করেছিলাম তা যেন ভুলে যাবেন না। ঝাও ছেলেটা আর ইয়ান চেংগফু যে সব অত্যাচার ভোগ করেছেন তা কোনমতেই ভুলবেন না, আপনার বাবা, মা, ভাই, বোনের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করার এটাই প্রকৃষ্ট সময়," দশটা রকেটের মতই তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পাঁচ নম্বর স্কোয়াডের কাজ নিজে পরিদর্শন করার জন্য রাজনৈতিক শিক্ষক নিজে হামাগুড়ি দিয়ে রণাঙ্গনে এসে হাজির। সেখানে তাঁকে লি ঝানহু বলেন :

"আমাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিন। পাঁচ নম্বর স্কোয়াডের ভুল ত্রুটি তারা নিজেরাই শুধরে নেবে।" ইয়ান চেংগফু দায়িত্ব নিলেন একটা গর্ত সৃষ্টি করার যাতে করে সকলে বেরিয়ে যেতে পারে। এক প্যাকেট বিস্ফোরক হাতে নিয়ে ইয়ান চেংগফু সামনে ছুটে গেলেন আর সমগ্র স্কোয়াড মাঠে শুয়ে তা লক্ষ্য করতে থাকে। তাঁকে আর মাত্র দশ কদম যেতে হবে এবং তার আগেই হোঁচট খেয়ে সেখানে পড়ে যান তিনি। লি ঝানহু এর কথার জন্যে আর অপেক্ষা না করে তীর বেগে ঝাও ছোঁড়া তাঁর পাশে ছুটে যায়। ইয়ান চেংগফু থেকে আর মাত্র দু কদম আগেই সেও পড়ে যায়, কিন্তু হামাগুড়ি দিয়ে এগিযে যাবায বহু চেষ্টা করে কিন্তু শত্রু সেনাদের প্রবল গোলাবর্ষণে পরিবৃত হয়ে আর একপাও এগুতে পারেনা। এই সময়টা ধরে যা সব ঘটছিল তা লি ফাহে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে নক্ষ্য করছিলেন। তাঁদের সামনে আগুনের বর্ষণের মত বুলেট বর্ষিত হতে থাকে। তিনি হঠাৎ স্কোয়াড নেতাকে বলেন, "এ ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন, আমায় একট সাব মেশিনগান দেন, ওঁদের দুজনের পেছনেই আমি যাচ্ছি—কাজ শেষ না করে ফিরছি না। শত্রুপক্ষের কেন্দ্রীভূত গোলাবর্ষণের মাঝে যেখানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাউকে পাঠানো মোটেই যুক্তিযুক্ত নয় সেখানে লি ফাহের দ্রুত ছুটে গিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়াটা গভীর মনোযোগের সাথে সমগ্র স্কোয়াড লক্ষ্য করছিল। ওঁরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে দেখছেন। কপালের ঘাম মুছে লি ঝানহু এ সব লক্ষ্য করছিলেন। শেষ পর্যন্ত লি ফাহে যেখানে ইয়ান চেংগফু উপুর হয়ে পড়েছিলেন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। এখন

তিনটে লোক খরচ হয়ে যাওয়া গুলির মত পড়ে রয়েছেন—এগুতে বা পেছুতে কোনটাই পারছেন না। ইয়ান চেংগফুর কাঁধে গুলি লাগে তাঁর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়লেও হাতে শক্ত করে ধরা বিস্ফোরক মোটেই হাতছাড়া করেন নি। দুজনে পরস্পরের দিকে নীরবে তাকায় —এই দৃষ্টির মধ্য দিয়ে অনেক কথাই বলা হয়ে গেল লি ফাহে ইয়ান চেংগফুকে বয়ে নিয়ে গেলেন কম গোলা-গুলি বর্ষণের এলাকায় এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "কেমন বোধ করছেন?" দাঁতে দাঁত চেপে চেংগফু বলেন, "ও কিছু না। আমাদের এগুতেই হবে। কোন মতেই আমরা পেছুতে পারি না।"

তারপর হামাগুড়ি দিয়ে লি ফাহে ঝাও ছোঁড়ার কাছে গেলেন।—তাঁর পায়েও গুলি লাগে; মাটি রক্তে ভিজে গেছে। তিনি ঝাওকে এক পাশে বয়ে নিয়ে গেলেন, জিজ্ঞাস করেন, "কেমন বোধ করছ?"

"পায়ে গুলি লেগেছে।"

"কামান চালাতে পারবে তো?"

"নিশ্চয়ই!"

"খুব ভালো। এখান থেকে তুমি ওকে লক্ষ্য রাখো আমি ওখান থেকে রাখছি। আমাদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়লেও আমাদের দেখা উচিত যাতে করে ইয়ান চেংগফু তাঁর কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। ঠিক আছে?"

ঝাও সম্মতি সূচকভাবে ঘাড় নাড়লে লি ফাহে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে চলে। মৃতদেহের মাঝ দিয়ে যাবার ফলে তাঁর পোষাক সব রক্ত মাখামাখি হয়ে যায় দুদিক থেকেই প্রবলভাবে গোলাগুলি বর্ষিত হতে থাকে এবং তার ফলে প্রতি ইঞ্চি জমি আগুনের শিখায় আবৃত হয়ে যায়। ঝাও-এর চুলে আগুন ধরে যায় এবং লি ফাহের প্যান্ট থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সমগ্র স্কোয়াড দেখল তাঁরা কোন নড়া চড়া করছেন না, এবং তাঁদের এই বিরত্বপূর্ণ আত্মদানের চিন্তায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অন্য একটা বিস্ফোরণের অপেক্ষায় ছিলেন। হঠাৎই সামনে থেকেই গোলাবর্ষণের শব্দ ভেসে আসে। লি ফাহের সাব মেশিনগান গর্জন করে ওঠে এবং ঝাও ছোঁড়া দাঁত কড়মড় করে গুলি ছুঁড়তে সুরু করে। রক্তে মাখামাখি হয়ে অতি কষ্টেস্বষ্টে ইয়ান চেংগফু চার হাত পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সামনে ঝাঁপিয়ে এগিয়ে যায়। এক সেকেণ্ড বাদেই খুব নিকটেই এক ঝলক আলোর ঝল্‌কানির পরেই বিরাট বজ্রগম্ভীর আওয়াজ এবং শত্রু পক্ষের

শক্তঘাঁটি একেবারে ধ্বসে পড়ে। একটা বিশাল কালো ধোঁয়ার স্তম্ভ আকাশে উঠে যায়। তারপর অকস্মাৎ আমাদের দিকে প্রবল করধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। একটা ফাটল সৃষ্টি করা গেছে এবং আমারের সেনারা, "মার মার" রবে ঐ ফাটলের মাঝ দিয়ে সবেগে ঢুকে পড়ে।

(১১) আমাদের গল্প শেষ হল মেডেল প্রদানের মধ্য দিয়ে।

যুদ্ধে জয়লাভ হল ; এক ডিভিশন শত্রুসেনা সম্পূর্ণরূপে খতম। এবং পাঁচ নম্বর স্কোয়াড একাই ৫৮ জনকে বন্দী করে। অল্প সময়ের মধ্যেই বিজয়োৎসব পালিত হয়। রাজনৈতিক পরিচালক আমাদের একদল ব্যাণ্ডবাদক আনতে বলেন ; তাই আমরা তিনজন কৃষককে আমন্ত্রন করে নিয়ে এসে আমাদের চারজনের সঙ্গে যুক্ত করে দিলাম। এবং তারপর বাঁশী, ঘন্টা, কোমরে বাঁধা ব্যাণ্ডের আওয়াজে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে।

চলুন এখন ফিরে যাওয়া যাক ইয়ান চেংগফু, লি ফাহে ও ঝাও-এর কাছে ; যাঁরা স্কোয়াডের সামনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁদের তিনজনকে "অতুলনীয় তিন যোদ্ধা" হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক পরিচালক ওদের সামনে গিয়ে প্রত্যেকের বুকে একটা করে মেডেল ঝুলিয়ে দেন। মেডেল তিনটে জ্বলজ্বল করছে।

ইয়ান চেংগফু তাকাল লি ফাহের দিকে ; আবার লি ফাহে তাকিয়ে থাকেন ঝাও জিয়াওর দিকে ; তারপর তাঁরা একসঙ্গে ভীষণ জোরে হাততালি দিয়ে ওঠেন। যখন তিন জনকেই তাঁদের রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয় তখন তাঁরা সবাই এক স্বরে বলেন :

"এ সব কিছুর কৃতিত্ব একা স্কোয়াড নেতার।"

লি ঝানহু উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "আমরা গরীব লোক আবার আমাদের অনেক কষ্ট, ভোগ করতে হয়েছে। আসুন আমরা আমাদের দুঃখ দুর্দশাকে পরিণত করি শক্তিতে এবং সকলে ঐক্যবদ্ধ হই, তাহলে আমরা পৃথিবীতে অতুলনীয় হয়ে উঠবো।"

বিঃ দ্রঃ—

(১) স্যানহাই ওয়ান—এটা একটা গিরিখাদ যেখানে চীনের প্রাচীর পূর্ব চীন সমুদ্রে মিলেছে।

লেখক—লিউ বাইউ



"অভিজ্ঞান"

এখন শরৎকাল এবং দিনকে দিন ঠাণ্ডা বাড়ছে। জিয়াও লিউ তাঁর স্বাস্থ্য অনেকটা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন, এখন তিনি দেওয়াল ধরে ধরে আস্তে আস্তে ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে পারেন। তাঁর আরোগ্যলাভে আমরা সকলে খুসী। সে বছর গ্রীষ্মকালে কারাগারে বেশ কয়েকজন মারা যান। প্রতিদিন গভীর রাতে ডজন ডজন মৃতদেহ বুনো লতা দিয়ে তৈরী মাদুরে জড়িয়ে জেলখানার ফটকের পাশের গর্ত দিয়ে বাইরে চালান করে দেওয়া হত। "মৃতদেহের গর্ত" কথাটা কারান্তরালে অশালীন গালাগাল বিশেষ। দৈহিক দিক দিয়ে দেখলে জিয়াও লিউকে কোনমতেই বলিষ্ঠ বলা চলে না। বিশেষ করে এমন একটা মারাত্মক ঋতুতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁকে আবার সুস্থ হতে দেখে খুব ভালই লাগল এবং আমরা একত্রে আর একবার উষ্ণ শারদীয়া সন্ধ্যা শান্তিপূর্ণভাবে উপভোগ করবো। কিন্তু আবার কয়েকদিন বাদে একটা দুর্ঘটনা ঘটল।

যে মুহূর্তে তিনি একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন সেই মুহূর্ত থেকে আবার জিয়াও লিউ কারাগারের বাইরে কোন একজনের সঙ্গে তাঁর গোপন যোগাযোগ পুনরায় চালু করে দিলেন। একদিন রাতে এক ভালোমানুষ ভারতীয় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পুলিশ আমাদের পাহারায় ছিলেন। তিনি আমাদের জন্যে পাঁচ প্যাকেট তামাক এবং জেলখানার বাইরের পরিস্থিতির উপর লেখা একটা দীর্ঘ চিঠি নিয়ে এসেছিলেন। ঠিক যে মুহূর্তে তিনি এই চিঠিটা জিয়াও লিউয়ের হাতে তুলে দিচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় অস্পষ্ট আলোয় আমরা সবাই দেখলাম যে সিঁড়ির বিপরীত দিকে সাদা চুনকাম করা দেওয়ালে একটা লোকের দানবীয় ছায়া। প্রত্যেকেই আন্দাজ করার চেষ্টা করি লোকটা কে? কেউ কেউ বলে সে একজন চীনা পুলিশ, পাঁচ তলায় পাহারা দেন, আবার অন্যেরা বলেন যে ও হচ্ছে রাতের টহল-

দারী এক ভারতীয় সার্জেন্ট। কিন্তু সে যেই হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না, কেননা আসল ঘটনা হচ্ছে এই যে এটা ফাঁস হয়ে গেল যে আমরা বাইরে থেকে জিনিষ পেয়ে থাকি। বৃটিশ পুলিশ শীঘ্রই চলে এসে তল্লাশী চালাবে। অতি সম্প্রতি রাতের সিফ্‌টে পাহারার দায়িত্ব নিয়েছে এক কুখ্যাত বৃটিশ রক্ষী নম্বর ২৭। আমার কক্ষসঙ্গী লাও ঝাংগ জিয়াও লিউকে বলেন তামাকটা নোংরা রাখার বালতিতে ফেলে চিঠিটা যেন সে লুকিয়ে রাখে। জেলখানার ভেতরে তামাক টাকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। "সাদা উকুন" বা অন্য কথায় উকুন সদৃশ একটু ছোট্ট তামাকের সাহায্যে যে কোন বন্দী গাদা গাদা ওষুধ, চাল ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ এমন কি শীতকালের জন্য সুতীর কম্বল পযন্ত কিনতে পারে। আমাদের মধ্যে কোন লোকের অসুস্থতার কিঞ্চিৎ উন্নতি করার জন্যে পাঁচ প্যাকেট তামাক যথেষ্টই। ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া অতিশয় দুঃখজনক হলেও আমাদের কাছে বিকল্প কিছুই ছিল না। সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হচ্ছে চিঠিটা লুকোই কোথায়? ওটাকে ছিঁড়ে নোংরা রাখার বালতীতে ফেলে দিতে আমরা কেউ চাই না কারণ ওটা এখনও আমাদের কারুর পড়া হয়নি। অপিচ, আমাদের বন্দীদের মাঝে সাদা কাগজ ভীষণভাবে নিষিদ্ধ। কেন না ওটা দৃষ্টি আকর্যক বস্তু। এটাকে নিরাপদে লুকিয়ে রাখার মত কোন জায়গাই নেই। সব কারাকক্ষই একই রকম দেখতে—যার তিনটে দেওয়াল কংক্রিটের গাঁথনির, এবং আরেকদিকে লোহার গরাদের ফটক। দেওয়ালে কোন ফাটল নেই, ঘরে কোন অন্ধকার কোণ নেই। কেউ কেউ আবার চিঠিটা ২০৫ নং কনেষ্টবলের হাতে ফিরিয়ে দিতে বলেন এবং আরও বলেন তিনি যেন চিঠিটা কিছু সময়ের জন্য লুকিয়ে রাখেন বা গারদের বাইরে সাময়িকভাবে কোথাও লুকিয়ে রেখে পরে একটা উপায় খুজে বার করেন। এটাও কিন্তু কোন কাজ হল না। কেন না প্রায়ই ভারতীয়দের খানাতল্লাশী চালানো হয়ে থাকে এবং কারাকক্ষের ভেতরে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে কিছু লুকিয়ে রাখা যেতে পারে। দেওয়াল, জানালা, দরজা এবং রেলিং সব একই রং-এর এবং ভিন্ন রং-এর যে কোন বস্তু অত্যন্ত প্রকটভাবে দৃষ্টিগোচর হবে। অন্যান্যরা প্রস্তাব দিলে এটা যেন জিয়াও লিউ ২০৫ নং কে ফেরত করে দেয় এবং ২০৫ নং যেন সেটা জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। যাই হোক জেলের বাহির ভিতর সব একই অবস্থা। দু জায়গাই আলোকিত হয় বৈদ্যুতিক বাল্বের সাহায্যে যেটা কোনদিন নেভানো হয় না এবং যেটাকে সারারাত ধরে বৃটিশ ও মার্কিণ

সেনারা পাহারা দেয়। পাঁচতলা থেকে একটা কাগজের গোলা নিচে পড়ছে এটা কারুর নজরে পড়বে না তা হতেই পারে না। আমরা সকলে মিলে মরিয়া হয়ে একটা রাস্তা খুঁজে বার করার কথা ভাবছি। কিন্তু এ ব্যাপারে যতই উদ্বিগ্ন হচ্ছি ততই আমাদের বিহ্বলতা বেড়ে যায়।

জিয়াও চেন উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, 'আমার কাছে ওটা চালান করে দাও, আমার কাছে চালান করে দাও।'

আহ্ জিন জিজ্ঞেস করে, "ওটা নিয়ে তুমি কি করবে?" তার সুমিষ্ট দৃঢ় কণ্টস্বর আম্‌তা আম্‌তা করছে।

"আমার সুতোর প্যাড দেওয়া কোটের হাতাটা ছিঁড়ে ফেলেছি। চিঠিটা আমায় দাও জল্‌দি।"

"কি বললে? গত বছর উত্তরের জেল খানায় কি ঘটেছিল তা কি ভুলে গেছ?"

আহ্ জিনের কথা শেষ হবার আগেই ২৭ নম্বরের পিশাচের মত দানবীয় ছায়া জিয়াও লিউ-এর ঘরের বাইরে উদয় হয়। তার পায়ে রবারের শুকতলা দেওয়া জুতো—এটা পড়া হয়ে থাকে এ ধরণের আচমকা অভিযানের সময়। যে তিনজন মোটাসোটা চীনা পুলিশ ও একজন রোগা দোভাষী তাকে অনুসরণ করে এলো তাদেরও পায়ে কাপড়ের শুকতলা দেওয়া জুতো—যাতে করে চলা ফেরা করার সময় কোন আওয়াজ না হয়। তারা জিয়াও লিউ-এর দরজা খুলে অনেক কষ্টে তার ঘরে প্রবেশ করে। কম্বলের খস্‌খসানি ও মেঝেতে মগ পড়ার শব্দ ভেসে আসে। চীনা পুলিশ দুজন জিয়াও লিউকে ঠেলতে ঠেলতে ঘরের বাইরে নিয়ে আসে। তার পা দুটোয় জুতো নেই, তিনি কি যেন একটা চিবোচ্ছেন ও তা গিলে ফেলার চেষ্টা করছেন।

"কথা বল্।" ২৭ নং ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে আসতে বিকৃত চীনা ভাষায় গর্জন করে ওঠে।

"কথা বল্।" ঘরের ভেতর থেকে তার পেছু পেছু বেড়িয়ে আসতে আসতে দোভাষীটি কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে বলে।

রাতের নিস্তব্ধতায় তাদের গর্জন আরও জোর, আরও পরিষ্কার, আরও ভীতিপ্রদ শোনাচ্ছে। ওরা কিন্তু জিয়াও লিউকে ভয় দেখাচ্ছে না। তিনি তখন কি যেন একটা কষ্ট করে গিলে ফেলার চেষ্টা করছেন। দোভাষীটি চীনা পুলিশ দুজনকে ওর হাত দুটো তাঁর পেছনে বাঁধার আদেশ দেয়। জোর করে তার মুখ খোলা হল;

এবং তাঁর বাঁ গালের ভেতর থেকে একটুকরো ভিজে কাগজ পাওয়া গেল। এটা হল সেই দীর্ঘ চিঠির অবশিষ্টাংশ। এটা নিয়ে ২৭ নম্বর বৈদ্যুতিক আলোর নিচে এসে পড়ার চেষ্টা করে। যে কটা শব্দ এখনও সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়নি তাও মুখের লালায় ভিজে অপাঠ্য হয়ে গেছে। ঐ টুকরো কাগজটা ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ২৭ নম্বর জিয়াও লিউকে হঠাৎ কষে এমন এক লাথি মারে যে তিনি উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে যান এবং তাঁর ফাকা মাথাটা শান বাঁধানো মেঝেতে স্নায়ুবিদারক শব্দ করে ধাক্কা খায়।

"কথা বল্! এ চিঠিটা কে এনে দিয়েছে?" জিয়াও লিউ-এর দিকে কটমট করে তাকিয়ে দোভাষীটি গর্জে ওঠে হিংস্রভাবে। ২০৫ নম্বরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে চুপচাপ শান্তভাবে চলে যায় অন্ধকার ঐ কোনটায়। কোন জবাব না পেয়ে দোভাষী একটু ঝুঁকে নরম স্বরে বলে, "সত্যি কথাটা বলে দিলে তোমায় আমি সাহায্য করবো। শপথ করে বলছি যে এর জন্য তোমায় শাস্তি দেওয়া হবে না।"

জিয়াও লিউ নিরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুকে যে জায়গায় আঘাত লেগেছে সেটা ঘসতে থাকেন। তাঁরা ওঁর দুটো হাত ধরে টেনে টেনে নিয়ে চলে নিচে। প্রচণ্ড রাগে আমাদের গলা এমনভাবে বুজে যায় যে আমরা নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। আমরা কি করবো তা বুঝতেই পারছিনা। ২০৫ নম্বর এদিকে এসে রুমাল দিয়ে তার চোখের জল মুছে আমাদের খবর এনে দেবার শপথ করে।

ভোর হবার কিছু পূর্বে জিয়াও লিউকে আবার ফেরৎ নিয়ে আসা হয়। তার সারা বুক জুড়ে কেবল কালো কালো দাগ আর তা বেশ ফুলে আছে। মুখ দিয়ে গলগল করে রক্তবমি হচ্ছে। পিঠটা তাঁর ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার হয়ে গেছে। তাঁর কক্ষসঙ্গী ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগাতে গিয়ে দেখে যে রক্তে ভিজে গিয়ে তাঁর সাদা সার্ট এমনভাবে কুঁচকির পেশীতে সেঁটে গেছে যে সার্টটা সড়ানো অসম্ভব ব্যাপার। মেঝেতে কম্বলের উপর উপুর হয়ে পড়ে আছেন তিনি; তাঁর গোঙানি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে।

২০৫ নম্বর নিম্নলিখিত খবর নিয়ে এল, প্রথম কয়েকবার চাবুকের ঘা খাবার পর জিয়াও লিউ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তারপর জলের ঝাপটা দিয়ে আবার তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হয়। তারা তাঁর কাছ হতে জানতে চেয়েছিল চিঠিটা কে বয়ে এনেছিল। যখন তা বলতে তিনি অস্বীকার করেন তখন ওঁরা আরও দুবার চাবুক চালায়। কাছে দাঁড়িয়ে থাকা

দুজন চীনা পুলিশের একজন বলে ওঠে, "আর মেরো না, তাহলে ব্যাটা পটলতুলে দেবে।" তাই তারা ক্ষান্ত দেয়। সংক্ষেপে এটাই ঘটেছিল।

সেদিন ১৯৩৩ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর। মাঝরাত পার হয়ে গেছে। আমার সেদিনের দৃশ্যটা পরিষ্কার মনে পড়ছে। ঠাণ্ডাটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে, যদিও শরৎকালের শেষদিক তাহলেও জানলার মধ্য দিয়ে রাতের বাতাস শীতলতা বয়ে আনছে। আমরা গায়ে কম্বল জড়িয়ে মেঝেতে পড়ে রয়েছি—এখনও জেগে। মাঝে মাঝে জানালার গরাদ পেড়িয়ে এক চিলতে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছি আলো ফুটছে কিনা। সকাল হলে আমরা জিয়াও লিউ-এর জন্য ওয়াংগ দংগ থেকে ডাক্তার আনাতে পারি। তিনি ভীষণভাবে আহত। অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছে। আমরা যেমন একটা আদর্শ বা একটা বিশুদ্ধ আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারিনা, ঠিক তেমনি ওঁকে বাদ দিয়ে আমরা কাজ চালাইতেই পারবো না। জানালার বাইরে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে, রাতের বাতাস আতঙ্কিত হয়ে যেন বিলাপ করছে। দূরের দীর্ঘমেয়াদী কারা কক্ষ থেকে হাত পায়ের কড়া বেড়ির ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ ভেসে আসছে। তার সঙ্গে মিশে আছে রাতের প্রহরারত প্রহরীর লম্বা হাই তোলার শব্দ এবং ঘুমন্ত বন্দীদের ক্ষীণ নাক ডাকার শব্দ। আমারও ঘুম ঘুম পাচ্ছে এবং সবে ঘুমিয়ে পড়বো ঠিক এই সময় কারাকক্ষের দেওয়ালে হঠাৎ ভীষণ জোরে করাঘাত। বিছানা থেকে তড়াক করে নেমে আমরা ছিট্‌কে দরজার দিকে গেলাম। যেন স্বপ্নালু অস্পষ্টতার মাঝে শুনলান কে যেন দেওয়ালের ওদিক থেকে বলছে, "জিয়াও লিউ মারা গেছেন।" এটা কি সত্যি হতে পারে? চোখ কচ্‌লে আরও মন দিয়ে কথাগুলি শোনার চেষ্টা করি। বেশ পরিষ্কার ভাবে শুনলাম পাশের ঘরে কে যেন জিয়াও লিউএর শেষ মুহুর্তের বর্ণনা দিচ্ছে। তিনি শেষ পর্য্যন্ত মনের দিক থেকে সজাগ ছিলেন। তিনি চেয়েছেন যে যখন কেউ এই কারাগার থেকে চলে যাবেন তখন তিনি যেন "বিপ্লবী পরস্পর সাহায্যকারী সংস্থা" মারফৎ তাঁর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী আহ ফেংগ এর কাছে এই সংবাদ পাঠান যে তাঁর স্ত্রী যেন দুঃখ প্রকাশ না করে, সাহসের সঙ্গে যেন বেঁচে থাকে, এবং সে যেন খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করে।

যে লোকটি কথাগুলি বলছিল সে পরিশেষে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, "শেষ মুহূর্তে জিয়াও লিউ আমাদের বলে গেছেন যে দুঃসময়ের বন্ধুদের জন্য কয়েকটা কথা ছাড়া অভিজ্ঞান হিসেবে কিছুই তাঁর রেখে যাবার নেই। তিনি আশা করেন যে জেল থেকে বেড়িয়ে আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাবো।

এবং যদি তাঁকে আমরা স্মরণ করতে চাই তাহলে তাঁর কথাগুলি স্মরণ করলেই চলবে, "সাম্যবাদের স্বার্থে জীবন উৎসর্গ করার অপেক্ষা মহত্তম কাজ আর কিছু হয় না।"

পরদিন সকালে একজন ভারতীয় সার্জেণ্টের নেতৃত্বে চারজন অপরাধী আসামী মৃতদেহ নিয়ে যেতে এল। শেষ বারের মত তাঁকে দেখতে আমরা দরজায় এসে দাঁড়ালাম। উনি শান্ত দৃঢ়ভাবে স্ট্রেচারে শুয়ে আছেন। একটা নূতন ধূসর রংএর সুতীর কম্বল দিয়ে তাঁর মাথা ও দেহটা ঢাকা; তার তলা থেকে তাঁর খালি পায়ের পাতা দুটি বেড়িয়ে রয়েছে। এইভাবে তিনি আমাদের কাছ হতে চিরকালের মত বিদ্বায় নিলেন। তাঁকে যথারীতি বুনো লতা পাতা দিয়ে তৈরী মাদুরে জড়িয়ে জেলখানার গর্তে রেখে দিয়ে রাতের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে। এইভাবে তিনি জাগতিক নরক ত্যাগ করে চলে গেলেন।

রাত হয়েছে; এখন তাঁকে গর্ত থেকে টেনে বার করার সময়। কাছাকাছি কক্ষের বন্দীরা পরামর্শ দিলেন একটা স্মরণসভা ডাকার। এই প্রস্তাবটি একজন ট্রটস্কিপন্থী বন্দী ছাড়া—যিনি মনে করেন এ সব কিছুই অর্থহীন, সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। তাকে কেউ পাত্তাই দিল না। প্রত্যেকেই আলোচনা করতে ও পরিকল্পনা ভাবতে লেগে গেলেন। মাঝের কক্ষের বন্দীকে সভাপতি করা হল; প্রান্তীয় কক্ষ দুটি যথা এক নম্বর ও ৪৬ নম্বর কক্ষের বন্দী দুজনকে সতর্ক নজর রাখার দায়িত্ব দেওয়া হলো। যদি বৃটিশ প্রহরী আসে তাহলে দেওয়ালে ধাক্কা দিয়ে সাবধান করে দেবে তারা। একটা কক্ষ অন্তর অন্তর টেলিফোন স্টেশন করা হল, তারা যে কোন রিপোর্ট ও বক্তৃতা সমগ্র বাড়ীটায় পাঠিয়ে দিতে প্রস্তুত। সভাপতির স্মৃতি সংক্রান্ত বক্তৃতার পর, আর আহ্ জিন শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনীর উপর বক্তব্য রাখলেন। জিয়াও লিউ-এর প্রকৃত পদবী ছিল ইয়াংগ। তাঁর প্রথম নাম ছিল আহ এর্। তাঁর নিজ বাড়ী ছিল ক্রজিয়াংগ প্রদেশের নানসিতে। ১৯২৭ সালের ১২ই এপ্রিল সাংহাইএর কেচেইতে চিয়াংকাই-শেক যে হত্যালীলা সংঘটিত করে তাতে তাঁর ভাই আহ্গুইকে হত্যা করা হয়। জিয়াও লিউ এর অনুমান যে এই ঘটনা তাঁকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করে। এই ঘটনা তাঁকে জানিয়ে দেয় জীবনটা নিয়ে তিনি কি করবেন, তিনি যখন পশ্চিম সাংহাইতে "রি হুয়া কর্পোরেশন মিলে" অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন সে সময় ১৯২৮ সালে শ্রমিক নিরাপত্তা গোষ্ঠীতে যোগদান করায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন তাঁর বয়স খুব কম; মাত্র

১৬ বৎসর। তখনও পর্যন্ত "প্রজাতন্ত্রকে বিপন্ন করার বিরুদ্ধে আপৎকালীন আইন"-এর আবিষ্কার হয়নি। সুবিধেভোগী এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে তাঁর দুমাসের কারাদণ্ড হয়। পরে দুবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। প্রথমবার তাঁকে জেলে থাকতে হয় এক বছর ; কিন্তু শেষবারে তাঁর পাঁচ বছরের জন্য সাজা হয়। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আহ জিন বলে চলেন, "এ সবই তাঁর যৌবনের গল্প। শেষবার কয়েদবাসের খুব অল্প দিন পূর্বেই তিনি এক মহিলা মিল শ্রমিকের সাথে একসাথে বাস করতে সুরু করেন— তাঁর নাম আহ্ ফেংগ। এ ঘটনা ঘটে তাঁর পুনর্বার গ্রেপ্তার হবার মাত্র আটদিন আগে। ওঁরা পরস্পরকে ভীষণ ভালোবাসতেন। এখনও পর্য্যন্ত তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে প্রতি তিন মাস অন্তর আসতেন, সব সময়ই কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলে যেতেন তাঁর জন্য তিনি সারা জীবন অপেক্ষা করবেন। এখন তিনি জিয়াও লিউকে আর কখনও দেখতে পাবেন না। ইংগ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের পা চাটা চীনা কুকুরের দল তাঁকে বারবার বন্দী করেছে এবং শেষকালে চাবুক মেরে হত্যা করেছে।" "কমরেডস্" উত্তেজনায় আহ্ জিনের গলা কাঁপছিল। "এই নৃশংসতা যেন ভুলে না যাই। আমরা আমাদের কমরেড, সহযোদ্ধা, আমাদের প্রিয় জিয়াও লিউকে কখনও ভুলবো না।"

আহ্ জিনের পর আরও কয়েকজন বলেন, পরিশেষে লাও ঝেংগ বলতে সুরু করেন। পাঁচতলার নীচে থাকা সব অপরাধী বন্দীরা জানতো যে আমরা একটা স্মরণসভা করছি। অংশত অনুসন্ধিৎসা বশতঃ অংশত সাধারণ সহানুভূতি বশতঃ তারা বক্তাদের জোরে বলতে বলে যাতে করে তারাও শুনতে পায়। অতএব লাও ঝেংগ তাঁর প্যাড দেওয়া সুতীর কোটের বোতাম খুলে দেন এবং দরজার গরাদ দুটো দুহাতে ধরে নেন এবং নিজেকে সম্পূর্ণ শান্ত রাখার প্রচেষ্টায় ঠোঁট দুটো দৃঢ়ভাবে চেপে রাখেন। তিনি জোরে জোরে কয়েকটি কথার পর থেমে থেমে সহজ চীনা ভাষার বলে চলেন, "আমার অত্যাচারিত সাথীরা সব, আমার নীচের তলা ও উপর তলার অত্যাচারিত সাথীরা সব!! যিনি এইমাত্র মারা গেলেন তাঁকে চাবুক মেরে হত্যা করেছে ২৭ নম্বর। ওঁকে মারা যাওয়া তক্ চাবকানো হয়। আমাদের সকলের জানা আছে নিশ্চয়ই যে বলিষ্ঠ মানুষেরাই এরকম চামড়ার চাবুকের চারবার আঘাত সহ্য করতে পারে। যদিও তিনি অসুস্থ ছিলেন তবুও তিনি চারবার সে আঘাত সহ্য করেছিলেন।"

চীৎকার করে কথা বলার ফলে তার কণ্ঠস্বর ফ্যাঁস ফ্যাঁসে হয়ে গেলেও তিনি বলে চলেন :

"আজকে ওরা তাঁকে হত্যা করেছে। কালকে আমাদের যে কেউ ওদের শিকার হতে পারি।"

এই কথা নিচের তলার বন্দীদের অন্তরে গিয়ে আঘাত করে। ওরা বেশ মন দিয়ে এসব কথা শোনে এবং বেশ শান্ত থাকে যখন তিনি বলে চলেন :

"যতক্ষণ আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকবো ততদিন ভয় পাবার কিছু নেই, আমরা সংখ্যায় আট হাজারের বেশী লোক আর ওদিকে অসাধু বিদেশী লোকের সংখ্যা চল্লিশেরও কম, আর ২০০০ এর উপর যে চীনা ও ভারতীয় পুলিশ রয়েছেন তাঁরা সবাই আমাদের পক্ষে। আপনাদের সকলের জানা আছে যে ১৯৩০ সালের শীত কালে আমরা যখন অনশন ধর্মঘট করেছিলাম তখন পুলিশরাও ধর্মঘট করে।"

যখন ২০৫ নম্বর এটা শোনে তখন সেদিনের সব ঘটনা তাঁর মনে পড়ে যায় এবং তখন সে এত বিচলিত হয়ে পড়ে যে চোখ জলে ভরে যায়, সে তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে জানালার বাইরে অন্ধকার দেখার ভাণ করে। লাও ঝেংগ বলে চলেন :

"সাথী অত্যাচারিত ভাই এরা, পুনরায় আমায় বলতে দেন যে যতক্ষণ আমরা একসঙ্গে আছি ততদিন আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। অপিচ সবচেয়ে যা ঘৃন্য ব্যাপার তাহলো সর্বত্র পা চাটা কুকুরে ভরে গেছে। তারা এসে জোটে বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন সাইজে। ওদের জন্যই জিয়াও লিউ মারা গেলেন। আমাদের সকলের নিশ্চয় মনে আছে সে রাতে দেওয়ালের কালো ছায়া। তাছাড়া, আসলে জেলের অভ্যন্তরে আমাদের সকলের সঙ্গে এইসব গোয়েন্দাদের ছেড়ে দিয়েছে।

তাঁর বক্তব্য শত্রুপক্ষের দালালদের বিরুদ্ধে এক সাধারণ ঘৃণা জাগ্রত করে সকলের মনে। রাগে গর্জন করে ওঠে জনগণ : "গুপ্তচরেরা নিপাত যাক্", "বিশ্বাসঘাতকেরা নিপাত যাক্।" সমস্ত বাড়ীটাই বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিক্ষোভের মধ্যেই দুটি ঘটনা ঘটে যায়, ছতলার ট্রটস্কীবাদি যে লোকটি স্মরণসভায় বিরোধিতা করেছিল তার কক্ষসঙ্গী তার গালে চপেটাঘাত করে। শত্রুপক্ষের দালাল যে লোকটা গাঁজার চোরাচালান করতে গিয়ে পাঁচতলায় বন্দী জীবন যাপন করছে সে ভীষণ গালাগাল সহ প্রচণ্ড মার খায়, তার গোঙানির আওয়াজ ছতলা থেকেও শোনা যাচ্ছিল।

বিক্ষোভ কিছুটা কমতে লাও ঝেংগ বলে চলেন, "সাথী অত্যাচারী ভায়েরা! সবশেয়ে আমার একটা কথা বলার আছে। আমরা যারা জেলে রয়েছি তাদের এই ঘৃণা স্মরণে রাখতেই হবে। শুধু যে আমরা পা চাটা কুকুরদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো তা নয় এখান থেকে বেড়ুনোর সাথে সাথে বিপ্লবের স্বার্থে লড়াই চালিয়ে যাবো এবং বৃটিশ মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদীদের হঠিয়ে দেবো। আমাদের অনেক কিছু করতে হবে, অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে। আমরা যেন পরিষ্কার মনে রাখি.........।"

"মাতালটা আসছে", নিচের তলা থেকে কে একজন বলে এবং লাও ঝেংগ-এর বক্তৃতা বাধা পায় পাশের ঘরের একজন দেওয়ালে করাঘাত করে তাঁকে সতর্ক করে দেয় কিন্তু লাও ঝেংগ শান্তভাবে বলে চলেন ঃ

"আমরা যেন জিয়াও লিউ-এর মৃত্যুকালীন কথাটা না ভুলি।"

আমাদের ঠিক দরজার সামনে এসে হাজির হয় তাঁর দলবলসহ ২৭ নম্বর। দরজা খুলে ঘরের ভেতর থেকে লাও ঝেংগকে টেনে বার করে আনে। ২৭নং তার আঁটো প্যান্টের থেকে ছোট লাঠিটা বার করে; কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে, তার লাঠি তোলার পূর্বেই তার অতবড় বিশাল দেহটা বারান্দার মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। লাও ঝেংগই প্রথম ঘুঁসি চালান। তিনি বক্সিং শিখে ছিলেন। তাই সহজাত প্রবৃত্তি থেকে, কোমরের নীচে তিনি এমন এক জায়গা লক্ষ্য করে ঘুঁসি চালান যেখানে আঘাত পেলে ক্ষতি হতে পারে। একজন চীনা পুলিশ তাঁর উচ্চতর অফিসারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলে তার দুজন সহকর্মীর অর্থপূর্ণ চাহনির ফলে থেমে যায়। দোভাষীর মুখ ত শুকিয়ে আম্‌সি। সে ছিটকে সিঁড়ির দিকে চলে গিয়ে গর্জন করতে করতে পালায়, "দাঙ্গা, কমিউনিষ্ট ডাকাতেরা দাঙ্গা বাঁধাচ্ছে।" ২০৫ নম্বর বারান্দার শেষ প্রান্তে তার পথরোধ করে দাঁড়ায় এবং তার অস্থিচর্মসার কাঁধ দুটো শক্ত করে ধরে ভীষণ জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে অত হৈ চৈ করতে বারণ করে। ২৭ নম্বর মেঝে থেকে উঠে হাতের ছোট লাঠি ফেলে পিস্তলের কালো নলটা আমাদের দিকে তাক্ করে দাঁড়ায়। আমরা সবাই চোখ বন্ধ করে গুলি ছোঁড়ার অপেক্ষায় রয়েছি। কিন্তু সব নিরব ২৭ নম্বর সঙ্গে করে গুলি আনতে ভুলে গেছে। এই অসতর্কতার কারণ হলো এই যে তারা আট হাজার বন্দীকে কেবলমাত্র একটা ছোট লাঠির সাহায্যে সামলাতে অভ্যস্ত এবং এটাও তারা মনে করে যে ২৭ নম্বরের শরীরে এত বেশী ক্ষমতা যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার কোন মানেই হয় না। এই বারেই কেবল তাকে

অসতর্ক অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাহলেও সে পাগলের মত লাও ঝেংগ-এর দিকে তেড়ে গেলে অন্য পাঁচ ছটা কক্ষ থেকে মগ উড়ে এসে তার ঘাড়ে পড়ে—একটা ত তাঁর বাঁ চোখে এসে লাগে। উড়ে এসে পড়ে তরল আবর্জনা রাখার বালতির ঢাকনাটাও। উপর ও নিচতলার কয়েকশ বন্দীর প্রচণ্ড চীৎকারে ও তাঁদের দেওয়ালের করাঘাতের আওয়াজে লোহার গরাদ সহ বিশাল বাড়ীটা কাঁপছে। দুহাতে মাথা চেপে ধরে ২৭ নম্বর তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দিকে চলে যায়। এই পাগলামির জোয়ার বেশ খানিকক্ষণ ধরে চলে। এর সঙ্গে মিশে থাকে একটা চাপা ফোঁপানি। লড়াই সুরু হয়ে গেছে। এ লড়াই হচ্ছে নতুন ও পুরানো ঘৃণার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার মরণপণ লড়াই। জেলের লোহার গারদের বিরুদ্ধে লৌহ দৃঢ় আকাংখার লড়াই। বহু বছর ধরে ভোগ করে আসা বেদনা ও বিমর্ষতাকে এ লড়াই সম্পূর্ণ ভাবে নির্বাপিত করে দেয়। এ লড়াই জনগণকে খুশী করে; তাদের চোখে আনন্দাশ্রু এনে দেয়। সে রাতের সিফটের পুলিশেরা নিরপেক্ষ থাকে এবং গোলমাল এড়াতে—বন্দুক প্রস্তুত রেখেও গুলি চালাতে সাহস না পেয়ে—বৃটিশ ও মার্কিন প্রহরীরা তাদের প্রহরী কুঠরীতে ফিরে যায়। ২০৫ নম্বর এত উত্তেজিত যে সে চোখের জলে সারা মুখ ভাসিয়ে বারান্দায় খানিক এদিক ওদিক ছুটে বেড়ালো। ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল শূন্যে তুলে সে আমাদের বলে চলে:

"মাদ্রাজ! মাদ্রাজ! ভারতেও ঠিক এই ধরণের আন্দোলন চলছে।"

"চুপ করুন! একটু চুপ করুন সব!" ফ্যাঁস ফ্যাঁসে গলায় আহ্ জিন বলেন বিক্ষোভ শান্ত করার প্রচেষ্টায়। তিনি কয়েকবারই চেষ্টা করেন কিন্তু সফল হন নি। শেষ গোলমালের স্বাভাবিক বিরতির সুযোগ নিয়ে লাও ঝেংগ এর অনুকরণ করে কয়েকটা কথার পর থেমে থেমে তিনি বলেন:

"অনুগ্রহ করে শুনুন, সবাই শুনুন। বিদেশী বদমায়েসরা আবার ফিরে আসবে। তারা আসবে আমাদের মাঝ থেকে কাউকে না কাউকে বেছে নিতে, সেজন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে। ওরা এসে যদি আবার মারধোর করে ত আমরা আবার অনশন ধর্মঘট চালাবো।"

"খুব ভাল কথা! তাহলে অনশন ধর্মঘটই চল্‌বে।" উপরও নীচ সব জায়গা এক সাথে গর্জে ওঠে। লড়াই-এর এই শেষ পদ্ধতি তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় তারা ভীষণ উত্তেজিত। বিরাট গর্জনের পর পাগলের মত হাততালি। কেউ কেউ আবার কাঠের চটি দিয়ে লোহার গরাদে

ঠুকছে। কেউ কেউ আবার তাদের ভাঁজ করা কম্বল দিয়ে মেঝে চাপড়াছে —তার শব্দ শুনে মনে হচ্ছে দূরে কোথাও কামানের গর্জন হচ্ছে।

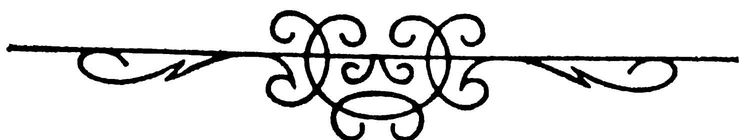
কেউই জানে না কি কারণে—স্টাফের অপর্যাপ্ততার কারণে না "সভ্য আচরণের" ভান করতে—প্রশাসন পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে আগ্রহ প্রকাশ করে। সেদিন বিদেশীরা কেউই তাদের চেহারা দেখালো না, আর অফিসেও কিছু ঘটলো না। লাও ঝেংগ যখন নিজের গারদে ফিরে এলেন তখন তাঁকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। লোহার ফটকের ঠিক পাশটিতে হাঁটুতে কনুইয়ে ভর দিয়ে দুহাতে মাথা চেপে কম্বলে বসে পড়েন। তাঁকে বেশ বিষণ্ণও হতাস দেখাছিল—এটা তাঁর বলিষ্ট চেহারার বিপরীত। যখন নিচতলার কয়েদীরা গর্জন করে উঠ্‌লেন "কমিউনিষ্ট পার্টি দীর্ঘজীবী হোক" শ্লোগানে এবং আন্তর্জাতিক গানের পবিত্র সুরে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল তখন কিন্তু তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। অন্যান্যরা যখন কাঁদে তখন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ বলিষ্ঠ মানুষ সারারণতঃ বিচলিত বোধ করেন না। এখন কিন্তু তিনি লোহার গারদের পাশে দুহাতে মাথা চেপে ধরে বসেন; টপ টপ করে তাঁর চোখের জল মেঝের উপর একচিল্‌তে আলোর উপর পড়ছে। পাছে কেউ তা দেখে ফেলে তাই তিনি দ্রুত পা দিয়ে সেটা ঢেকে দেন। আমাদের বেশ ভালো করেই জানা আছে যে তাঁর এই অশ্রুজল হচ্ছে দুঃখ ও কৃতজ্ঞতার প্রতীক স্বরূপ। তিনি দুঃখিত কারণ তিনি একজন ভালো কমরেড হারিয়েছেন এবং চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি হারিযেছে এক ভালো যোদ্ধা। তিনি কৃতজ্ঞ কেননা সাধারণ অপরাধীরাও সংগ্রামে আমাদের পক্ষে এসে গেছে। অপিচ, প্রতিটি ব্যর্থতা, প্রতিটি মৃত্যুই ফলপ্রসূ হবে। যে মুহূর্তে আরও বেশী বেশী করে মানুষ গানে অংশ গ্রহণ করলো ঠিক তখনই তিনি আমায় কোন জিনিষ নেবার জন্যে হাত পাততে বলেন এবং একটা আধ ছেঁড়া জুতো আমার হাতে চালান করে দেন। জুতোটা চিনতে পারলাম—ওটা জিয়াও লিউ-এর। তিনি আমাদের সঙ্গে এই জুতো পরেই দুঃখ ও ক্ষুধার অসংখ্য দিনগুলো কাটিয়েছেন। এই জুতো পায়ে দিয়ে তিনি গ্রীষ্মকালে আমাদের সাথে কত ওটা নামা করেছেন। হঠাৎ আমাদের মনের ভেতর দিয়ে সেই ছবিটা ভেসে উঠল—তিনি যেন স্ট্রেচারে শুয়ে আছেন, সুতীর কম্বলের ফাঁক দিয়ে তাঁর খালি পা দুটো বেরিয়ে আছে। সত্যিই কি এই দেহটা তাঁর। মনে হল তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা কথা বলছি, কথা বলছি সকাল সম্বন্ধে—এ এমন একটা সকাল যখন আমরা কাঁদতে পারি না, আর কাঁদার কোন কারণই যখন আর

থাকছে না। তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। তাঁর বেগুনি পাণ্ডুর মুখে মৃদু হাসি। কতক্ষণ শূন্যে তাকিয়ে ছিলাম মনে নেই তবে আরেকবার জুতোটা নজর করতেই আবিষ্কার করি কয়েদীদের পোষাকের হাতার থেকে ছেঁড়া এক টুকরো কাপড়—তাতে বড় বড় অক্ষরে কি যেন সব লেখা। এটা লেখা হয়েছে তাজা রক্ত দিয়ে। জিয়াও লিউ তাঁর ডান হাতের মধ্যাঙ্গুলি দাঁত দিয়ে কামড়ে রক্ত বার করে দেয়। রক্তে লেখা অক্ষর সব চকচক করছে। কিন্তু আমাদের চোখ জলে ভরা। তাই অনেক প্রচেষ্টার পর পাঠোদ্ধার করতে পারি যে এটাই জিয়াও লিউ এর শেষ বাণী।

"সাম্যবাদের স্বার্থে জীবন উৎসর্গ করার অপেক্ষা মহত্তম কাজ আর কিছু হয় না।"

"স্মরণসভার শেষে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত চলাকালীন এই লেখা সহ জুতোটা চালান করে দি ধীরে ধীরে যথাযথ মর্য্যাদার সঙ্গে এক গারদ থেকে পরের গারদে, এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তিকে এবং এইভাবে ঐ ছতলা বিশাল বাড়ীটার সমগ্র নির্দোষ জীবিত আত্মার কাছে।

লেখক—ঝাউ লিবো



"পদ্মঝিল"

১৯৪০ সালের গ্রীষ্মকালের কোন এক রাত। আকাশে চাঁদ উঠেছে। উঠোনটাকেই আমোদিত সতেজ ও স্বচ্ছ দেখাচ্ছে। সারাটা সকাল ধরে যে সব নলখাগড়া ভেঙ্গেছে সেগুলো এখন ভিজেভিজে ও নমনীয় হয়ে মাদুরে পরিণত হবার অপেক্ষায় রয়েছে। এক যুবতী বৌ উঠোনে বসে তাঁর চটপটে কোমল আঙ্গুলের সাহায্যে সেগুলো দিয়ে বিনুনি বানিয়ে চলেছেন। নলখাগড়া'র সূক্ষ্ম পাতলা আঁশ সব তাঁর বাহুতে জড়িয়ে যাচ্ছে।

হেবেই প্রদেশের ঠিক মাঝখানে বৈয়ানংগদিয়ান হ্রদ অবস্থিত এবং সমগ্র চীনে সে পরিচিত তার নলখাগড়ার বনের জন্য। এটা সঠিকভাবে বলা যাবে না কতটা এলাকা জুড়ে তার অবস্থান বা সারা বছরে তার কত উৎপাদন। তবে যেটুকু আমাদের জানা আছে তাহলো প্রতি বছর যখন নলখাগড়ার ফুল মৃদু বাতাসে আন্দোলিত হয় এবং তার পাতা সব হলদে হয়ে যায় তখন সব ফসলটাই কেটে বৈয়ানংগদিয়ান হ্রদের চতুর্দিকের মাঠ জুড়ে বিরাট প্রাচীরের মত নলখাগড়া গাদা করে রাখা হয়। খ'মার বা উঠোনে বসে মেয়েরা মাদুর বোনে—রূপালী রংএর তুষার শুভ্র সব অনেক অনেক মাদুর। জুন মাসে ঝিলে জল বাড়লে অসংখ্য জাহাজ সেগুলো বয়ে নিয়ে যায় সহরে, গ্রামে। সমগ্র দেশটা তখন ভরে যায় সুন্দর নক্সা করা সূক্ষ্মভাবে বোনা অসংখ্য মাদুরে।

"বৈয়ানংগদিয়ানের মাদুর হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।" কথাটা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণিত সত্য।

উঠোনে, অনেকটা বোনা হয়ে যাওয়া লম্বা মাদুরে বসে যুবতী বৌটা সেই মাদুরটাই বুনে চলেছেন—তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি যেন বিশুদ্ধ বরফের মত বা পশমের মত মেঘের সিংহাসনে বসে আছেন। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তিনি ঝিলটা একবার দেখে নিচ্ছেন—সেটাও আর একটা

রূপার মত শুভ্র জগৎ। জলের উপর হাল্‌কা অস্বচ্ছ কুয়াসা, তাজা পদ্মপাতার গন্ধে বাতাস ম ম করছে।

বাড়ীর দরজাটা খোলা এখনও। ওঁর স্বামী এখনও বাড়ী ফেরেননি।

অনেক দেরী করে ওঁর স্বামী সেদিন বাড়ী এলেন। তিনি একজন ২৫।২৬ বছরের যুবক। তাঁর মাথায় একটা বড় খড়ের টুপি। গায়ে দাগহীন সাদা সার্ট আর হাঁটু অবধি গোটানো কালো প্যাণ্ট। ওঁর নাম সুসেংগ। পা খালি। তিনি লেসার স্বীড গ্রামের জাপ-বিরোধী গেরিলা বাহিনীর প্রধান এবং সেখানকার কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান। তিনি তাঁর দলবল নিয়ে জেলা সহরে গিয়েছিলেন মিটিং-এ যোগ দিতে। তিনি বাড়ী ঢুকতেই ওঁর স্ত্রী মুচকি হেসে তাঁর দিকে তাকাল।

"এত দেরী হল যে?"

স্বামীর জন্যে কিছু খাদ্য আনতে তিনি উঠে দাঁড়ান। সিঁড়ির ধাপে সুসেংগ বসে পড়েন। বলেন, "বাদ দাও, খেয়ে এসেছি।"

যুবতীটি আবার মাদুরে বসে পড়েন। স্বামীর মুখ চোখ লাল; তিনি হাঁপাচ্ছেন।

"আর সব কৈ?" উনি জিজ্ঞেস করেন।

"ওরা এখনও সহরে। বাবা কেমন আছেন?"

"ঘুমুচ্ছেন।"

"আর জিয়াও হুয়া?"

"সে তার দাদুর সংগে বাগ্‌দা চিংড়ী ধরতে অর্ধেক দিন কাটিয়ে ঘণ্টা খানেক হল ঘুমিয়েছে। আচ্ছা আর সব এখনও ফিরলো না কেন?"

সুসেংগ জোর করে হাসেন।

"কি হয়েছে বলো তো?"

"আগামীকাল আমি সেনাদলে যোগ দিচ্ছি।" তিনি ধীরে ধীরে বলেন।

তাঁর স্ত্রীর হাতটা বারেক সংকুচিত হয়—যেন নলখাগড়ায় তাঁর হাত কেটে গেছে এবং একটা আঙ্গুল চুষতে সুরু করে দেন।

"আজকের মিটিংটা ডেকেছিল জেলা কমিটি। ওরা বললে যে খুব তাড়াতাড়ি জাপানীরা আরও বেশী ঘাঁটি গড়ার চেষ্টা করবে। এখান থেকে আর মাত্র কয়েক ডজন লি দূরে ওরা টংগকৌতে যদি ঘাঁটি করতে পারে ত এখানকার চিত্রটা সম্পূর্ণ বদলে যাবে। মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে জাপানীদের রুখতে জেলা ব্রিগেড গড়তে হবে। আমিই প্রথম বাহিনীতে যোগ দিতে রাজী হয়েছি।

ওঁর স্ত্রী মাথা নত করে বিড়বিড় করেন ঃ

"সব সময় অন্যান্যদের চেয়ে আগে যাওয়া চাই—তাই না ?"

"আমাদের গ্রামের গেরিলা বাহিনীর আমি প্রধান এবং পার্টি কর্মীও। সব কাজ প্রথমে আমায় করতেই হবে। অন্যেরাও স্বেচ্ছাসৈনিক হতে চেয়েছে। তারা বাড়ী ফিরতে সাহস পায়নি, পাছে তাদের ঘরের লোকেরা আটকে দেয়। তারা আমায় মনোনীত করে বলে যে আমি গাঁয়ে ফিরে তাঁদের পরিবারকে তাদের হয়ে সব ব্যাপারটা যেন বুঝিয়ে বলি। ওঁরা সকলেই মনে করেন যে বেশীর ভাগ বৌ-এর থেকে তোমার জ্ঞানগম্যি একটু বেশী।"

ওঁর স্ত্রী নিরবে একথা হজম করেন।

বৌ সঙ্গে সঙ্গে বলেন, "বাধা তোমায় আমি দেব না। কিন্তু আমাদের কি হবে ?"

সুসেংগ বাবার ঘরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে তার বৌকে গলার স্বর নামিয়ে কথা বলতে বলেন।

"স্বভাবতঃই তোমায় দায়িত্ব নিতে হবে। আমাদের গাঁটা কিন্তু ছোট এবং এইবার আমরা সাতজন সেনাদলে যোগ দিচ্ছি। ফলে ঘরে থাকার মত বেশী যুবক পড়ে থাকবে না। সব কিছু কাজের জন্য অন্যের উপর আমরা ভরসা করতে পারি না। মুল বোঝাটা তোমার ঘাড়েই পড়বে। বাবার বয়স হয়েছে। আর জিয়াও হুয়ারও বেশী কাজ করার মত বয়স হয় নি।

যুবতী বৌ-এর মনে হল তাঁর গলায় কি যেন আটকে গেছে। জোর করে চোখের জল তিনি ধরে রাখেন।

"আমরা কিসের বিরুদ্ধে লড়াই করছি সেটা জানলেই যথেষ্ট হবে।"

সুসেংগ তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন কিন্তু সময় তাঁর অল্প; যাবার আগে তাঁকে আরও অনেক কিছু করে যেতে হবে।

"যতদিন আমি থাকবো না, ততদিন সব দায়িত্ব তোমার। জাপানীদের যখন আমরা হঠিয়ে দেব তখন ফিরে এসে তোমার কাছ থেকে আবার দায়িত্ব বুঝে নেব।"

এই কথা বলে তিনি আবার ফিরে এসে তাঁর বাবাকে বোঝানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে কয়েকজন প্রতিবেশীর বাড়ী চলে গেলে।

তিনি বাড়ী ফিরলেন ভোরে কাক ডাকার সময় তাঁর যুবতী বৌ এখনও উঠোনে স্ট্যাচুর মত বসে আছেন অপেক্ষা করে।

"আমার জন্যে তোমার কোন নির্দেশ আছে?" তিনি জিজ্ঞেস করেন।

"আসলে তেমন কিছু নেই। আমি যখন থাকবো না তখন কিন্তু তোমার পড়াশুনায় উন্নতি করতে হবে। খুব পরিশ্রম করে লিখতে শিখো।"

"আহা! তারপর !!"

"অন্যদের পেছনে পড়ে থেকো না।"

"আহা! তারপর !!"

"কোন জাপানী বা বিশ্বাসঘাতক কেউ জ্যান্তো তোমায় যেন বন্দী করতে না পারে। আর যদি ধরাই পড়ে যাও ত আমৃত্যু লড়াই চালিও।" এইটাই ছিল তাঁর প্রধান ব্যাপার তাঁর স্ত্রীকে বলার। তাঁর স্ত্রী চোখের জলে সম্মতি জানায়।

"সকাল হলে তিনি একটা নোতুন সুতীর সুট, একজোড়া কাপড়ের জুতো, নতুন তোয়ালে দিয়ে একটা পুঁটলি তৈরী করেন। অন্যান্য বৌরাও ঐ একই ধরণের পুঁটলি তৈরী করেন—যেগুলো সুসেংগ নিয়ে যাবেন। সমগ্র পরিবারটাই তাঁকে বিদায় জানায়। জিয়াও হুয়ার হাত ধরে তাঁর বাবা তাঁকে বলেন;

"সুসেংগ তুমি সঠিক কাজই করতে চলেছ তাই বাঁধা দেব না। খুসী মনে যাও। তোমার বউ ও ছেলের উপর নজর রাখবো—চিন্তা করো না।"

তাঁকে বিদায় জানাতে সব পুরুষ, নারী, বুড়ো, যুবা, মানে সমগ্র গ্রাম চলে এসেছে। তাদের সকলের প্রতি হেঁসে নৌকায় চড়ে সেটা ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু জড়িয়ে থাকা দ্রাক্ষালতার মত কোন একটা কিছু সবসময় মহিলাদের মধ্যে আছে। সুসেংগ চলে যাবার দুদিন বাদে কোন কিছু নিয়ে আলোচনার জন্য চারজন যুবতী বৌ তাঁর বাড়ীতে জড়ো হন।

"আপাত ভাবে আমার মনে হয় ওরা এখানেই আছে। ওরা এখনও কোথাও যায়নি। ওর কাজের অন্তরায় আমি হতে চাই না, তবে ওকে না একটা জামা দিতে ভুলে গেছি।"

"আমার ওকে একটা জরুরী কথা বলতে হবে।"

সুসেংগ-এর বৌ বলেন:

"শুনেছি টংগকোতে জাপানীরা একটা ঘাঁটি গড়তে চায়।"

"ওদের মধ্যে ঢুকে পড়ার কোন সম্ভাবনাই আমাদের নেই—যদি আচমকা চলে যাই তাহলেও না।"

"আমি যেতে চাই না, তবে আমার শ্বাশুড়ি জেদ ধরেছেন যে আমার ওঁর সাথে দেখা করা উচিত। কি কারণে? সেটাই জানতে চাই।"

কাউকে কোন কথা না বলে ছোট্ট একটা নৌকা নিয়ে ঐ চার বৌ নিজেরাই দাঁড় বেয়ে নদীর অন্য পাড়ে 'মা' গ্রামে গেলেন।

সেখানে তাঁদের বলা হয় যে, "ওঁরা এইমাত্র ওখান থেকে চলে গেছেন। গত সন্ধ্যাতেও ওঁরা ওখানে ছিলেন। কিন্তু রাতে কোন এক সময় চলে গেছেন। কোথায় গেছেন?—কেউ জানে না। যাই হোক তোমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই; শুনলাম সুসেংগ সরাসরি প্লেটুনের উপনেতা হয়েছেন। সকলের বেশ দৃঢ় উৎসাহ রয়েছে।"

লজ্জায় লাল হয়ে মেয়েরা ওদের কাছ হতে বিদায় নিয়ে দাঁড় বেয়ে নৌকা নিয়ে ফিরে চললেন। প্রায় দুপুর বেলায়; আকাশে কোন মেঘ নেই। ধানক্ষেত আর নলখাগড়ার বন থেকে ভেসে আসা বাতাস নদীর উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। অসীম জলের উপর একটা মাত্র নৌকা তরল পারদের মত ভেসে চলেছে।

হতাশায় ও মনমরা হয়ে প্রতিটি মহিলা সমস্ত দোষটা মনে মনে তাদের স্বামীদের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার উপর চাপিয়ে দেন। কিন্তু তরুণ যুবকরা যেমন ভীষণ আশাবাদী হয় তেমনি মহিলাদেরও নিজেদের দুঃখ কষ্ট দ্রুত ভুলে যাবার প্রবণতা দেখা যায়। তাড়াতাড়ি তাঁরা নিজেদের মধ্যে খোস গল্পে ও ঠাট্টা তামাশায় মেতে ওঠেন।

"সুতরাং তাঁরা এখানে এলো আর গেল।"

"আমি তোমাদের হলফ করে বলছি ওরা সাধ মিটিয়ে মজা করে নিচ্ছে। ওদের কাছে এইসব কাজ নববর্ষ বা বিয়ে হবার থেকেও বেশী মজার।"

"ওরা হচ্ছে বনের ঘোড়া; কিছুতেই আস্তাবলে বাঁধা থাকতে রাজী নয়।"

"মোটেই না, ভেঙ্গে চেড়িয়ে যাবে।"

"আমার কথাই শোন না; যেদিন থেকে আমার বর সেনা-বাহিনীতে নাম লিখিয়েছে সেদিন থেকে সে বাড়ীর জন্যে একদম ভাবেই নি।"

"একথা বাপু সত্যি। আমাদের বাড়ীতে একবার একদল যুব সেনা ছিল। তারা দেখি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কেবল গান গাইছে। আমরা কখনও ওরকম করে আনন্দ করি নি। আমি তখন এত বোকা ছিলাম যে

ধরে নিয়েছিলাম ওরা যদি গান না গায় তাহলে হয়ত মনমরা হয়ে পড়বে। কিন্তু ওরা কি করলো বলবো ? আমাদের উঠোনটার দেওয়ালে ওরা সাদা সাদা অনেক বৃত্ত আঁকলে ; তারপর একের পর এক করে উবু হয়ে বসে লক্ষ্য বস্তুতে গুলি ছোঁড়ার অভ্যাস করতে থাকে।—তখনও কিন্তু তারা গান গাইছে আশ্চর্য্য !"

খুব সহজ ভঙ্গীতে ওঁরা নৌকা বাইছেন। নৌকার দুধার দিয়ে গলগল শব্দে জল বয়ে যাচ্ছে। ওঁদের মধ্যে একজন দুধ রংএর কচি পানিফল জল থেকে তুলে নিয়ে আবার সেটা জলে ফেলে দেন সেখানেই সেটিজলে ভাসতে থাকে ; বেড়েও উঠবে সে এখানেই।

"ভাবছি ওরা গেল কোথায় ?"

"ওরা পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যেতে পারে, কিন্তু আমার তাতে বয়ে গেল।"

"দেখ! একটা নৌকা আসছে!"

ওঁরা সবাই দূরে লক্ষ্য করতে থাকেন।

"ওরাই তো সব জাপানী সেনা। পোষাকটা দেখনা ?"

"তাড়াতাড়ি চলো।"

প্রাণ বাঁচাতে তাঁরা জোরে জোরে দাঁড় বায়। একজন তো ভাবতেই সুরু করে দেন যে এভাবে তাদের ঝুকি নেওয়া উচিত হয়নি। তাদের সকলকে নিঃসংগ রেখে যাবার জন্য তাঁদের স্বামীদের তিনি দায়ী করেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তাঁদের মাথা থেকে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দেন। তাঁদের জোরে নৌকা বেয়ে যেতে হবে—কেননা বড় নৌকাটা তাঁদের দিকেই ধেয়ে আসছে।

জাপানীরা কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগুচ্ছে।

এটা সৌভাগ্যের বলতেই হবে যে চারজন যুবতী বৌ সকলেই নদীর ধারে বেড়ে উঠেছেন। হাওয়ার বেগে তাঁদের নৌকা ছুটছে। মাছের মতই নৌকা উড়ে চলেছে—জলকে স্পর্শ করছে না বললেই হয়। ছেলে-বেলা ওঁরা নৌকার আনাচে কানাচে থেকে বড় হয়ে উঠেছেন। তাই তাঁরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাঁড় বেয়ে চলেন।

শত্রুরা যদি ওদেরকে পেরিয়ে চলে যায় তাহলে ওঁরা নদীর জলে ডুবে আত্মহত্যা করবেন।

বড় নৌকাটা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে। ওরা যে জাপানী তাতে কোন সন্দেহই নেই। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে মেয়েরা তাঁদের ভয়কে

চাপা দিচ্ছেন। হাতগুলোকে কাঁপতে দিচ্ছেন না। জলের মধ্যে শপ্‌শপ্‌ শব্দ করে দাঁড় বয়ে যাচ্ছে।

"সোজা পদ্মঝিলে চলো। ঐ আকারের নৌকা যাবার মত অত জল সেখানে নেই।"

তাঁরা ছুটছেন পদ্মঝিলের দিকে। ঝিলটা কয়েক ম্যু চওড়া ; যতদূর দেখা যায় সবটাই বড় বড় পদ্মপাতায় ভরে গেছে ঝিলের জল, যেগুলো কঠিন ব্রোঞ্জের প্রাচীরের মত সদয় সূর্যের পানে চলে গেছে। তাদের গোলাপি কুঁড়িগুলো সব তীরের মত উপরে ঠেলে উঠে গেছে—ওরা যেন বৈয়াংগদিয়াং হ্রদের অতন্ত্র প্রহরী।

তাঁরা দাঁড় বেয়ে ঝিলের দিকে গেলেন এবং শেষ প্রচেষ্টার সাহায্যে ছোট্ট নৌকাটা পদ্মফুলের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন। পালখ ঝাপটে কতকগুলি বুনো হাঁস উড়ে গিয়ে জলের খুব নীচ দিয়ে বোঁ বোঁ শব্দে উড়তে থাকে। একগাদা গুলির আওয়াজ।

সঙ্গে সঙ্গে বিশৃংখলা সুরু হয়ে গেল। তাঁরা নিশ্চিতভাবে শত্রুপক্ষের রচিত ফাঁদে ধরা পড়ে গেছেন, আর সেখান থেকে বেরুনোর যে কোন আশা নেই এটা মনে করে তাঁরা সকলেই জলে ঝাঁপ দেন। কিন্তু নদীর জলকে লক্ষ্য করে যে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে এটা বুঝতে পেরে তাঁরা সকলেই জলে ঝাঁপ দেন। কিন্তু নদীর জলকে লক্ষ্য করে যে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে এটা বুঝতে পেরে তাঁরা সকলে নৌকার কিনারা ধরে সতর্কভাবে পিটপিট করে তাকান সবাই। খুব কাছেই বিরাট পদ্মপাতার নিচে একটা মানুষের মাথা তাঁদের নজর পড়ে। লোকটার বাকি অংশটা জলের নিচে। এই লোকটি সুসেংগ। ওঁরা ডান দিকে বাঁ দিকে নজর করে তাঁরা সকলেই নিজ নিজ স্বামীকে খুঁজে বার করে নেয়। ওমা ওরা তাহলে এখানেই রয়েছে!

কিন্তু পদ্মপাতার নিচে থাকা মানুষটা শত্রু পক্ষকে দেখে তাক করতে এত ব্যস্ত যে তাঁদের বৌদের দিকে তাকাবার ফুরসৎই পায় না। দ্রুত গুলি ছুটে যায়। চার পাঁচ দফায় গুলি বর্ষণের পর হাত বোমা ছুঁড়ে তাঁরা সামনে এগিয়ে যান।

হাতবোমার আঘাতে মালপত্র সমেত শত্রুদের নৌকা জলে ডুবে গেল আর জলের উপর শুধু ভেসে রইলো সোডার ধোঁয়া। চীৎকার করে হাসতে হাসতে তারা জয় করা জিনিস উদ্ধার করতে লেগে যায়। মাছের মতই তাঁরা জলে ঝাঁপ দেন। শত্রুদের রাইফেল, কাতুজের বেল্ট,

এবং বস্তা বস্তা ঝড়েপড়া আটা চাল উদ্ধার করার জন্যে ছুটতে থাকেন; জলে ঝাপটাতে ঝাপটাতে সুসেংগ জলে দ্রুত ভেসে যাওয়া বিস্কুটের টিনের পেছন পেছন সাঁতার কেটে চলেন।

শরীরের চামড়া পর্যন্ত জলে ভিজিয়ে মহিলারা পুনরায় নৌকায় চড়ে বসেন।

এক হাতে শূন্যে বিস্কুট তুলে ধরে, অন্য হাতে দ্রুত দাঁড় বাইতে বাইতে চীৎকার করে বলেন:

"বেড়িয়ে এসো ওখান থেকে সব।"

তাঁর কণ্ঠস্বরে রাগের আভাস।

তাঁরা দাঁড় বেয়েই চলেন। আর কীই বা তাঁদের করার আছে? কোন রকম সতর্ক না করেই নৌকোর অগ্রভাগের জলের তলা থেকে একটা লোক বেড়িয়ে এলেন—যাঁকে চেনেন একমাত্র সুসেংগ-এর বৌ। ইনি হলেন ব্রিগেড ক্যাপ্‌টেন মুখের জল মুছে তিনি জানতে চান:

"এখানে তোমরা কি করছ?"

সুসেংগ-এর বৌ জবাব দেন:

"ওঁদের জন্য আরও কিছু জামাকাপড় নিয়ে যাচ্ছিলাম।"

ক্যাপ্‌টেন সুসেংগ-এর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন।

"এরা সবাই কি তোমার গাঁয়ের?"

"ঠিক ধরেছেন। এক গোছা পেছিয়ে পড়া বস্তু সব। ওদের নৌকায় সুসেংগ কিছু বিস্কুট ছুঁড়ে দেন। তারপর সঙ্গে সঙ্গে জলের তলায় উধাও হয়ে গেলেও একটু তফাতে আবার আবির্ভূত হন।

ক্যাপ্‌টেন হাসেন।

"তোমার অভিযানটা বৃথা যায়নি। তুমি না হলে আমাদের ফাঁদটা এত সফল হত না। কিন্তু এখন যেহেতু অভিযান শেষ হয়ে গেছে তাই বলছিলাম যে তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে জামাকাপড় সব শুকিয়ে নাও। পরিস্থিতি এখন উদ্বেগ জনক।"

যুদ্ধ জয়ের পারিতোষিক সব নৌকায় বোঝাই করে এখন লোকেরা সব যাবার জন্য প্রস্তুত। মধ্য দিনের সূর্য্যের তাপ থেকে মাথাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বড় বড় পদ্মপাতায় তাঁদের সব মাথা ঢাকা। জলে পড়ে যাওয়া সব বোচকা বুচকি জল থেকে উদ্ধার করে মেয়েরা নৌকায় তুলে নেন। তারপর ওদের তিনটে নৌকাই অতি দ্রুত দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ভেসে গেল এবং নদীর জলের উপর উত্তপ্ত কুয়াশা তাদের সম্পূর্ণ ঢেকে দেয়।

জলে ভেজা ইঁদুরের মত সিক্ত বসনে মেয়েরাও আর দেরী না করে নৌকা ছেড়ে দিল। কিন্তু এতক্ষণ যে সব উত্তেজনার ভেতর দিয়ে তাদের যেতে হয়েছিল সে সব আলোচনা করতে আবার তাঁরা খোসগল্পে এবং হাসিতে ফেটে পড়েন। হাল ধরে ধরে নৌকার পেছনে বসে থাকা মেয়েটা গোমড়া মুখে বলেন, "ওদের মুখগুলো একবার দেখেছিলে? আমাদের জন্যে কোন মাথাব্যথাই নেই।"

"আমরা যেন ওদের মুখে চুনকালি দিয়েছি"।

তাঁদের কাজের ফলাফলটা যে সঠিক অর্থে গৌরবজনক হয় নি সেটা জেনেও তাঁরা হাসেন তাহলেও ঃ

"আমাদের রাইফেল নেই তাই! তা যদি থাকতো তাহলে ঝিলে না লুকিয়ে থেকে জাপানীদের সাথে লড়ে যেতাম।"

"যাক্ শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধটা আমার দেখা হয়ে গেল। আগ এর মধ্যে চমৎকারটা কি রয়েছে। যতক্ষণ তোমার মাথাটা ঠিক থাকছে ততক্ষণ যে কেউ মাটিতে উবু হয়ে বসে কামান দাগতে পারে।"

"যখন একটা নৌকা ডুবে যায় তখন আমিও জলে ডুবে সেখান থেকে মালপত্র উদ্ধার করতে পারি। আমি শপথ করে বলতে পারি ওদের থেকে আমি ভাল সাঁতার কাটতে পারি। আর ওদের থেকে আরও বেশী গভীরে আমি যেতে পারি।"

"গাঁয়ে ফিরে গিয়ে চলো আমরাও একটা ইউনিট গড়ে তুলি, তা নাহলে আর গাঁ ছেড়ে বাইরে যেতে পারবো না।"

"যে মুহূর্ত্তে সেনাদলে যোগ দিয়েছে সেদিন থেকে আমাদের পাত্তাই দিচ্ছে না। আর আগামী দুবছরের মধ্যে ওরা আমাদের সঙ্গে কথা বলার যোগ্য বলেই মনে করবে না। কিন্তু ওরা সবাই আমাদের থেকে কি এমন ভালো?"

তাঁরা সেই শরৎকালে বন্দুক চালাতে শিখলেন। শীতকালে বরফের মধ্যে মাছ ধরার সময় এলে তাঁরা পালা করে শ্লেজ গাড়ীতে চড়ে বরফের উপর যাতায়াত করে গ্রামটা টহল দিতেন। শত্রুরা যখন খাল বিলের দেশটাকে খতম করে দিতে চেষ্টা চালায় তখন সেনাদের সঙ্গে এক যোগে কাজ করে নির্ভয়ে মেয়েরা নল খাগড়ার সমুদ্রের কোণে কোণে ঘুরে বেড়াতেন।

লেখক—সুন লি

লেখক পরিচিতি

লাও শী—(১৮৯৯—১৯৬৬)—এটি স্যু সেউই-এর ছদ্মনাম। বেজিং এ জন্ম। ১৯২৪ সালে ইংলণ্ডে যান এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য শিক্ষার স্কুলে চীনা ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখানেই তিনি তাঁর প্রথম তিনটি উপন্যাস রচনা করেন। ১৯৩০ সালে চীনে ফিরে তিনি জিনানে অবস্থিত কুইলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ক্যুইংগদৌতে অবস্থিত সানদংগ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের সময়েও (১৯৩৭—৪৫) তিনি তাঁর লেখা বন্ধ করেন নি। চংগ কুইংগ-এ থাকা-কালীন জাতীয় লেখক শিল্পী সংঘ গড়ে তুলতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরে তিনি চীন পরিত্যাগ করে আমেরিকায় থাকাকালীন সময় থেকে পুনরায় চীনে ফিরে আসার আগে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেন ও সাহিত্য কর্ম চালিয়ে যান। তিনি সরকারী প্রশাসন পর্যদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি কমিটির সদস্য হিসাবে, জাতীয় জনগণের কংগ্রেসের ডেপুটি হিসাবে, চীনের রাজনৈতিক উপদেষ্টা সম্মেলনের ডেপুটি হিসাবে, সমগ্র চীন শিল্প সাহিত্য ফেডারেশনের সহ-সভাপতি হিসাবে, চীনা লেখক সংঘের সহ-সভাপতি হিসাবে এবং বেজিং শিল্প ও সাহিত্য ফেডারেশনের সভাপতি হিসাবে নতুন চীন গড়ার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। বিপ্লবের পূর্বে পুরানো সমাজকে যথাযথভাবে উপস্থাপনা করে তাকে নিন্দা করতে তিনি "জিযাংগজিউট," (রিক্সাচালক) নামে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সহ বহু সাহিত্য সংক্রান্ত রচনা লেখেন। নতুন চীন গঠনের পর তিনি "ড্রাগনের দাড়ির গর্ত," "বসন্তের ফুল," "শরৎকালের ফল," "ফাংগ ঝেনঝু," "চায়ের দোকান" প্রভৃতি নামে নাটক ও ছোট গল্প লেখেন এবং তাঁর এই সব রচনা জনগণের সমাদর লাভ করে। চীন দেশে তিনি প্রশংসা অর্জন করেন এবং "ভাষাতত্ত্বের মহান পণ্ডিত ও জনগণের শিল্পী" নামে অভিহিত হন।

১৯৬৬ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সুরুতে তিনি লিন পিয়াও ও দুষ্ট চারচক্রের দ্বারা নির্য্যাতিত হয়ে নিহত হন।

লাও শীর সৃজনশীল জীবনের সুরুতে তাঁর লেখা ছোটগল্পগুলির মধ্যে অন্যতম গল্প হল এই "আধখানা চাঁদ।" বিপ্লবের পূর্বে এক মা ও তাঁর মেয়ে অভাবের তাড়নায় কেমন করে নামতে নামতে বেশ্যায় পরিণত হলো তার এক নিখুঁত চিত্র এই গল্পে অঙ্কিত হয়েছে।

(২) **ইয়ে সেংতাও** (বা ইয়ে সাওজুন)—জন্ম ১৮৯৪ সালে জিয়াংগসু প্রদেশের দক্ষিণে সুকৌ জেলায়। ছ বছর বয়স হলে বাবা তাঁকে এক "পারিবারিক স্কুলে" ভর্ত্তি করে দেন। ১২ বৎসর বয়সে তাঁকে স্থানীয় এক আধুনিক ধরণের স্কুলে সেখান থেকে বদলি করে আনা হয়।

১৯১১ সালে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হলেও অর্থ-নৈতিক কারণে তাঁর পড়াশুনা বেশী দূর গড়ালো না। ১৯১৬ সালে তিনি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা সুরু করে দশ বৎসর সেখানে ছিলেন। মাধ্যমিক স্কুলে থাকতে থাকতেই তিনি প্রাচীন ভাষায় উপন্যাস লিখতে সুরু করেন, সে সময় পর্যন্ত ঐ ভাষাই সমান চলতি ছিল। সে সময় তাঁর সব রচনা প্রকাশিত হত সাংহাই-এর সেই সময়ের জনপ্রিয় ছোট গল্পের পত্রিকা "শনিবারে।"

১৯১৯ সালে ৪ঠা মের আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে তিনি সম্পূর্ণ কথ্য ভাষায় লিখতে সুরু করেন এবং পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা প্রকাশিত সবচেয়ে প্রগতিশীল সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে অন্যতম "নতুন ধারা" পত্রিকায় লিখতে সুরু করেন। ১৯২১ সালে সুপরিচিত লেখক মাও দুনও সাহিত্য সমালোচক ঝেংগ ঝেংগদো-এর সাথে এক সঙ্গে সাহিত্য গবেষণা সংস্থা গড়ে তোলেন।

সাহিত্য সেবী হিসাবে সুখ্যাতির কারণে তাকে মাধ্যমিক স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেত কিন্তু তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল প্রকাশনা সংস্থার সম্পাদক হিসাবে কাজ করা।

তিনি দু দফায় দশ বৎসর ধরে কমার্শিয়াল প্রেস ও কাইসিংগ প্রেস নামে দুটি সাংহাই প্রকাশনা সংস্থায় কাজ করেন।

ইয়ে সেংতাও-এর কাছে বিশের দশক ছিল তাঁর সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের এক গুরুত্বপূর্ণ দশক। এই ক বছরে নয় নয় করে তাঁর কয়েকটি ছোট গল্পের সংকলন প্রকাশিত হয় ; যেমন, "ভুল বোঝাবুঝি" (১৯২২), "ভীষণ অগ্নিকাণ্ড" (১৯২৩), "আকাশের নীচে" (১৯২৫), "সহরে" (১৯২৬), "অক্লান্ত" (১৯২৮) ও অন্যান্য গল্প। "স্কুল শিক্ষক লি হুয়ানজির" হলো লেখকের অন্যতম এক পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। ১৯২৮ সালে এই উপন্যাস লেখা সুরু হয়ে সাংহাই থেকে প্রকাশিত শিক্ষা বিষয়ক সাময়িক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়, অল্প কয়েকদিন পরে কিশোরদের জন্য "খড়ের মানুষ" (১৯৩২) ও "প্রাচীন বীরদের মূর্তি" (১৯৩৩) নামে দুটি সুপরিচিত গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়।

১৯৩৬ সালে জাপানের বিরুদ্ধে চীনের প্রতিরোধ যুদ্ধ সুরু হলে তিনি

সুঝৌ পরিত্যাগ করে সুচিয়ান-এ চলে যান ; জায়গাটি ছিল চীনের সামনের এক রণক্ষেত্র থেকে বহু পেছনে এবং সেখানেই তিনি তাঁর পড়াশুনা ও সম্পাদকীয় সব কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মানুষকে আগ্রহী করতে তিনি কয়েকটি দেশাত্মবোধক রচনা লেখেন। এই সংকলনটি জি চুয়ান থেকে ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়। জাপানের বিরুদ্ধে জয়লাভের পরেই তিনি সাংহাই ফিরে আসেন এবং কাইসিংগ প্রেসে কাজ করতে সুরু করেন। ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি সেখানেই রয়ে যান।

১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেংতাও জনগণের রাজনৈতিক উপদেষ্টা সম্মেলনের জাতীয় কমিটীর সদস্য নির্বাচিত হন, এবং এক সময় তিনি প্রকাশনা প্রশাসনের সহ পরিচালক ও শিক্ষা দপ্তরের উপমন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানে তিনি পঞ্চম জনগণের রাজনৈতিক উপদেষ্টা সম্মেলনের স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং জাতীয় জনগণের কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির সদস্যপদ লাভ করেন।

"শ্রীযুক্ত পান কেমন করে ঝড় সামলালেন" গল্পটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প। এতে এক ভীরু, স্বার্থপর এমন এক বুদ্ধিজীবীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যিনি সহজেই পরিতৃপ্ত হন। যুদ্ধবাজদের পারস্পরিক যুদ্ধের বিশৃঙ্খলার সময় বাস করে তিনি যুদ্ধের ধ্বংসলীলা ও বেকারিত্ব এড়াতে যা যা করেছেন তা এতে বর্ণিত হয়েছে। যে কোন অসুবিধায় পড়লেই তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়তেন ; কিন্তু শান্তির বিরতি শুরু হলেই প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রশংসা করতে করতেই তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যেত। এমন এক বিশ্রী পরিবেশে তিনি বাস করে এসেছেন যেখানে কেবল নিজেকে রক্ষা করতে অত্যন্ত অসম্মানজনক জীবন যাপন করা ছাড়া অন্য কোন আদর্শই ছিল না। পুরানো সমাজের কোন কোন বুদ্ধিজীবীর মডেল হিসেবে শ্রীযুক্ত পানকে তীক্ষ্ণভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

(৩) **বিং সিন্ :**—একজন সমকালীন মহিলা লেখিকা, যাঁর প্রকৃত নাম হলো জি ওয়ান্‌যিংগ। জন্ম ১৯০০ সালে ফুজিয়ান প্রদেশের চাঙগেন জেলায়। ১৯১৮ সালে বেজিংএ জিহে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে প্রারম্ভিক বিভাগে এবং পরে ইয়ানজিংগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগে ভরতি হন। পরের বৎসরের মে মাসে তিনি দেশপ্রেমিক ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। সেই বছর থেকেই তিনি সাহিত্য বিষয়ক রচনা লিখতে সুরু করেন। ১৯২১ সালে প্রগতিশীল সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা

সোসাইটির সদস্য হন। ১৯২৩ সালে স্নাতক হবার পর উচ্চ শিক্ষার্থে ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি আমেরিকায় ছিলেন। চীনে প্রত্যাবর্তন করে ইয়ান্‌জিও কুইংগহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলাদের কলা কলেজে শিক্ষকতা করেন ; ১৯৩৭—৪৫ সাল পর্যন্ত জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় কুনমিংগ ও চোঙ্গ কিউংগ এ তার সাহিত্য বিষয়ক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান। "নোতুন চীনা সাহিত্য" বিষয়ে শিক্ষকতা করতে তিনি ১৯৪৬ সালে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। ১৯৫১ সালে দেশে ফিরে কিশোরদের জন্য গদ্য ও সাহিত্য বিষয়ক রচনার কাজ চালিয়ে যান। জাতীয় জনগণের কংগ্রেসের ডেপুটি পদে, চীনা জনগণের পরামর্শদাতার সম্মেলনের স্থায়ী কমিটি সদস্য পদে, সমগ্র চীনা সাহিত্য শিল্পচক্রের ফেডারেশনের সহ সভাপতি পদে চীনা লেখক সংঘের কাউন্সিল সদস্য হিসাবে তিনি নির্বাচিত হন।

বিং সিনের রচনার মধ্যে ছোট গল্প ও কবিতা থাকলেও তিনি বিশেষ করে পরিচিতা তাঁর গদ্য রচনার জন্য। তাঁর প্রথম জীবনের রচনার মধ্যে রযেছে ছোটগল্প, যেমন, "দুই পরিবার" "রোগাটে দুর্বল লোকটা" ; কবিতার মধ্যে রযেছে, "নক্ষত্র," "ঝরনার জল" প্রভৃতি ; এবং অন্যান্য গল্প সংকলনের মধ্যে রযেছে, "কিশোর পাঠকদের জন্য" ও "অতীত"। এই সব রচনার মধ্যে তিনি সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যুদ্ধবাজদের কদর্য্য শাসন ব্যবস্থাকে তুলে ধরেছেন, কিছু বুদ্ধিজীবীদের ক্ষোভ প্রতিফলিত করেছেন, সামাজিক সমস্যাবলীকে তুলে ধরেছেন, এবং বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় ৩০ এর দশকে তিনি তাঁর "বিচ্ছেদ" "বালিকা ডংগার" প্রভৃতি নামে ও অন্যান্য ছোট গল্প ও "মহিলাদের প্রসঙ্গে" নামে প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি প্রধানত লেখেন "চেরীফুলের প্রশংসায়", 'আমরা বসন্তকে জাগিয়েছি' নামে গদ্য প্রবন্ধ ও 'গ্রীষ্মাবকাশে তাওকির ডায়েরী' ও 'ছোট্ট কমলালেবুর প্রদীপ,' "পুনরায় কিশোর পাঠকদের জন্য" নামে কিশোরদের জন্য গল্প সংগ্রহ। ১৯৫৪ সালে বেজিং সাহিত্য বিষয়ক প্রকাশনী সংস্থা তার যে গল্প সংকলন প্রকাশ করেন তাতে নোতুন সমাজের জীবনযাত্রা প্রণালী বর্ণিত হয়েছে।

বিং সিন এর রচনাবলী বিশেষ করে তাঁর গদ্য রচনাবলী তাঁর অপূর্ব রচনাশৈলীর জন্য যা স্বাভাবিক ও মাধুর্য পূর্ণ ভাষায় গভীর অনুভূতি ব্যক্ত করেছে, বিশেষভাবে সমাদৃত।

"বিচ্ছেদ" গল্পটি তাঁর প্রথম জীবনের রচনার মধ্যে অন্যতম। দুটী সদ্যোজাত শিশু জীবনের আলেখ্য—এখানে "আমি" হচ্ছি বুদ্ধিজীবীর সন্তান ও "বন্ধু" হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর সন্তান—এটা দেখাচ্ছে যে স্বেচ্ছায় মানুষ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না, কিন্তু হয় সামাজিক চাপ ও পরিবেশের জন্য।

(৪) ওয়াঙ তঙজাও (১৮৯৭-১৯৫৭)—সমকালীন এক চীনা ঔপন্যাসিক ও কবি ওয়াঙ তঙ জাও এর জন্ম ১৮৯৭ সালে সানদংগ প্রদেশের ঝুঝেংগ জেলায়। ১৯১৩ সালে ঐ প্রদেশের জিনান মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হন। ১৯১৮ সালে বেজিংএর চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হন এবং পরে সেখানে লেকচারার হিসাবে কাজ করেন এবং স্নাতক হবার পর স্কুল শিক্ষক হিসাবে কাজ করার সময় সাহিত্য বিষয়ক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান। ১৯১৯ সালে নব সাহিত্য আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তার প্রথম জীবনের রচনার মধ্যে রয়েছে "তুষার পাতের পর" ও "চিন্তিত"। ১৯২১ সালে মাও তুন, ঝেংগঝেন দো, ও ইয়ে সেংগতাও প্রভৃতি অন্যান্য সব প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের সাথে একযোগে সাহিত্য পাঠচক্র গঠন করেন এবং ১৯২২ সালে লুন স্যুন এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে সুরু করেন। ১৯২৭ সালে জাপানে যান। এই সময় তিনি রচনা করেন "তুষারাবৃত প্রভাত," ও "ছেলেমানুষী" নামে দুটি কবিতাগুচ্ছ। সে সময়ের ছোট গল্পের মধ্যে ছিল, "বসন্তকালে বর্ষণ ঘন রাত" "যুদ্ধের ডাক", ও "এক চিলতে তুষার", ও "এক টুকরো পাতা" নামে ছোট্ট এক উপন্যাস। ১৯৩১ সালে উত্তর পূর্ব চীন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর "উত্তর চীনের বসন্ত" নামে এক বিবরণী সংকলন প্রকাশ করেন, পরবর্তীকালে সাংহাইতে প্রগতিশীল সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা চক্রে যোগ দেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম "পাহাড়ী ঝড়" নামে উপন্যাস রচনা করেন। এতে বর্ণিত হয়েছে জমির সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থাকা সত্বেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও যুদ্ধের বছর গুলিতে বিরাট করের বোঝা এড়াতে কেমন করে কৃষকেরা শহরে পালিয়ে মজুর বাহিনীতে যোগ দেন, যাদের অবস্থা আরও খারাপ। তাঁর একটি উপন্যাসের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি থাকায় সেই বছরেই তিনি সাংহাই ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং নিজের অর্থ খরচ করে প্রাচীন শিল্প সাহিত্য অধ্যয়ন করতে ইউরোপ যান। ১৯৩৫ সালে দেশে ফিরে সাংহাই-এর সাহিত্যচক্রের মুক্তি সংঘে যোগ দেন। ১৯৩৬ সালে "বসন্তের ফুল" নামে তাঁর এক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ৪ঠা মের আন্দোলনের পর বুদ্ধি-

জীবীদের যে প্রবণতা দেখা দেয় ও তাঁরা যে ভিন্ন ভিন্ন পথ গ্রহণ করেছিলেন তাও এই উপন্যাসে প্রতিফলিল হয়েছে। ১৯৩৭ সালে তিনি গোটা পরিবারকেই সাংহাই নিয়ে যান ও সাংহাই চারু শিল্পকলা কলেজে শিক্ষকতা করেন। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ সুরু হলে তিনি জিনান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে যান। ১৯৪৫ সালে ফিরে এসে কুইংগদৌতে সানদংগ বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর তিনি জাতীয় জনগণের কংগ্রেসে ডেপুটি নির্বাচিত হন, সানদংগ প্রাদেশিক গণকমিটির সদস্যপদ লাভ করেন; চীনা শিল্প সাহিত্য চক্রের ফেডারেশনের সদস্যপদ লাভ করেন; চীনা লেখকদের ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যপদ পান। সানদংগ প্রাদেশিক শিল্প-সাহিত্য ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন ও চীনা গণতান্ত্রিক লীগের সদস্য হন। ১৯৫৭—৫৮ সালে বেজিং জনগণের সাহিত্য প্রকাশনা সংস্থা তাঁর নির্বাচিত গল্পগুচ্ছ ও কবিতাগুচ্ছ প্রকাশ করেন।

"লেকের ধারের সেই ছোট্ট ছেলেটা" তাঁর ১৯২২ সালের লেখা। এখানে একটি ছোট ছেলের মাধ্যমে এক গরীব পরিবারের জীবন যাত্রা প্রণালী বর্ণিত হয়েছে।

(৫) **জু দিশান** (১৮৯৭—১৯৪১) এঁর ছদ্মনাম হল লৌ হুয়া সেংগ। তিনি তাঁর সমকালীন লেখকদের মধ্যে খুবই পরিচিত ছিলেন জন্ম ফুজিয়ান প্রদেশের লন্‌জি জেলায়। প্রথম জীবনে তাঁর শিক্ষালাভ হয় ওয়ানদংগ-এবং ১৯১২ সালে প্রথমে ফুজিয়ান নর্মাল স্কুলে ও পরে সিঙ্গাপুরে সাগর পারে চীনা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে দেশে ফিরে তিনি দ্বিতীয় নর্মাল স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯১৭ সালে বেজিং-এ ইযানজিংগ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ৪ঠা মে এর আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন; স্নাতক হবার পর তিনি সেখানে টিউটরের পদে নিযুক্ত হন এবং মাও দুন, ঝেংগ ঝেংগদৌ, ইয়ে সেংগতাও ও অন্যান্যদের সাথে একযোগে কাজ করে একটি সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা চক্র গড়ে তোলেন। "উপন্যাস" নামে মাসিক পত্রিকায় "প্রেমিক পাখী" নামে প্রথম ছোট গল্প প্রকাশিত হয় এবং তারপর থেকে 'ব্যবসাদারের বৌ," "ব্যস্ত মাকড়সার জাল" ও "নিঃসঙ্গ পাহাড়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টি" নামে অনেক গল্প প্রকাশিত হতে থাকে। এই ভাবে নোতুন সাহিত্য বিষয়ক আন্দোলনের প্রথম যুগে এক গুরুত্বপূর্ণ লেখকে পরিণত হন। ইয়ান জিংগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ধর্মীয় কলেজ থেকে তিনি "ঈশ্বরতত্ব" বিষয়ে স্নাতক হন। সেই বছরই তিনি ধর্মীয়

ইতিহাস সম্পর্কে আরও শিক্ষালাভ করতে নিউইয়র্কে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। ১৯২৪ সালে ধর্মীয় ইতিহাস, ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃত, লোককথা প্রভৃতি বিষয়ে পড়াশুনা করতে তিনি সেখান থেকে লণ্ডনে চলে যান। চীনে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সংস্কৃত, ও বৌদ্ধ মতবাদ পড়তে কিছুকাল ভারতে বাস করেন। ১৯২৬ সালে ইযান জিংগ বিশ্ববিদ্যালযের ধর্মীয় কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি বেইজিং ও কুইংগহুযা বিশ্ববিদ্যালযে ভারতীয দর্শন ও নৃতত্ত্ব পড়াতেন। এই সময তিনি বৌদ্ধধর্মের শাস্ত্রীয অনুক্রমনিকা সম্পাদনা করেন ও চীনা তাওবাদীর ইতিহাস রচনা করেন। তাঁর প্রথম জীবনের রচনায যেমন "ব্যাস্ত মাকড়সার জাল" নামে ছোটগল্প সংকলনে এবং "নিঃসঙ্গ পাহাড়ে ঝিরঝির বৃষ্টি" নামে গদ্যসাহিত্য তাঁর ধর্মীয দর্শন ও অদৃষ্টবাদীতার ছাপ বেশ স্পষ্টভাবে দেখা যায।

"বড়দি লিউ" গল্পটি ১৯৩৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয। এই গল্পে এক দযাশীলা, স্পষ্টবাদী দৃঢ় ইচ্ছা'র অধিকারী এক মহিলাকে উপস্থাপনের দ্বারা সমান যন্ত্রণা ভোগকারী শ্রমজীবি মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক গভীর ভালবাসা ও অন্যান্য গুণাবলী অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত হযেছে।

(৬) **রৌ শী**—(১৯০২-১৯৩১)—এটি ঝাও পিংগ ফু-এর ছদ্মনাম। ঝেঝিযান প্রদেশের নিনখাই জেলায জন্ম। ১৯১৮ সালে ঝেঝিযান এর হ্যাংকাউ এর প্রথম নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯২৩ সাল থেকে লিখতে সুরু করেন। স্কুল পরিত্যাগ করে সাংহাইতে নযা সাহিত্য বিষযক আন্দোলনে অংশ গ্রহণের পূবে ১৯২৮ সালে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক ছিলেন। মহান লেখক লু সুনের সহাযতায "প্রভাতের মুকুল সোসাইটির" নামে এক সংস্থা গড়ে তোলেন। সৃজনশীল রচনা ছাড়াও বিদেশের বিশেষ করে পূর্ব ও উত্তর ইউরোপের সাহিত্য ও ভাস্কর্য্যের সাথে চীনা জনগণের পরিচয করিযে দেন। ১৯৩০ সালে বামপন্থী লেখক লীগের সদস্য হন, ও ঐ একই বছরে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৩১ সালে ১৭ই জানুয়ারী কুযোমিনটাং-এর প্রতিক্রিযাশীলেরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করে।

তাঁর প্রথম জীবনের রচনার মধ্যে আছে "পাগল লোকটা" নামে এক ছোট গল্পের সংকলন, "তিন বোন" নামে ছোট্ট এক উপন্যাস, ও "পুরানো যুগের সমাপ্তি" নামে এক পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। ১৯২৯ সালে তাঁর "বসন্তের সীমান্তে" নামে এক গুরুত্বপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হয় ; লু সুন এ বই-এর ভূমিকা লেখেন।

তাঁর সর্বশেষ্ঠ গল্প "ভাড়াটে বৌ", প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৯৩০ সালে। এতে বর্ণিত হয়েছে এক যুবতীর জীবন যাঁকে সংসার প্রতি-পালনের জন্য তাঁর স্বামী পাশের গ্রামের এক জমিদারকে ভাড়া দেয়; তাঁর নিজ ছেলেকে পরিত্যাগ করে। অন্য একজনের সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে তাঁকে তিন বছর ধরে এক অসহনীয় জীবন যাপন করতে হয়; লেখকের লেখার মাধ্যমে সেই ভাড়াটে বৌ-এর জীবন—যিনি একাধারে মা ও ক্রীতদাসী—উভয় দিকই পাঠকের কাছে পরিষ্কার ভাবে উপস্থিত হয়েছে।

(৭) ঝাংগ তিয়ান্যি—জন্ম ১৯০৬ সালে নান্‌ঝিংগএ। ১৯২৪ সালে উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে চিত্রাঙ্কন শিল্প অধ্যয়ন করতে সুরু করেন। কিন্তু এক বছর মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার পর অর্থ নৈতিক কারণে তাঁকে লেখাপড়া ছাড়তে হয়; অল্প সময়ের ব্যবধানে পরপর বেকারী, সরকারী করণিকের পদে কাজ করে, সংবাদপত্র বিক্রেতা ও শিক্ষকতার পদের চাকুরীর মাধ্যমে তিনি এক অনিশ্চিত জীবন যাপন করেন। তাঁর লেখা সুরু সেই ১৯২৮ সালে। সেই ১৯৪৯ সাল থেকেই তিনি "জনগণের সাহিত্য" নামে মাসিক পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য আছেন। বর্তমানে প্রধানতঃ কিশোরদের জন্য বই লেখার কাজে তিনি বেশী সময় ব্যয় করেন।

বেশ কয়েকখানি উপন্যাসও তিনি লেখেন; যার মধ্যে রয়েছে "একটা বছর", "সহরে", "চারিদিকে খাঁজ কাটা চাকা", সুপরিচিত ছোট গল্প সংকলনে রয়েছে "পেছু নেওয়া", "প্রতি আক্রমণ," "ঐক্যবদ্ধ", "বসন্তের হাওয়া", "সাথী", "স্বদেশবাসীরা"; কিশোরদের জন্য রচিত গল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গল্প রয়েছে, "মহান রাজা তু তু", "বিরাট নেকড়ে", "লিউ ওয়েন্যিযাংগ-এর গল্প" ও "ম্যাজিক লাউ-এর রহস্য।" ১৯৩১ সালে লেখেন "বড় লিন ও ছোট লিন্।"

তাঁর কয়েকটি ছোট গল্প যেমন "ম্যাজিক লাউ-এর রহস্য", "বড় লিন ও ছোট লিন্", "বিরাট নেকড়ে", ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় অনুদিত হয়।

"শ্রীযুক্ত হুয়া ওয়েই" ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত গল্পটি লেখকের রচিত শ্লেষাত্মক ছোট গল্প। এই গল্পে পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত হয়েছে হুয়া ওয়েই নামে এমন এক হীন ও বাজে লোকের কথা যাঁর কোন শিক্ষা দীক্ষাই ছিল না, এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কুয়োমিনটাং প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃক প্রেরিত এক নখ ছাড়া আর কিছু না।

এই গল্পের মাধ্যমে ঝাংগ তিয়ান্যি কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি কুয়োমিনটাং বাহিনীর প্রকৃত বিরোধিতার স্বরূপ ও জাপ বিরোধীতার ভণ্ডামী প্রকাশ করে দেন।

(৮) **আই উও**—জন্ম ১৯১৪ সালে সি চুয়ান প্রদেশের ফানজিয়ান জেলায়। তাঁর ঠাকুরর্দা ও পিতা ছিলেন শিক্ষক। চেংগডু প্রদেশের নর্মাল কলেজে পড়াশুনা করেন।

১৯২৫ সালে ইউন্নান প্রদেশে যান এবং বৎসরাধিক কাল ধরে সেখানে দোকান কর্মচারী হিসাবে কাজ করেন। উদ্দেশ্যহীনভাবে বর্মায় খানিক ঘুরে বেড়ানোর সময় পাঁচ মাস ধরে এক আস্তাবলে সহকারী কর্মী হিসাবে তিনি কাজ করেন। পরে রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুরে যান। কিছুদিন ধরে তিনি সংবাদপত্রের প্রুফরিডার হিসাবে কাজ করেন। পরে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন এবং সংবাদ পত্রের ক্রোড়পত্রের সম্পাদনার কাজ করেন।

১৯৩১ সালে আই উও সাংহাইতে ফিরে আসেন এবং সেই বছরেই তিনি বামপন্থী চীনা লেখক সংঘে যোগ দেন এবং "সাহিত্য বিষযক মাসিক পত্রিকায়" ছোটগল্প প্রকাশ করে চলেন।

বিপ্লবের পূর্বে তিনি এমন অনেক উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখেন। যার বেশীর ভাগ বিষযবস্তু ছিল বঞ্চিত শ্রমজীবী নরনারীদের সম্পর্কিত এবং তিনি যাদের প্রতিরোধের মানসিকতার জয়গান গেযেছেন। মুক্তির পরে তিনি অনেক ছোট গল্প ও উপন্যাস "গৃহ প্রত্যাবর্তন" "অভিযান" ও অন্যান্য ছোট গল্প প্রকাশ করেন।

১৯৩৭ সালে "ইস্পাতদৃঢ় পোড় খাওযা মানুষ" নামে এক উপন্যাস লেখেন, যার প্রধান বিষয়বস্তু হিসাবে লোহা ও ইস্পাত শ্রমিকদের জীবন তিনি বেছে নেন। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় তিনি বেশ কযেক বছর লেখা বন্ধ রাখেন।

"বোন সি কুইংগ" লেখা হয় ১৯৪৭ সালে। এখানে বর্ণিত হয়েছে জনমানবশূন্য এক গ্রামে বসবাসকারী এক কৃষক রমণীর জীবন, যাঁর স্বামীকে বলপূর্বক সেনাদলে ভর্ত্তি করা হয়েছে। দশ বৎসর ধরে জমিদার কর্তৃক শোষিত হয়ে কৃষক রমণী তাঁর নিজ বাড়ী, বহু পরিশ্রম করে তৈরী করা চাষের ক্ষেত শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে তার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করতে সুরু করে দেন। এই মর্মস্পর্শী গল্প আমাদের দেখিয়ে দেয় পুরানো শ্রমজীবী মানুষের জীবন।

বর্তমানে ইনি সর্বক্ষণের লেখক।

(৯) **বা জিন**—লি ফেইগানের ছদ্মনাম বা জিন। জন্ম ১৯০৪ সালে সিচুয়ান প্রদেশের চেংগদো জেলায়। তাঁর পিতা কিছুদিন শহরের পুলিশের প্রধান ছিলেন। ছেলেবেলায় গৃহশিক্ষকের কাছে তাঁর শিক্ষা সুরু। বয়স বাড়ার সাথে সাথেই সে সময় চীনে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া সমাজ-তান্ত্রিক বিশেষ করে কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন।

১৯২০ সালে প্রাদেশিক বিদেশী ভাষাশিক্ষার স্কুলে ভরতি হযে ইংরেজী ভাষা শেখেন সেই সাথে তৎকালীন কয়েকটি পত্রিকা—যেমন "পাক্ষিক" যে পত্রিকা তখন নোতুন ভাবধারা প্রচার করছিল—সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। ১৯২৩ সালে শিক্ষার্জন করতে সাংহাই যান। সেখানে "প্রেম" নামে একটি উপন্যাসের তিনটে অংশ যেমন,—কুয়াশা, বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎ রচনা করেন এবং প্রচণ্ড আলোড়নপূর্ণ "প্রবাহ" নামে একটি উপন্যাসের দুইটি অংশ যেমন, "পরিবার" ও "বসন্ত কাল" রচনা করেন।

১৯৩৩ সালে তিনি সাহিত্য নামে এক ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্য হন। পরের মাসেই জাপান চলে যান। ১৯৩৫ সালে সাংহাইতে ফিরে "সাংস্কৃতিক জীবন" প্রেসের প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৩৭ সালে জাপ বিরোধী যুদ্ধ সুরু হলে মাও দুন ও অন্যান্য প্রগতি-শীল লেখকদের সঙ্গে একযোগে কাজ করে সাংহাইতে "চীৎকার" ও "আলোর সংকেত" নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে চীনের দক্ষিণ পশ্চিম এলাকার বহু জায়গায় সাহিত্য বিষয়ক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভাবে কাজ করেন এবং তাঁর লেখার কাজ চালিয়ে যান। এখানেই তিনি তাঁর "প্রচণ্ড আলোড়নপূর্ণ প্রবাহ" উপন্যাসের শেষ অংশ "শরৎকাল" লেখা শেষ করেন এবং "আগুন" নামে এক বড় উপন্যাস লেখেন। উপরোক্ত তুর্গেনিভের "পিতা পুত্র" ও 'কুমারী মাটির" বই দুটীর অনুবাদ করেন। জাপানের বিরুদ্ধে জয়লাভের পর তিনি আবার সাংহাই ফিরে এসে ১৯৪৬ সালে 'সাংস্কৃতিক জীবন' প্রেসের সম্পাদনার কাজে হাত দেন।

১৯৪৬ সালে কুয়োমিংটাং এর হাত থেকে সাংহাই মুক্ত হলে তিনি জনগনের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বশান্তি সম্মেলনে তাঁকে ওয়ার'শ পাঠানো হয়।

১৯৫২-৫৩ সালে তাঁকে কোরিয়ায় পাঠানো হলে সেখানে তিনি সেনাদলের সাথে একত্রে বাস করে কোরিয়ার যুদ্ধের উপর অনেক রচনা লেখেন। ১৯৫৪ সালে জাতীয় জনগনের কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে তিনি ডেপুটি নির্বাচিত হন।

১৯৫৮-৬২ সালের মধ্যে বেজিং জনগণের প্রকাশনা সংস্থা তাঁর ১৯২৭-৪৬ সাল পর্যন্ত রচনা সহ সমগ্র রচনাবলী কিস্তিতে ১৪ খণ্ডে প্রকাশ করেন। "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের" সময় তিনি লিনপিয়াও ও দুষ্ট চার চক্রের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে সামযিকভাবে তাঁর লেখা বন্ধ রাখেন। দুষ্ট চার চক্রের পতনের পর তিনি আবার জাতীয় জনগনের কংগ্রেসের পঞ্চম অধি-বেশনে ডেপুটি নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি সারা চীনা শিল্পও সাহিত্য ফেডারেশনের সহ সভাপতি ও চীনা লেখক সংঘের সাংহাই শাখার সম্পাদক।

চাঁদনী রাত' গল্পটি এক কৃষকের গল্প যিনি কৃষক সংগঠনের অন্যান্য সদস্যদের সাথে একযোগে কাজ করে স্থানীয় অত্যাচারী স্বৈরতন্ত্রী ও নোংরা আমলাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে লড়াই করে শত্রুদের হাতে শহীদ হন।

(১০) **সেঙকঙ ওয়েন**—বিখ্যাত সমকালীন লেখক, জন্ম হুনান প্রদেশের ফেঙ্গইয়াঙ্গ জেলায় ১৯০৩ সালে। তাঁর লেখক জীবন সুরু হয় বেজিংগ-এ সংবাদপত্রে ও পত্র-পত্রিকায় ছোট গল্পের প্রকাশের মাধ্যমে। সেই ১৯২৮ সালেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রচনা লেখায় শিক্ষিত হয়ে বিভিন্ন রচনাশৈলীর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর নিয়ে অনেক গল্প লেখেন। কুড়িটিরও বেশী গল্প সংকলন প্রকাশ করেন, যার বেশীর ভাগই হলো ছোট গল্প, যেমন "বৃষ্টির পরে," "বড় ও ছোট রুয়ান," "আটটি ঘোঁড়া," "পাহাড় ডিঙ্গানো লোকটি", "বাঁচা", 'উপদেষ্টা,' এবং "বেকার", এই সব গল্পের বেশীর ভালই হলো, জটিল সব ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সহ যুবক যুবতীর প্রেমের গল্প। তাঁর সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বকারী উপন্যাস হলো "সীমান্ত সহর" নামে ছোট উপন্যাস। এই উপন্যাসে ফেরীঘাটের মাঝির নাত্নীর সাথে এক কমাণ্ডারের দুই ছেলের প্রেম বর্ণিত হয়েছে। এই রকমের এক জটিল গল্পের কাঠামোর সাহায্যে লেখক পশ্চিম হুনানের এক প্রত্যন্ত ছোট এলাকার স্থানীয় অধিবাসীদের শান্তিপূর্ণ জীবনের ও তাদের আচার আচরণের এক সুন্দর চিত্র অংকন করেন।

"স্বামী" নামে এই ছোট্ট গল্পে পুরানো চীনের এক দরিদ্র চাষীর বেদনার্ত জীবন বর্ণিত হয়েছে। এক চাষী তার স্ত্রীকে ছোট সহরে নৌকায় দেহ ব্যবসায় পাঠিয়ে নিজে কেবল নামেই স্বামী হয়ে থাকে।

(১১) **লিউ বাইউ**—একজন সুপরিচিত সমকালীন লেখক। জন্ম ১৯১৬ সালে বেজিং-এ। তাঁর প্রথম ছোট গল্প হলো "বরফের আকাশ" এর পরই পর পর তাঁর অনেক ছোট গল্প প্রকাশিত হয়; যেমন, "চারণ ভূমি প্রসংগে", "অসুস্থতা", "লাল আকাশ" প্রভৃতি। ১৯৩৭ তাঁর প্রথম ছোট গল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৯৩৮ সালে তিনি ইয়েনান শিল্পী সাহিত্যিকদের দলে যোগ দিতে ইয়েনান গিয়েছিলেন এবং উত্তর চীনের জাপ বিরোধী ঘাটিগুলি সব পরিদর্শন করেন। এই সময় তিনি "উওতেই পর্বতের পাদদেশে" নামে আরেকটি গল্প সংকলন প্রকাশ করেন। তাইহাংগসানে জাপ বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটিতে থাকাকালীন তিনি অনেক রচনা লেখেন, যাতে সেনাবাহিনী ও মানুষের সংগ্রাম ও তাঁদের জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। সেই সংকলনে "গেরিলা যুদ্ধ" নামে এক বিবরণী সংকলন ও "লঙ্গিয়ান গ্রাম" ও "পরিতৃপ্তি" নামে দুটো গল্প সংকলন ছিল। ১৯৪৪ সালে চংগকুইনস্-এর অবস্থিত সিনহুয়া পত্রিকার ক্রোড়পত্রের সম্পাদকের কাজ করতে তিনি সেখানে যান। ১৯৪৬ সালে তাঁকে উত্তর চিনে মুক্ত এলাকায় পাঠানো হয় এবং মুক্তি সংগ্রামের সময় তিনি যুদ্ধে সেনাবাহিনীর সংবাদদাতা ছিলেন। এই সময় তিনি "উত্তর পূর্ব এলাকায় ভ্রমণ" নামে এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণী সংকলন এবং "আগুয়ান আগুনের শিখা" নামে ছোট এক উপন্যাস, "রাজনৈতিক কমিশর," "তিন অতুলনীয় যোদ্ধা" ও "রক্তের সম্পর্ক" নামে তিনটে ছোট গল্প লেখেন।

গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবার পরেও তিনি তাঁর সাহিত্য বিষয়ক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আছে "কোরিয়ার যুদ্ধ এগিয়ে চলেছে" ও "এক শান্তির আবেদন পত্র" এবং "যুদ্ধের আনন্দ" নামে এক ছোট গল্পের সঙ্কলন; এই গল্পের আক্রমনকারীদের অপরাধকে প্রকাশ করে কোরিয়া ও চীনা জনগণের মধ্যে এক সংগ্রামী সৌহার্দের জয়গান গাওয়া হয়েছে। ১৯৫৬—৫৯ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তাঁর যেসব রচনা প্রকাশিত হয় তাতে চীন দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং তার নোতুন জনগণের গঠনকল্প ও ধ্যান ধারণা ও আচার আচরণ বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে "মশাল ও সূর্য্য", "অরুণোদয়", "ইয়ানজির উপর তিন দিন" এবং "উজ্জ্বল তারুণ্য" ও "ভোরের আগুয়ান জনগণ", নামে ছোট গল্পের এক সঙ্কলন। ১৯৭৬ সালের পরে তিনি আরও অনেক গদ্য রচনা করেন; যেমন, "লাল সূর্যের গান", "মহান স্রষ্টিকর্তা," "তৈলকূপের গান" ও "অত্যুচ্চ তাইহাংগ পাহাড়"

এইসব রচনায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশে অংশ গ্রহণকারী বৃদ্ধ সর্বহারা বিপ্লবীদের জয়গান করা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক প্রজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর লিউ বাইউ বহু শিল্প সাহিত্য বিষয়ক সংগঠনের নেতৃত্ব করেন। তিনি চীনা লেখকদের ইউনিয়নের সহ সভাপতি, চীনা লেখকদের সম্পাদক মণ্ডলীর সম্পাদক, সাংস্কৃতিক মন্ত্রী দপ্তরের উপমন্ত্রী, জনগণের মুক্তিফৌজের সাধারণ রাজনৈতিক দপ্তরের সাংস্কৃতিক বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন। ১৯৭৮ সালে পঞ্চম জাতীয় জনগণের কংগ্রেসে ডেপুটি নির্বাচিত হন।

"তিনটি অতুলনীয় যোদ্ধা" নামে তাঁর ছোটগল্প সাবলীল স্বচ্ছ প্রাচীন রীতিতে, এই গল্পে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের সেনাদের বর্ণনার মধ্য দিয়ে জনগণের ফৌজের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ভালো গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে।

(১২) **ঝাও লিবো**—(১৯০৮—৭৯)। ইনি চীনের সুপরিচিত সমকালীন অন্যতম একজন লেখক।

১৯২৭ সালে নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ শেষ করে ঝাও লিবো দারিদ্রের তাড়নায় স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়ে সাংহাই চলে যান। ১৯২৬ সালে শ্রমিকদের জন্য নিদিষ্ট মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যাই হোক্ আট মাস পরে তাঁর বামপন্থী আদর্শ ও বিপ্লবী কার্য্যকলাপের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্কুল থেকে বিতাড়িত হন।

১৯৩১ সালের শীতকালে তাঁর এক সহপাঠীর সুপারিশে সাংহাই-এর এক ছাপাখানায প্রুফ রিডারের চাকুরী পান। ১৯৩২ সালে ছাপাখানায় এক ধর্মঘটে অংশগ্রহ করায় কুয়োমিনটাং প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা গ্রেপ্তার হয়ে আড়াই বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩৪ জেল থেকে খালাস হয়ে বামপন্থী লেখকদের চীনা ফেডারেশনে যোগ দেন ও চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য হন। সেই সময় তিনি পত্র পত্রিকা ও সংবাদ পত্রের সম্পাদক হিসাবে, যুদ্ধের সংবাদ দাতা হিসাবে, ইংরাজী অনুবাদক হিসাবে, এবং ইয়েনানের লু সুন ইনস্টিটিউটের সম্পাদনা ও অনুবাদ বিভাগের শিক্ষক ও প্রধান হিসাবে বহুপদ অলংকৃত করেন।

১৯৪৯ সালে দেশের মুক্তির পরে ঝাউলিবো 'চীনা জনগনের জয়' এবং 'মুক্ত চীন' নামে দুটি সিনেমার চিত্রনাট্য রচনায় সাহায্য করেন। ১৯৫৫ সালে তাঁকে শিল্প সাহিত্য চক্রের হুনান প্রাদেশিক ফেডারেশনের সভাপতি

করা হয়। তিনি আবার জাতীয় জনগনের কংগ্রেসের ডেপুটি এবং চীনা জনগনের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা কমিটির সদস্য হয়েছিলেন।

৩০ এর দশকের মধ্যবর্ত্তী সময়ে চীনের বামপন্থী লেখকদের ফেডারশনের সদস্য হিসাবে তিনি সৃজনশীল রচনা লিখতে সুরু করেন।

'সাপ্তাহিক সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে কাজ করার সময় সাহিত্য প্রসংগে অনেক প্রবন্ধ ও ছোট ছোট নক্সা লেখেন।

১৯৪৬ সালে উত্তর চীনে ভূমি সংস্কারে অংশ গ্রহণ করে এসে লেখক ঝাও লিবো রচিত "প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড়" নামে বড় গল্পটি পাঠক জনগন দ্বারা বিশেষ সমাদৃত হয় এবং পরে এই নামেই এক সিনেমা করা হয়। ১৯৫৪ সালে ইস্পাত শ্রমিকদের জীবনকে ভিত্তি করে লেখা তাঁর "গলিত লোহার স্রোত" নামে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। চীনের কৃষি সমবায় আন্দোলনের জয়গান গেয়ে "পাহাড়ী গ্রামে বিরাট পরিবর্ত্তন" নামে আরেকটি উপন্যাসও এই সময় প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে "শান্সি—কাহার—হেবেই—সীমান্ত এলাকায় আমার অভিজ্ঞতা," ও "দাক্ষিণাত্যে অভিযান" নামে দুটি গদ্য সংকলন। তার রচনার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তীক্ষ্ণ অন্তরদৃষ্টি, ঘন বুনোটের কাহিনী, বলিষ্ঠ চরিত্রায়ন ও উদ্ভাবনী শক্তি। তাঁর রচনায় স্থানীয় ভাষা ভালো ভাবে ব্যবহার করতেন বলেই, সেখানে স্থানীয় পরিবেশের ছোয়াচ থাকতো।

নিজ রচনা ছাড়াও তিনি শলোকভের "কুমারী মাটির ঘুম ভাঙ্গলো," ও পুশকিনের "ডুব্রোভস্কির" এর অনুবাদ সহ সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটি ধ্রুপদী লেখার অনুবাদ করেন।

"অভিজ্ঞান" নামে গল্পটির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে কেমন করে জেলে বন্দী শ্রমিকেরা, সাংহাই বৃটিশ ঔপনিবেশিকদের হাতে জিয়াও লিউকে নামে শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা করার প্রতিবাদ সংগঠিত করেছিল। সেই যুবক শ্রমিককে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাঁরা তাঁদের এই সংগ্রামের জয়কে উৎসর্গ করে।

(১৩) সুন লি—হেবেই প্রদেশের কোন এক স্থানে ১৯১৩ সালে জন্ম, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হবার পর তিনি বেজিং বিশ্ববিদ্যালয়ে এক করণিকের চাকুরী গ্রহণ করেন। সে সময় অনেক সমালোচনা ও কবিতা রচনা লিখলেও তাঁকে বহু কৃচ্ছসাধন করতে হয়। জাপ বিরোধী যুদ্ধের সময় তিনি সানশি হেবেই কাহার সীমান্তের ঘাঁটি এলাকায় একটি চাকুরী গ্রহণ করেন। সংবাদদাতা, সম্পাদক ও শিক্ষক হিসাবে কাজ

করার জন্য তাঁকে ফুপিংগ পাহাড় এলাকায় বদলী করা হয় সেই ১৯৩৯ সালে। ইত্যবসরে তিনি ছোট গল্প লিখতে শুরু করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি ইয়েনান লু স্যুন চারুকলা আকাদামীতে সাহিত্য বিষয়ক বিভাগে পড়াশুনা করেন ও পরে সেখানেই চাকুরী গ্রহণ করেন। "পদ্ম পদ্মঝিল" গল্পটি তাঁর এই সময়ের রচনা। এই গল্পে বর্নিত হয়েছে হেবেই এর ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত বৈয়াংদিয়ান এর হ্রদের ধারে মহিলাদের কথা, যাঁদের স্বামীরা জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে অনেক দূরে চলে গেছেন। তাঁরা কেমনভাবে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নিজেদের সংগঠিত করেন।

জাপানের আত্মসমর্পনের পর তিনি মধ্য হেবেই থেকে ফিরে আবার ভূমি সংস্কারের কাজে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে ত্রিযানজিন্ মুক্ত হলে তিনি "দৈনিক তিয়েনজিন" সংবাদপত্রের সাহিত্য বিষযক স্তম্ভের সম্পাদক নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি "নয়া বন্দর" নামে সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলের কাউন্সিল সদস্য।

তাঁর রচনার মধ্যে রয়েছে "সেই ঝড়ের দিন গুলি" নামে এক উপন্যাস, "কামার ছুতোর" নামে এক ছোট্ট উপন্যাস, আর রয়েছে ছোট গল্পও এক রচনাবলী যার মধ্যে রয়েছে, "বিদ্যালয়ের উপদেশ", "পরিচালক", "বৈয়াংগ দিনের-স্মৃতিচারণ", তাঁর "পদ্মঝিল" নামে ছোট গল্পটি পাঠকদের দ্বারা বিশেষ সমাদর লাভ করে।

—ঃ—